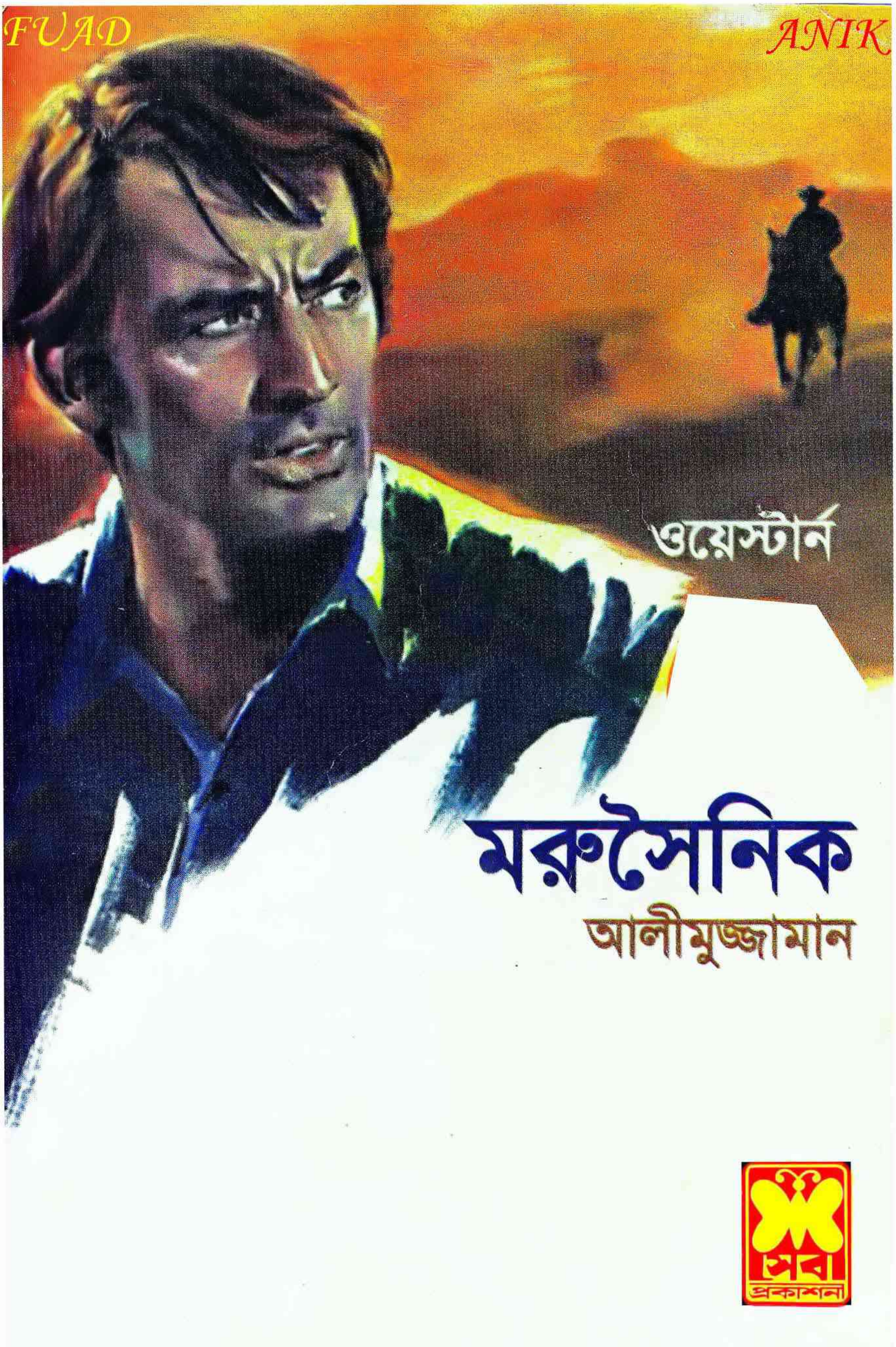

FUAD
ANIK
ওয়েস্টার্ন
মরুসৈনিক
আলীমুজ্জামান
সেবা
প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন

মরুসৈনিক

আলীমুজ্জামান

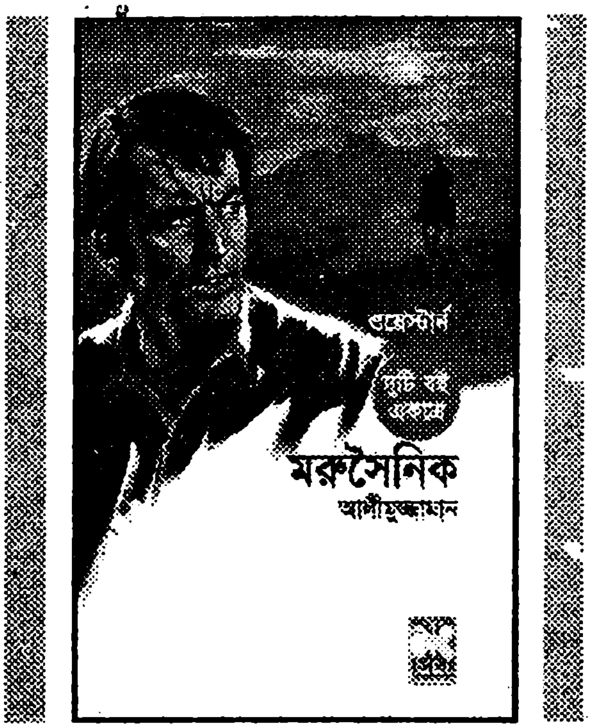
মরুভূমির সাইমুম ঝড়ের মত এল ওরা। দুর্ধর্ষ মোযেভ ইন্ডিয়ানের দল। ঘুমের মধ্যে মারা পড়ল একজন সৈন্য, আহত হলো আর একজন। ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল ওরা। কিন্তু এত করেও খতম করা গেল না টহল-সেনাদের ছোট্ট দলটাকে, কারণ ওদের সঙ্গে আছে ইয়াসীন নামে দুঃসাহসী এক বাঙালী যুবক।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

মরুসৈনিক

আলীমুজ্জামান



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8295-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ২০০৮

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি পি ও বক্স ৮৫০
e-mail sebaprok@citechco.net
Website www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮-১৯০২০৩

উনসত্তর টাকা

মরুসৈনিক
আলীমুজ্জামান
প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৬

এক

উপরে নির্বাক আকাশ।

নীচে বিজন ধূসর প্রান্তর।

মোযেভ মরুভূমি। আজন্ম তৃষিত এক অসীম বিস্তার।

চারটে অবসন্ন দেহ পড়ে আছে রোদ ঝলসানো বালিতে। পিপাসায় মৃতপ্রায় চারজন বিপন্ন মানুষ। অপেক্ষা করছে অন্তিম মুহূর্তের।

মাথার উপরে চক্রাকারে ঘুরছে শকুন। অদূরে, পাথরের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে আসছে নির্মম রেড ইন্ডিয়ানদের দল। খুব বেশি সময় নেবে না ওরা। চিতার ক্ষিপ্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে মোযেভ ইন্ডিয়ানরা। চারটে মৃতদেহ পড়ে থাকবে বালিতে। তারপর, অভিশাপের মত নেমে আসবে শকুন।

দুঃসময় কাউকেই খুব বেশি সময় দেয় না!

এরই মাঝে কেটে গেছে চার চারটে অসহ্য দিন। বুলেট ফুরিয়ে গেছে প্রায়, খাবার নেই, গত দু'দিন ধরে পানিও নেই।

এই বিরান মরুপ্রান্তরে, মৃত্যুর চেয়েও কষ্টকর এভাবে বেঁচে থাকা।

দূরে মাথা উঁচু করে আছে উদ্ধত পাহাড়। ওটার নাম যদি ঈগল পাহাড় হয়, তবে সামান্য আশা এখনও আছে। কারণ পাহাড়টার ডানপাশে কোথাও ওয়াটারহোল থাকবার কথা। ওয়াটারহোল, অর্থাৎ পানির উৎস।

পরাজিত চারটে দেহ। মৃত্যুপথযাত্রী চারজন মানুষ। শুয়ে শুয়ে ঠোঁট নাড়ছে অসহায় ভাবে। ওরা ঈশ্বরকে ডাকছে না, পরকালের অনন্ত সুখ প্রার্থনা করছে না। শুধু দু'ফোঁটা পানি চাইছে। প্রার্থনা করছে—সামনের ওই পাহাড়টা যেন ঈগল পাহাড় হয়। আর ওখানে যেন থাকে অমৃতের চেয়েও অমূল্য—পানি!

গত তিনদিন ধরে তারা পানি খুঁজেছে, পানি চেয়েছে, পানির কথা ভেবেছে। স্বপ্ন দেখেছে শিশিরের মতো শীতল, জোছনার মত কোমল জলের।

অসহ্য এ তৃষ্ণার জ্বালা!

বর্তমানে শুধু একঢোক পানির বিনিময়ে বেহেশতের সবচেয়ে রূপসী হুরকেও তারা হাতছাড়া করতে প্রস্তুত। তবু পানি চাই। হোক তা বিস্বাদ, দুর্গন্ধময় কিংবা বিষাক্ত!

*

শুরুটা কিন্তু ছিল অন্যরকম।

বরাবরের মত মরুভূমিতে টহল দিতে বেরিয়েছিল ওরা। দলে ছিল ছয়জন সৈন্য, একজন অফিসার। সুদর্শন তরুণ অফিসারটির কর্মজীবন সবে শুরু হয়েছে। মরুভূমিতে এই তার প্রথম পোস্টিং। শত্রু এলাকায় এটাই তার প্রথম টহল।

প্রথম দুটো দিন কেটেছিল নির্ঝঞ্ঝাট।

কোথাও শত্রুর চিহ্ন দেখা গেল না, কোনও আক্রমণ এল না, ঘটল না কোনও অঘটন।

তৃতীয় দিন।

সন্ধ্যায় ক্যাম্প ফেলার নির্দেশ দিল অফিসার। জায়গাটা খোলামেলা। আশেপাশে পানি নেই কোথাও।

দলের ছয়জন সৈন্যের একজন রেড ইন্ডিয়ান। নাম, মোকাটো। ক্যাম্পের জন্যে জায়গাটা পছন্দ হলো না তার। কয়েক মাইল সামনে একটা ওয়াটারহোল আছে। সেখানে ক্যাম্প ফেলার পরামর্শ দিল সে অফিসারকে।

অধস্তনের পরামর্শ শুনতে বাধল তরুণ লেফটেন্যান্টের। সিদ্ধান্ত অনড় রইল তার। সমতল নরম বালিতে ফেলা হলো ক্যাম্প।

বিশ্রাম প্রয়োজন ছিল পরিশ্রান্ত দলটার। অল্পক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। শুধু পাহারার জন্য জেগে রইল ইয়াসীন। রাতের প্রথম প্রহরের দায়িত্বে থাকবে সে। সময় শেষ হলে নর্টনকে জাগিয়ে দিয়ে ঘুমাতে যাবে।

পরিচ্ছন্ন রাত। নির্জন, শীতল এবং শান্ত। মরুভূমির রাতগুলো এমনই হয়।

বালি কিংবা পাথর উত্তাপ ধরে রাখতে পারে না। দিনের খররৌদ্রদহন সূর্যাস্তে যায় হারিয়ে। সন্ধ্যার সাথে সাথে নেমে আসে হিম।

অজানা অস্বস্তিতে ভুগছে ইয়াসীন। কেমন ছমছমে একটা রাত! মোকাটোকে দেখছে সে বারবার। কেবলি এপাশ ওপাশ করছে ইন্ডিয়ান। কোনও মানসিক উদ্বেগের মধ্যে থাকলে ঘুমের মধ্যে অমন করে মানুষ।

পুব অঞ্চলের বিখ্যাত এক রেডইন্ডিয়ান গোত্রের মানুষ মোকাটো। একসময় সাদা ইউরোপিয়ানদের ত্রাস ছিল গোত্রটা। তারপর সাদাদের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সব। পশ্চিমে হটে এল ওরা। বাঁচার তাগিদে আত্মসমর্পণ করে সেনাবাহিনীতে যোগ দিল মোকাটো, গোত্রের আরও অনেকের সাথে। পায়ের ছাপ দেখে অনুসরণ করতে জুড়ি নেই ওর। যোদ্ধা হিসেবে সুনিপুণ।

হয়তো ঠিকই বলেছিল মোকাটো। ক্যাম্প এখানে না করলেই ভাল হত।

রাতটা ভাল কাটল। ভাল ঘুমাল সবাই। আক্রমণ এল ভোরের আলো

ফোটার ঠিক আগে।

মরুভূমির দুর্বার সাইমুম ঝড়ের মত এল ওরা। ঘুমের মধ্যেই মারা পড়ল একজন সৈন্য। আহত হলো একজন। ঘোড়াগুলো তাড়িয়ে নিয়ে গেল ওরা। নিমেষে ওলটপালট করে দিয়ে গেল সব।

সদ্য ঘুম থেকে জেগে উঠে কিছুক্ষণ এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ল সৈন্যরা। কিন্তু ততক্ষণে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে আক্রমণকারী মোযেভ ইন্ডিয়ানদের দল। কোথা হতে তারা এল, আর কোথায় যে উধাও হলো–বুঝতে পারল না কেউ।

ধাতস্থ হতে কিছু সময় নিল টহলদলের সৈন্যরা। তারপর দুটো সারিবদ্ধ লাইন করে রওনা হলো। তরুণ অফিসারটি হাঁটছে দুই সারির মাঝখানে। ইয়াসীনের পাশে এগিয়ে এল সে।

'হয়তো এরকম কিছু চেয়েছিল ওরা। সবকটা ঘোড়াই নিয়ে গেল এই যা দুঃখ। তবু গেছে তো!'

'ওরা যায়নি।'

সামান্য চমকাল অফিসার। 'কী বলছ, ইয়াসীন! কই আমি তো আশেপাশে দেখছি না কাউকে?'

'বিনা প্রয়োজনে দেখা দেয় না ওরা। এই মরুভূমিতেই ওদের বাস। হাতের রেখার মতই এখানকার সবকিছু চেনে ওরা। জানে সামনে পিছনে কোথায় কী আছে। একবার আক্রমণ করেছে। যতটুকু চেয়েছিল ঠিক ততটুকু ক্ষতি করে গেছে। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আবার আক্রমণ করবে। যতটুকু চাইবে ঠিক ততটুকু ক্ষতি করে যাবে। ওরা ওরকমই। স্থির, হিসেবী এবং অব্যর্থ।'

'বেশ গুছিয়ে কথা বলো তুমি, ইয়াসীন। খোঁজখবরও রাখো সবকিছুর। সম্ভবত অনেক লেখাপড়া জানা আছে তোমার।'

'হয়তো, সার। কিন্তু এই বিরান মরুভূমিতে কী-ই বা আসে যায় তাতে।'

নীরবে কিছুক্ষণ তাকে খুঁটিয়ে দেখল অফিসার। তারপর মুখ ঘুরিয়ে এগিয়ে গেল সামনে।

ক্রমেই মাথার উপর উঠে আসছে সূর্য। উত্তপ্ত আলগা বালিতে গোড়ালি সমান ডুবে যাচ্ছে পা। হেঁটে এগোনো কষ্টসাধ্য। তবু এগিয়ে চলেছে দলটা।

সবার সাথে তাল মিলিয়ে হেঁটে চলেছে ভোরের আক্রমণে আহত সৈনিকটাও। অনেকদিন ধরে সে আছে এই ইন্ডিয়ান ফাইটিং আর্মিতে। ক্ষত যত খারাপই হোক না কেন–পিছিয়ে পড়া চলবে না। মোযেভ মরুভূমিতে একা পিছিয়ে পড়ার পরিণতি জানা আছে তার।

দুঃসহ গরম। হাওয়া নেই। পরিপূর্ণ নীল আকাশে মেঘের শামিয়ানা নেই

কোথাও। দূরে অনুচ্চ পাহাড়ের সারি দিগন্তে বিলীন। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বড় বড় পাথরের চাঁই, গ্রীজউড কিংবা ক্যাকটাসের ঝোপ। সবকিছুতেই রুক্ষতার স্পষ্ট ছাপ।

দুপুর পর্যন্ত একনাগাড়ে হাঁটার পর কিছুক্ষণের জন্য থামার নির্দেশ দিল লেফটেন্যান্ট। পাথরের মত শক্ত মাংসের শুঁটকি আর সামান্য পানি খেলো সবাই। আবার শুরু হচ্ছিল হাঁটা। এমন সময় কথাটা বলল ইয়াসীন।

'সার, আমি কি কিছু বলতে পারি?'

'কী ব্যাপার, ইয়াসীন?'

'সামনে খোলামেলা প্রান্তর। কিন্তু ডানদিকে দেখুন, পাথরের ছোট একটা স্তূপ। আমরা ওখানে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারি বেলা পড়ে না আসা অবধি। সামনের ফাঁকা জায়গাটায় ওরা আমাদের ঘিরে ফেলতে পারে।'

কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হলো লেফটেন্যান্ট-এর। 'ঠিক আছে, বেলা পড়ে আসুক। বিকেলের নিস্তেজ রোদে আমরা ভাল এগোতে পারব।'

দ্রুত পৌঁছে গেল দলটা ডানদিকে পাথরের স্তূপের কাছে। যে যার মত বিশ্রাম নিতে বসল, হাত-পা ছড়িয়ে। পানির বোতল মুখে ঢালতে যাচ্ছিল লেফটেন্যান্ট। হঠাৎ খেয়াল হলো আর কেউ পান করছে না। মরুভূমির কঠোর সৈন্য সব। বোতল সরিয়ে রাখল সে।

চারদিক দেখে নিচ্ছিল ইয়াসীন। কাছেপিঠে আর কোনও পাথরের স্তূপ নেই। এরকম জায়গায় আক্রমণ করতে আসবে না ইন্ডিয়ানরা। আচমকা আঘাত হেনে আড়ালে পালিয়ে যায় তারা। আশেপাশে তেমন কোনও আড়াল নেই।

মোকাটো পাশে এসে বসল। 'অফিসার আমার কথা না শুনে ভাল করেনি; কিন্তু তোমার পরামর্শ যে শুনেছে, এটা আমাদের জন্যে মঙ্গলজনক,' মন্তব্য করল।

'তুমি কি চেনো এ জায়গা?'

'ওইযে দূরে, নীল কুয়াশা, ওটা যদি ঈগল পাহাড় হয়, তবে চিনি।'

'বেশ ভাল ইংরেজী বলতে পারো তুমি।'

'দেড় বছর স্কুলে পড়তে হয়েছে আমাকে। তা ছাড়া কান খোলা রাখি আমি। টেক্সাসে কর্নেল রোনাল্ডের সাথে ছিলাম বহুদিন।'

আর কোনও কথা হলো না ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও। চুপচাপ বসে রইল ওরা। মরুভূমির বাতাসে শুকিয়ে গেছে মুখ। শিরিষ কাগজের মত খস্‌খসে হয়ে গেছে জিভ। কষ্ট হয় কথা বলতে।

বেলা সামান্য পড়ে আসতেই যাত্রা করল দলটি। বিশ্রামের ফলে শক্তি ফিরে

এসেছে। তাই দ্রুত হাঁটছে সবাই। পায়ের তলায় তপ্ত বালির স্পর্শ। কোথাও আলগা আবার কোথাও পাথরের মত শক্ত খটখটে। প্রতিবার পা তোলার সাথে সাথে ধুলো উড়ছে।

'থামো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম।' নিচু স্বরে আদেশ দিল লেফটেন্যান্ট।

তখন গোধূলি।

দু'একটা তারা দেখা দিচ্ছে। খুব দ্রুত নেমে আসে মরুভূমির রাত। অল্পসময়েই সারা আকাশ ভরে যাবে তারায়।

'মোযেভরা কোমাঞ্চিদের মত নয়,' বলল মোকাটো। 'অ্যাপাচিদের মত। নেহাত প্রয়োজন না হলে রাতে যুদ্ধ করে না ওরা।'

তাই আবারও শুরু হলো যাত্রা। চেনা তারা দেখে এগিয়ে চলল দল। হাঁটতে হাঁটতে পাহাড় সারির বেশ কাছে চলে এল ওরা। আর এগোনো ঠিক নয়। সুতরাং এবারেও ক্যাম্প ফেলতে হলো পানির উৎস হতে দূরে। মোকাটো আশপাশ ঘুরে এল পানির সন্ধানে। পাওয়া গেল না।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল ইয়াসীনের। তখনও ভালভাবে আলো ফোটেনি। মাথা তুলতেই নজরে পড়ল একজন ইন্ডিয়ান। বেশ দূরে একটা পাথরের স্তূপের পাশে ঘোরাফেরা করছে। একজন, অর্থাৎ আরও আছে। ডেকে তুলল সে অফিসারকে।

'ওরা এসে গেছে, সার।'

ধড়মড় করে জেগে উঠল অফিসার। জলদি ডেকে ওঠানো হলো সবাইকে। 'মার্চ!' আদেশ শোনা গেল। আকাশে ওখনও মিটিমিটি জ্বলছে দু'একটা মরুতারা।

কোনও আচমকা আক্রমণ এল না। শোনা গেল না কোনও গুলির আওয়াজ। দিগন্তের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইয়াসীন। আরও একটা নির্মম দিনের শুরু–ভাবল সে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে ওরা। পায়ে পায়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে মাইলের পর মাইল। পায়ে পায়ে কমছে পথের দূরত্ব।

সামনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এখানে ওখানে যোশুয়া গাছের ঝাড়, ক্যাকটাসের ঝোপ কিংবা বিক্ষিপ্ত পাথর। ওরা জানে, ওসবের আড়ালে আড়ালেই ক্রমে কাছে এগিয়ে আসছে মোযেভ ইন্ডিয়ানদের দল। হিসাব করে এগিয়ে আসছে তারা। সাথে একজন আহত মানুষ ও সামান্য পানি নিয়ে অনভ্যস্ত পায়ে হেঁটে এই মরুভূমিতে কতদূর এগোনো যায়, ভালই জানা আছে তাদের।

ছাউনি এখনও অনেক দূরের পথ। ঘোড়ার পিঠেই লাগত তিনদিন। ভাগ্য ভাল হলে পায়ে হেঁটে পাঁচদিনে পৌঁছানো যাবে। অথবা হয়তো কোনওদিনই

পৌঁছানো যাবে না।

এবারেও আক্রমণ এল আচমকা। আশেপাশে কতগুলো পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। ওগুলোর আড়ালে কেউ ওঁৎ পেতে থাকতে পারে ভাবা যায়নি। যেন পাতাল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ওরা।

প্রথম গুলিটা লাগল লেফটেন্যান্ট-এর বুকে। বুক চেপে ধরে বসে পড়ল সে। খক করে কেশে উঠতেই ঠোঁটের কোণে ছলকে উঠল রক্ত। সথে সাথে পজিশন নিয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল সৈন্যরা। কিন্তু পাল্টা গুলির আওয়াজ শোনা গেল না।

চলে গেছে মোযেভরা। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তাদের। মরীচিকার মত মিলিয়ে গেছে সবাই।

'আমার পানির বোতলটা ফুটো করে দিয়ে গেছে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল নর্টন। 'আমারটাও গেছে,' যোগ করল মোকাটো। 'এবং এ-ই চেয়েছিল ওরা।'

ঠোঁটের কাছে ধরা পানির বোতলটা হাত দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিল লেফটেন্যান্ট। 'রেখে দাও ইয়াসীন, কাজে লাগবে সামনে। সময় বেশি বাকি নেই আমার। এখন থেকে তুমিই কমান্ডার।' মোকাটোকে ইশারায় কাছে ডাকল সে। ফিসফিসিয়ে বলল, 'তোমার কথা শুনিনি আমি। ভুল করেছিলাম।'

অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকাল ইয়াসীন। সবদিকে মরুভূমির একঘেয়ে বিস্তার। সম্ভবত বাঁচানো যাবে না অফিসারকে।

অফিসারও বুঝে গেছে তা। দ্রুত নিস্তেজ হয়ে এল তার দেহ। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। চোখে নেমে এল দুর্বোধ্য অন্ধকার। ইয়াসীনের বাম হাতে মাথা রেখে চুপচাপ মারা গেল সে।

মোকাটো হাত রাখল ইয়াসীনের কাঁধে। 'কোনওরকম লোকসান ছাড়াই চলে গেছে ওরা।'

'আর মাত্র চারটে পানির বোতল আছে, পাঁচজনের জন্যে। টিকে থাকতে হলে প্রথমে আমাদের পানি প্রয়োজন।'

সামান্য গর্ত খুঁড়ে–অফিসারের মৃতদেহটা বালিচাপা দিল ওরা। তার আগে তার পিস্তল, বত্রিশ রাউন্ড গুলি, মানিব্যাগ ও টুকিটাকি জিনিসগুলো নিয়ে নিয়েছে ইয়াসীন। ছাউনিতে ফিরে এসব ফেরত দিতে হবে। ফেলে রেখে গেলে সবকিছু চলে যাবে ইন্ডিয়ানদের দখলে।

মাথার উপরে আগুন ছড়াচ্ছে গনগনে সূর্য। দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকাল ইয়াসীন। মনে মনে একটা হিসাব নিল। সবাইকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল আবার।

চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে ওরা। অনেকক্ষণ দেখা গেল না কাউকে। সহসা বাঁ দিকে উদয় হলো দুই ঘোড়সওয়ার রেড ইন্ডিয়ান। ডানদিকেও দেখা গেল ঘোড়ায় চড়া দুজনকে। দুটো দলই বেশ দূরে। তবু নিজেদের ঘোড়াগুলো চিনতে অসুবিধা হলো না মরু-সৈনিকদের।

বেশ দূরত্ব রেখে ওদেরকে অনুসরণ করে চলল দুটো দল। একবারও কাছে আসল না বা গুলি ছুঁড়ল না।

সাড়ে বারোটার সময় দলটাকে থামাল ইয়াসীন। ধারেকাছে কোথাও ঝোপঝাড় বা পাথরের আড়াল নেই। নেই কোনও ছায়ার আচ্ছাদন। তবু থামতে পেরে খুশিই হলো ক্লান্ত সৈন্যরা।

'ওই যে দূরে–ছোট একটা টিলা, ওখানে ছায়া পাব আমরা। বিশ্রামের জন্যে জায়গাটা ভাল হবে মনে হয়,' বলল ইয়াসীন। 'কথাটা ইন্ডিয়ানরাও জানে,' যোগ করল মোকাটো।

'দ্রুত ওখানে পৌঁছাতে হবে আমাদের। পারবে তুমি, হেনরী?' আহতজনকে জিজ্ঞাসা করল ইয়াসীন।

'তুমি পারলে আমিও পারব।'

'গুড। তা হলে শুরু করা যাক।'

দলকে নিয়ে এমনভাবে এগোল ইয়াসীন। যেন টিলাটাকে পাশ কাটিয়ে আরও সামনে এগোনো ওর লক্ষ্য। ওটা যখন মাত্র শ'দুয়েক গজ দূরে, তখন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশ দিল সে। 'টিলার দিকে–অন দা ডাবল!' সামান্য দিক পরিবর্তন করে টিলার দিকে ছুটল সবাই।

মোযেভরা বুঝতে পারেনি ইয়াসীনের উদ্দেশ্য। ওরা ভেবেছিল টিলাটাকে পাশ কাটিয়ে আরও এগিয়ে যাবে সেনাদল। ফলে এগিয়ে এসে টিলার আড়ালে পজিশন নেয়নি কেউ।

গুলির আওয়াজ এল পিছন থেকে। কিন্তু থামল না সৈন্যরা। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর কয়েকজন মানুষ। গত ক'দিনের অমানুষিক পরিশ্রমে যাদের শরীরে লেশমাত্র শক্তি অবশিষ্ট নেই। তবু ফুসফুসের শেষ বাতাসটুকু বাজি রেখে দ্রুত দৌড়াচ্ছে সবাই। দলপতির আদেশ নয়, বাঁচার প্রবল আকুতি ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওদের।

আবার গুলির শব্দ এল পিছন থেকে। ইয়াসীনের পাশের সৈন্যটি ছুটতে ছুটতে হঠাৎ তাল হারিয়ে ফেলল। এলোমেলো কয়েক পা এগিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল সে। ঘুরেই এক হাঁটুর উপর ঝপ করে বসল ইয়াসীন। দেখাদেখি থেমে যাচ্ছিল অন্যরা। 'যাও!'–চিৎকার করে রাইফেল তুলল ও।

ঘোড়ার পিঠে ধেয়ে আসছে কজন মোযেভ ইন্ডিয়ান। একজনকে তাক করে গুলি করল ইয়াসীন। ঝুঁকে পড়ে গুলি এড়াল ইন্ডিয়ানটা। ঘোড়ার আড়ালে শরীর লুকাল কাৎ হয়ে। তারপর অন্যদের সাথে দিক পরিবর্তন করে পালিয়ে গেল রাইফেল সীমানার বাইরে।

নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকা সৈন্যটির কাছে এগিয়ে গেল ইয়াসীন।

মাথা বেকায়দা ভঙ্গিতে কাৎ হয়ে আছে একদিকে। খোলাচোখ আকাশের দিকে স্থির। মরে গেছে নর্টন।

তার রাইফেল, গুলির বেল্ট আর খালি পানির বোতল খুলে নিল ইয়াসীন। অন্যরা পৌঁছে গেছে ততক্ষণে।

টিলার কাছে এসেও পর্যাপ্ত ছায়ার আশ্রয় মেলেনি। প্রচণ্ড ক্লান্তি নুইয়ে দিয়েছে সবাইকে। ওপাশে একটা ছোট্ট পাহাড়ের আড়ালে শুয়ে পজিশন নিয়েছে মোকাটো। অন্য দুজন ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে লুটিয়ে আছে এপাশের বালিতে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইয়াসীন। পায়ে পায়ে মোকাটোর পাশে গিয়ে ধপ করে বসে শুয়ে পড়ল।

মাথার উপরে নির্বাক নীল আকাশ। কলঙ্কের মত কালো কালো শকুন ভেসে বেড়ায় সেখানে।

দুপুরের নিথর রোদ, কেঁপে যায় দূরাগত অশ্বের চিকন চিঁহি ডাকে। ঘাম ঝরে। পাথরের আড়ালে আড়ালে ক্রমেই এগিয়ে আসে নির্মম ইন্ডিয়ানরা।

দূরের পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে থাকে ইয়াসীন। নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে অসহায় ভাবে প্রার্থনা করে চলে।

'ওই পাহাড়টা যেন ঈগল পাহাড় হয়। আর ওখানে যেন পানি থাকে। বেশি নয়; সামান্য পানি। খুব সামান্য হলেও যেন পানি পাওয়া যায় ওখানে!'

দুই

তবুও বেঁচে থাকার চেষ্টা চলে নিরন্তর।

সময় কাটতে চায় না কিছুতে।

মরুভূমির দীর্ঘ দুপুরে শুয়ে শুয়ে শত্রুর অপেক্ষা করে ওরা। টিলার কোল ঘেঁষে এক চিলতে ছায়া। সেখানে পালাক্রমে বিশ্রাম নেয় হেনরি আর পাওয়েল। মাঝে মাঝে দূর থেকে ছুটে আসা ঘাতক বুলেট মাথার উপর দিয়ে শিস্ কেটে

চলে যায়।

অপেক্ষায় আছে ইন্ডিয়ানরাও। এ মুহূর্তে খুব কাছে আসছে না তারা পাল্টা বুলেটের ভয়ে। শুধু মাঝে মাঝে জানিয়ে দিচ্ছে নিজেদের উপস্থিতি।

একটা মাঝারি আকৃতির পাথরের পিছনে শুয়ে পজিশন নিয়েছে ইয়াসীন। চিবুকে জমে আছে ঘাম শুকানো মিহি লবণ। ছাউনির কথা ভাবছে সে। মাত্র চারজন সৈন্য ও একজন অফিসার রয়ে গেছে ক্যাম্প কেডি ছাউনিতে। সেখানেও ইন্ডিয়ানরা আক্রমণ চালাতে পারে। তবু নিরাপদ তারা। কারণ পর্যাপ্ত পানি আছে ক্যাম্প কেডিতে।

পর্যাপ্ত পানি পেলে এই টহলদার সেনাদলটাও হয়তো টিকে যেত এ যাত্রা। ওদের শক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা আছে ইন্ডিয়ানদের। ক্যাম্প কেডি হতে যে কোনও মুহূর্তে একটা সাহায্যকারী দল এদিকে আসতে পারে বলে ধারণা করে তারা। অথচ যদি জানত আর মাত্র পাঁচজন সৈন্য আছে সেখানে!

মনে মনে একটা হিসাব মেলাতে চাইছে ইয়াসীন। শেষবারের মত মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালানো যেতে পারে ওই পাহাড়ে পৌঁছাবার। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় দৈহিক শক্তি অবশিষ্ট আছে কিনা সন্দেহ।

দীর্ঘস্থায়ী তৃষ্ণায় নির্জীব হয়ে পড়েছে সবাই। কথা বলা দূরে থাক, সামান্য শব্দও করছে না কেউ। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে মুখ। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চোখ বুজে আসতে চাইছে অবসাদে। যেন ঘুম হয় না কতকাল!

মাঝে মাঝে মেসেজ করার ভঙ্গিতে হাত পা ডলছে পাওয়েল। বুনো জন্তুর মত মাথা ঝাঁকি দিচ্ছে।

লক্ষণগুলো জানে ইয়াসীন। ভীষণ তৃষ্ণায় ফাঁকা হয়ে যাবে বুক। শ্বাস নিতে কষ্ট হবে। ঝিমঝিম করতে থাকবে হাত পা ও মাথা। এরপর জিভ ফুলে উঠবে। কান হারিয়ে ফেলবে শোনার ক্ষমতা। শুরু হবে প্রলাপ।

বোতলের অবশিষ্ট সামান্য পানিটুকু মুখে ঢালল পাওয়েল। শেষ হয়ে গেছে জেনেও বোতলটা মুখের উপর উপুড় করে ধরে রাখল কিছুক্ষণ। ফেলে দিচ্ছিল।

'না'—তাকে নিষেধ করল ইয়াসীন। 'আগামীকাল হয়তো পানি পাব আমরা। তখন ওটা দরকার হবে।'

ঢুলু ঢুলু চোখে তার দিকে তাকাল পাওয়েল। হয়তো বুঝতে পারেনি কথা। মাথা ঝাঁকাল আর একবার। তবে ফেলল না বোতলটা।

আর কতক্ষণ টিকবে তারা?

হিসাব কষে চলল ইয়াসীন। বারবার এলোমেলো হয়ে গেল চিন্তা। আর একটা বুলেটের শব্দে সচকিত হয়ে আবার প্রথম থেকে আরম্ভ করল হিসাব।

অবশেষে সন্ধ্যা নেমে এল। একটা দুটো করে তারা উঁকি দিচ্ছে আকাশে। অনেকক্ষণ হলো থেমে গেছে গুলির আওয়াজ!

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল ইয়াসীন। উঠতে নির্দেশ দিল অন্যদের। মোকাটো উঠল সবার আগে। কোনওমতে উঠল হেনরি। পাওয়েল নিজে উঠতে পারল না। তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল মোকাটো। হাঁটতে শুরু করল ওরা। এক পা এগিয়েই পড়ে যাচ্ছিল পাওয়েল। হোঁচট খাওয়ার ভঙ্গিতে সামলে নিল। তারপর হাঁটতে থাকল ঠিকমতই।

আড়াল হতে এখনও গর্জে ওঠেনি কোনও রাইফেল। তবু একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে হাঁটতে লাগল চারজনের দলটা। এতে টার্গেট স্থির করা কঠিন হবে ইন্ডিয়ানদের পক্ষে। এমনিতেই অন্ধকার নেমে আসতে কোনও কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

দূরের পাহাড়টার দিকে সোজা এগোতে থাকল ওরা। ওটাই শেষ ভরসা এ যাত্রা।

হাঁটতে হাঁটতে একবার পড়ে গেল পাওয়েল। উঠল সাহায্য ছাড়াই। হাঁটতে থাকল আবার।

ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর থামল ইয়াসীন। জায়গাটা ফাঁকা। মিনিট দশেক বিশ্রাম নিয়ে আবার সচল হলো দল।

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ হাঁটল এবারে। দেখা গেল কিছু কাঁটালতার ঝোপ। সামনের জমি এক বিশাল পিরিচের আকৃতি নিয়েছে। তার কিনার ধরে গজিয়েছে ঝোপগুলো। পিরিচের কেন্দ্রের দিকটা বেশ ঢালু। সম্ভবত কালেভদ্রে বৃষ্টি হলে দূরের পাহাড় বেয়ে নেমে আসে পানি। ক্ষণিকের জন্য জমা হয় পিরিচে।

ঝোপগুলোর মধ্য দিয়ে হাঁটতে থাকল সবাই। এতে বুলেট এড়ানো হয়তো যাবে না, তবে টার্গেট করা মুশকিল হবে শত্রুর।

হোঁচট খেলো মোকাটো। পড়ে যাচ্ছিল। জমিতে রাইফেলের বাঁট ঠেকিয়ে নিশ্চিত পতন বাঁচাল সে। থেমে দাঁড়াল ইয়াসীন। বসে পড়ল হেনরী। 'পাহাড়টা এখনও মাইল তিনেকের পথ। ওটার ডানদিকে পানি রয়েছে কোথাও।' বলল মোকাটো।

'আজ রাতে আর এগোব না আমরা,' ঘোষণা দিল ইয়াসীন। বিক্ষিপ্ত ভাবে বসে পড়ল সবাই। শুয়ে পড়ল হেনরী। দেখাদেখি অন্যরাও শুলো। ঘুমিয়ে পড়ল অল্পক্ষণে।

ঘুমায়নি ইয়াসীন। কনুইয়ের উপর মাথা রেখে আধশোয়া ভঙ্গিতে তাকিয়ে

আছে সে সামনের দিকে। পাহাড়টা অন্ধকারে আবছা। ওখানে হয়তো কোনও সরু ঝরণা আছে। তাই যদি থাকে, তবে ইন্ডিয়ানরাও জানে তা। এটা ওদের দেশ। কিছুতেই পানির কাছে পৌঁছতে দেবে না ওরা। কারবালার কথা মনে পড়ল ইয়াসীনের। হাসল ও আনমনে। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে তাকিয়ে রইল সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে।

একসময় ফর্সা হয়ে এল পুব আকাশ। তবু উঠতে ইচ্ছে হয় না। সারাটা রাত জেগে কাটিয়েছে সে। এখন ঘুম আসছে দু'চোখ ভরে। অবসাদে ভারি হয়ে আসছে মাথা। তবু ঘুমানো চলবে না। আবার আরম্ভ করতে হবে যাত্রা। পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে হবে পাহাড়টার কাছে।

জীবনমৃত্যুর এই ক্ষমাহীন সংঘাতে এতক্ষণে দেখা গেছে সামান্য আশার আলো। এখন থেকে প্রতিটি পদক্ষেপ তাদের নিয়ে যাবে বিজয়ের আরও কাছাকাছি। তবে হয়তো সে বিজয়ের জন্য দিতে হবে অত্যধিক চড়া মূল্য।

ঝটপট উঠে দাঁড়াল ইয়াসীন। দ্রুত জাগিয়ে তুলল সবাইকে। এটাই শেষ চেষ্টা।

'মার্চ!' কর্কশ কণ্ঠে আদেশ করল সে। পুব আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে যেন লাল রক্ত।

টলতে টলতে পিরিচের ঢালে নেমে এল চারজনের দলটা। পিঠে বাড়তি একটা রাইফেলের বোঝা নিয়ে আগে আগে চলেছে ইয়াসীন। সবার পিছনে আসছে মোকাটো।

আর পারা যায় না। তবু দাঁতে দাঁত চেপে পা টেনে টেনে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই একপা, দুপা, দশপা–একশো পা। একশো গজ–দুশো গজ। এগিয়ে চলেছে ওরা। হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল হেনরী। এলোমেলো কয়েক পা এগিয়ে ধপ করে বসে পড়ল। সাথে সাথে শুয়ে পড়ল পাওয়েল।

এদিকওদিক মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেই আবার উঠে দাঁড়াল হেনরী। কিন্তু পাওয়েল উঠছে না। তাকে টেনে তুলল মোকাটো। দাঁড় করিয়ে দিল দু'পায়ের উপর। আবার ভেঙেচুরে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছিল সে। ধরে রাখল মোকাটো। কষে একটা থাপ্পড় মারল তার গালে। তাকাল ইয়াসীনের দিকে।

'এগোও।' অনেক কষ্টে তিনবারের প্রচেষ্টায় কথাটা বলতে পারল ও। ব্যাঙের মত কর্কশ শোনা গেল কণ্ঠস্বর।

কিছুদূর গিয়ে পড়ে গেল মোকাটো। নিজেই উঠল। এবারে হোঁচট খেয়ে পড়ল ইয়াসীন। সেও উঠল নিজে নিজে। এভাবে উঠে পড়ে অতিক্রান্ত হলো আরও কয়েকশো গজ।

'ডাইনে ঘোরো।' শুকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে জিভ। অনেক কষ্টে কথাগুলো বলল ইয়াসীন। টলতে টলতে বিশাল পিরিচটার বাইরে বেরিয়ে এল সবাই।

সামনের জায়গাটা ফাঁকা। চারদিকে ছড়িয়ে আছে পাথরের চাঁই। পাহাড়টা এখন আর বেশি দূরে নয়। ডাইনে ঘোরার ফলে হাতের বাঁ দিকে সরে যাচ্ছে ওটা। কিছুটা কোনাকুনি ভাবে পাহাড়টার দিকে এগিয়ে চলেছে সবাই।

আচ্ছা, ওখানে যদি পানি পাওয়া না যায়! ভুল হতে পারে মোকাটোর। দেশটা তার নিজের নয়। এর আগে মাত্র একবার এসেছে সে এখানে। এমন তো হতে পারে, সামনের পাহাড়টা ঈগল পাহাড়ই নয়?

গুলিয়ে গেল ইয়াসীনের মাথা। আশঙ্কাটা জোর করে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করল সে। পানি থাকুক বা না থাকুক, পৌঁছতে হবে ওখানে? আগাগোড়া আগ্নেয়শিলায় গড়া–ধূসর লাল ওই উঁচু পাহাড়টার কাছে।

পিছনে রাইফেলের আওয়াজ। চলকে উঠল পায়ের কাছে বালি। সাঁৎ করে একটা তীর চলে গেল মাথার উপর দিয়ে। সাথে সাথে বালিতে ডাইভ দিল সবাই।

'ট্রিগার টিপবে না কেউ–' সাপের মত হিস্‌হিস্‌ করে উঠল ইয়াসীনের কণ্ঠ। এড়ানো যাবে না যুদ্ধটা–শেষবারের মত ভাবল সে।

সামান্য রস নেই মুখে। মার্বেলের মত পাথরটা গালের ভিতর নাড়াচাড়া করছে সে। কাজ হতে পারে এতে। আরও একটা তীর এসে পড়ল কাছেই।

'হেনরী, পাওয়েল–লড়তে পারবে তোমরা?' প্রশ্ন করল ইয়াসীন। কথা বলল না পাওয়েল। 'বাঁচতে হলে পারতে হবে।' কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলল হেনরী। চোখের কোনা দিয়ে তার দিকে তাকাল ইয়াসীন।

থমথমে নির্দয় একটা মুখ নুয়ে আছে রাইফেলের উপর। দুদিন আগে আহত হয়েছে হেনরী। প্রচুর রক্ত পড়েছে বাম কাঁধের ক্ষতটা থেকে। তার উপর মরুভূমির এই প্রচণ্ড পরিশ্রম আর পিপাসা। তবু হারতে রাজি নয় মরুভূমির সৈনিক!

দূরের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল একজন ইন্ডিয়ান। মাথায় পালকের মুকুট। হাতে তীরধনুক। তার পিছনে বেরিয়ে এল আরও দুজন।

রাইফেল তাক করার চেষ্টা করল ইয়াসীন। দুর্বলতায় হাত কাঁপছে। আশি বছরের বৃদ্ধের মত হাতের চামড়া কুঁচকে গেছে ডিহাইড্রেশন-এ। দূরের ইন্ডিয়ান হঠাৎ ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টিতে। তবুও একাগ্রচিত্তে তাকিয়ে থাকল সে সামনের দিকে। এবং গুলি করল।

ঝাঁকি খেলো ইন্ডিয়ানটার শরীর। তারপর মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে গেল। অন্য

দুজন দ্রুত পিছু হটে হারিয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।

আশাতীত কাজ হবে এ সাফল্যে। ভয় ঢুকবে ইন্ডিয়ানদের মনে। অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ে আক্রমণে এগিয়ে আসবে না আর।

যুদ্ধে কখনও পিছপা হয় না মোযেভ ইন্ডিয়ানরা। তবে কিছুতেই হারতে চায় না ওরা এই ভয়ংকর খেলায়।

লোকবল সীমিত ওদের। এদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে লোভী সাদা চামড়াদের দল। ক্রমে দখল করে নিচ্ছে ওদের আকাশ বাতাস মাটি। রক্তের বিনিময়ে তা উদ্ধার করার প্রচেষ্টা অর্থহীন। তাতে শুধু উর্বর হবে ভূমি। সেখানে ফসল ফলাবার জন্য অবশিষ্ট থাকবে না কেউ।

'মরে গেছে লোকটা,' পাশ থেকে বলল মোকাটো।

সায় দিল ইয়াসীন। জীবনে অনেক ইন্ডিয়ান মারতে হয়েছে তাকে। উপায় ছিল না। যুদ্ধের একটাই নিয়ম। মারো অথবা মরো!

উত্তরোত্তর উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বালি। মাথার উপরে চোখ রাঙাচ্ছে সূর্য। থমকে দাঁড়িয়েছে সময়।

শুয়ে আছে ওরা বালিতে। সামান্য নড়াচড়া নেই কারও। ইন্ডিয়ানদের দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

ওঠা দরকার, ভাবল ইয়াসীন। সময় সম্পর্কে সঠিক ধারণা হারিয়ে ফেলেছে সে। হয়তো কেটে গেছে দুতিন ঘণ্টা। তবু উঠতে ইচ্ছে হয় না। এদিকে অসহ্য হয়ে উঠছে বুকের তলায় গরম বালি।

সমস্ত মনোবল একত্রিত করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। 'ওঠো সবাই,' ঘোষণা দিল। কিন্তু সামান্য নড়ল না কেউ। মোকাটোর কাছে গিয়ে কলার ধরে তাকে টেনে তুলল ও। মোকাটো তুলল হেনরীকে। পাওয়েলকে তুলতে হলো ধরাধরি করে। প্রথমে নিজে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। মোকাটোর কাঁধে হেলান দিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। অবশেষে হাঁটুতে সামান্য বল ফিরে এল তার। কোনওমতে পাহাড়টার দিকে এগিয়ে চলল সবাই।

বেশ কিছুক্ষণ দেখা নেই ইন্ডিয়ানদের। কিন্তু আবার আসবে ওরা জানে ইয়াসীন। সামনের দিকে সামান্য কুঁজো হয়ে হাঁটছে সে। পিঠের বাড়তি রাইফেলটা বোঝার মত মনে হচ্ছে। পায়ের তলায় শক্ত বালি। বিচিত্র রং তার। কোথাও সাদা, কোথাও গোলাপী, কোথাও বা ধূসর। পাহাড়টা এগিয়ে এসেছে বেশ কাছে। ওটার চূড়া অনেক উঁচু থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে চারজনের বিধ্বস্ত দলটাকে।

আবার দেখা দিল ওরা। ঘোড়ায় চড়ে আসছে পিছন দিকে থেকে। দুইজন।

আরও আছে হয়তো। ঘুরে দাঁড়িয়ে রাইফেল তুলে তাদের শাসাল ইয়াসীন। থেমে দাঁড়াচ্ছিল বাকি সবাই। তাড়া লাগাল। আর একবার থামলে উঠতে পারবে না কেউ, বোঝা যাচ্ছে। তিনজনকে সামনে দিয়ে, পিছন থেকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল ও।

পানির সন্ধান এখনও সম্ভাবনা মাত্র। কোথাও কোনও ট্র্যাকের চিহ্ন নেই। ট্র্যাক অর্থাৎ মানুষের যাতায়াত পথ। মরুভূমিতে মানুষ সর্বদা পানির হিসাবে চলে। যদি ভুল থাকে হিসাবে, তবে পানির পরিবর্তে মৃত্যুর শীতল স্পর্শই মিটিয়ে দেবে সমস্ত তৃষ্ণা। দিনটাকে খুব নিষ্ঠুর বলে মনে হলো ইয়াসীনের।

ক্রমে হাতের বাঁয়ে সরে যাচ্ছে সামনের পাহাড়টা। কোনাকুনি এগোচ্ছে ওরা। পিছনে ইন্ডিয়ানরা আসছে অনুসরণ করে। অথচ সামনে পানির সামান্যতম চিহ্ন নেই কোথাও।

বেশ কাছে চলে এল ইন্ডিয়ানদের দলটা। সংখ্যায় অবশ্য পনেরোজনের বেশি নয়। তবে ঘোড়ায় চড়ে আসছে ওরা। দু'জনের হাতে রাইফেল। অন্যদের হাতে রয়েছে তীর ধনুক অথবা থ্রোইং নাইফের মত লম্বা ছোরা।

আবার পড়ে গেল পাওয়েল। বুনো জন্তুর মত মুখ ঘষছে উত্তপ্ত বালিতে। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল মোকাটো আর হেনরী। হাঁটু গেড়ে বসে পিছনের ইন্ডিয়ানদের দিকে রাইফেল তুলল ইয়াসীন।

হিট ওয়েভে কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে বাতাস। কেঁপে যাচ্ছে আগুয়ান ইন্ডিয়ানদের বাদামী দেহ। ঝাপসা দেখাচ্ছে দৃশ্যমান সবকিছু। অবাস্তব কোনও দুঃস্বপ্নের মত এক অস্পষ্ট প্রেক্ষাপট। অথচ নির্মম বাস্তব।

রাইফেল নামিয়ে নিল ইয়াসীন। এরকম অবস্থায় টার্গেট মিস হবার সম্ভাবনাই বেশি।

তোলা হয়েছে পাওয়েলকে। আবার চলতে আরম্ভ করল সবাই।

'ওই যে ওখানে!' কেঁপে গেল লোকটার গলা। 'মেসকাইটের ঝোপ ওগুলো। অর্থাৎ পানি আছে আশেপাশে।'

বেশি দূরে নেই ইন্ডিয়ানরাও। পিছনে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ওদের ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। 'আমি ফায়ার করার পরই তোমরা শুরু করবে। তবে রিলোড করার জন্যে কিছু সময় দিও আমাকে। পাওয়েল, তুমি রাইফেল চালাতে পারবে?'

উত্তর নেই। তবু কাঁধ থেকে আস্তে আস্তে রাইফেল নামাল সে। ওতেই চলবে, ভাবল ইয়াসীন। এবং হঠাৎ আধপাক ঘুরে বালিতে এক হাঁটু পেতে ফায়ার করল।

খুব কাছে এগিয়ে এসেছিল একজন ইন্ডিয়ান। ভারি ক্যালিবারের বুলেটটা

আচমকা ঝাঁকি দিল তাকে। ছিটকে বেরিয়ে গেল তার ডান হাতের ছোরা। ঘোড়া ঘুরিয়ে কিছুটা পিছিয়ে গেল সবাই।

'মেসকাইটের ঝোপের দিকে চলে যাও তোমরা। জলদি!' আদেশ দিল ইয়াসীন।

দুটো দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে পিছনের ইন্ডিয়ানরা। সম্ভবত দুইপাশ হতে সাঁড়াশী আক্রমণ করবে।

অতি অল্প লোকসানে, অনেক বেশি লাভ করার ফন্দি এঁটেছে মোযেভরা। মানুষ বা বুলেট কিছুই হারাতে চায় না ওরা, কারণ দুটোই সীমিত ওদের। তাই কৌশলে কাছে এগিয়ে আসতে চাইছে। যাতে তীরধনুক বা বর্ষা ছোরা দিয়ে আক্রমণ করা যায়।

আসুক কাছে-কোমরের পিস্তলটা অনুভব করল ইয়াসীন। তীর ছুঁড়ে কিছু করতে হলে কমপক্ষে ষাট গজের মধ্যে আসতে হবে ওদের, জানে সে। ওই রেঞ্জে তার পিস্তল কী করতে পারে তাও জানে।

উঠে দাঁড়াল ইয়াসীন। অন্য তিনজন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে মেসকাইটের ঝোপের দিকে। সেদিকে এগোল।

এখনও কোন ট্র্যাকের চিহ্ন নেই। কোনও উড়ন্ত মৌমাছিও দেখা যাচ্ছে না। মরুভূমিতে পানির আশেপাশে উড়ে বেড়ায় সেগুলো। প্রশ্নটা বারবার উঁকি দিচ্ছে মনে। ওই মেসকাইটের ঝোপের ভিতরে, তবে কি পাওয়া যাবে না পানি?

সেক্ষেত্রে আর এগোনো সম্ভব হবে না। ইন্ডিয়ানরা যদি নাও মারে, তবু মারা যাবে পাওয়েল। তারপর যাবে হেনরী। তারপর?

আর ভাবতে ইচ্ছে হলো না ইয়াসীনের। বরং যুদ্ধই হোক। ডানদিকে, দূরের ইন্ডিয়ানদের দিকে তাকাল সে।

পানি আছে ওদের। যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় রসদ আছে। আর আছে দ্রুতগামী ঘোড়া। যদি ফুরিয়ে যায় কিছু, ঘোড়া হাঁকিয়ে ফিরে যাবে কেউ নিকটবর্তী কোনও আস্তানায়। নিয়ে আসবে সব। তা ছাড়া এটা তো ওদেরই দেশ!

আর বেশি দূরে নেই মেসকাইটের ঝোপ। হয়তো মৃত্যুও বেশি দূরে নেই আর! জীবনে অনেকবার-এভাবে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি এসেছে ইয়াসীন। প্রতিবারই আপ্রাণ লড়তে হয়েছে বেঁচে থাকার জন্যে। 'তবু বড় নিষ্ঠুর একটা দিন আজ'-ভেবে দেখল ও।

আস্তে আস্তে কাছিয়ে আসছে ইন্ডিয়ানরা। হঠাৎ একজন বাড়িয়ে দিল ঘোড়ার গতি। দ্রুত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগিয়ে এল ইয়াসীনের দিকে। রাইফেল তুলল

সে। চট করে ঝুঁকে পড়ে ঘোড়ার ওধারে দেহ লুকাল ইন্ডিয়ানটা। ঘুরিয়ে নিল ঘোড়া। কিন্তু পিছন হতে আর একজন ইন্ডিয়ান ছুটে এল একই ভাবে।

'না!' গুঙিয়ে উঠল ইয়াসীন। 'গুলি করবে না কেউ। ওরা চাচ্ছে আমরা যেন এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে রাইফেল ফাঁকা করে ফেলি। যাতে কাছে এসে আক্রমণ করতে পারে ওরা।'

পিছিয়ে পড়তে শুরু করল ইয়াসীন। এতে অন্যরা কভার পাবে। দ্রুত পৌঁছে যেতে পারবে মেসকাইট ঝোপের কাছে। পাওয়েলকে সাহায্য করছে হেনরী। মোকাটো, রাইফেল তুলে পিছু হটার ভঙ্গিতে চলেছে ওদের সাথে।

একের পর এক আসতে থাকল ইন্ডিয়ানরা। দুর্বার গতিতে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ছুটে এসে, শেষ মুহূর্তে ঘুরে চলে যাচ্ছে দূরে। মুখে বিচিত্র সব আওয়াজ তাদের। টিটকারী দিচ্ছে!

হঠাৎ একসাথে আক্রমণ করল ডানপাশের সব কজন ইন্ডিয়ান। দলবেঁধে ঝড়ের বেগে ধেয়ে এল তারা। রাইফেল তুলল ইয়াসীন। রাইফেল তুলল হেনরী। ঘুরে গেল মোকাটোর রাইফেল, ডানদিকে। সবকটা চোখ, সবার মনোযোগ এখন ডানদিকে। হয়তো এটাই চায় ওরা–ভাবনাটা বিদ্যুতের মত খেলে গেল ইয়াসীনের মনে। নিজের অজান্তে বাঁয়ে ঘুরে গেল তার দেহ। আঙুল চেপে ধরল রাইফেলের ট্রিগার।

একেবারে ঘাড়ের উপর এসে পড়েছিল বাঁয়ের ওরা। গুলিটা ঘোড়ার পিঠ হতে নামিয়ে দিল একজন ইন্ডিয়ানকে। ভরা বস্তার মত ধপাস করে পড়ল মৃতদেহটা মরুভূমির বালিতে। সাথে সাথে রাইফেল ফেলে পিস্তল টেনে নিল ইয়াসীন। সামান্য ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু, কুঁচকে গেল বাম চোখ, বাম কব্জির উপর উঠে এল পিস্তল ধরা ডান হাত।

টাস্‌স্‌ তিন তিনটে বুলেট ছুটে গেল মাত্র একটা গুলির অখণ্ড আওয়াজের গর্ভ হতে। প্রথম বুলেটটায় একজন ইন্ডিয়ান চমকে উঠে নুয়ে পড়ল ঘোড়ার পিঠে। দ্বিতীয় বুলেটটা থাপ্পড় মারার মত ঘুরিয়ে দিল একজনের মুখ। সাথে সাথে সামনের পা দুটো শূন্যে তুলে চিঁহি ডাকল তার ঘোড়া। তারপর ঘুরে ছুট দিল পিছনের দিকে। সামনে ঝুঁকে গুলি এড়ানোর চেষ্টার ফলে তৃতীয় বুলেটটা কাঁধে নিয়ে অন্যদের সাথে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো আর একজন।

পিছনে গুলির শব্দ শুনতে পেল ইয়াসীন। একটা-দুটো আরও একটা বুলেট বেরিয়ে গেল তার পিস্তল হতে এবং নীরব হয়ে গেল মরুভূমি।

চলে গেছে ইন্ডিয়ানরা। হারিয়ে গেছে মরুভূমির কেঁপে যাওয়া বাতাসের ভাঁজে ভাঁজে। এসেছিল, তার প্রমাণ হিসেবে রেখে গেছে লোকসানের চিহ্ন

বালিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে ইন্ডিয়ান যোদ্ধার প্রাণহীন দেহ।

হোলস্টারে পিস্তল রেখে রাইফেলটা তুলে নিল ইয়াসীন। হাঁটতে হাঁটতে বুলেট ভরল তাতে। অন্যেরা অনুসরণ করল তাকে।

হেনরী এগিয়ে এল পাশে। তাকাল ইয়াসীন। তার দিকে তাকিয়ে আছে হেনরী। অচেনা দৃষ্টি সে চোখে। 'ম্যান!–আসলেই ওস্তাদ তুমি! জীবনে এই প্রথম সত্যিকার শুটিং দেখলাম!' বলল সে।

মেসকাইটের ঝোপে ঢুকল ওরা। ওপাশে পরিষ্কার একটু জায়গা। শুকনো কাদা ফেটে চৌচির হয়ে আছে সেখানে। পাথরের মত শক্ত। পানি নেই কোথাও!

তিন

হতাশায় ছেয়ে গেল সারা মন।

শুধু পানির আশা ওদের এতদূর লড়ে আসার শক্তি যুগিয়েছে।

ভীষণ ক্লান্ত বোধ করল ইয়াসীন। পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। দেহের ভার নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।

বসে পড়তে যাচ্ছিল হেনরী। ইয়াসীনের শব্দের চাবুক থামিয়ে দিল তাকে। 'ঝোপের ওপাশে পাহারায় থাক হেনরী। মোযেভরাও জানে–হেরে গেছি আমরা। তবু যুদ্ধ করেই মরব।'

পাওয়েল হাত-পা ছড়িয়ে চিৎপাত শুয়ে আছে একটা মেসকাইটের ঝোপের কাছে। তার উপরে নুয়ে আছে ছয়সাত হাত লম্বা গাছগুলো। জ্ঞান নেই মনে হচ্ছে।

'বোধহয় আর আসবে না ওরা।' হেনরী ফিরে যেতেই বলল মোকাটো। 'তোমার বুলেটের সামনে ঝুঁকি নেয়ার অর্থ লোকসান, টের পেয়ে গেছে ওরা।'

'তাতে আমরা লাভ করতে পারিনি মোটেও,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল ইয়াসীন। বালির উপরে বসে পড়ল সে পা ছড়িয়ে। পিস্তল রিলোড করছে। ভাবছে।

এ জায়গাটা আশেপাশের যেকোনও জায়গা হতে তুলনামূলকভাবে নিচু। পিছনের সেই পিরিচের মত জায়গাটার ঢালে রয়েছে মেসকাইটের এই ঝোপগুলো। বৃষ্টির পানি শেষ পর্যন্ত এখানে এসেই দাঁড়াবার কথা। নোনা ঘাসও গজিয়েছে আশেপাশে।

'মেসকাইট আর নোনাঘাস। দুটোই প্রমাণ করে পানি ছিল এখানে।' অনেক

কষ্টে মোকাটোকে কথাগুলো বলতে পারল ইয়াসীন। জিভ্ ফুলে উঠেছে তার। কষ্ট হয় কথা বলতে।

কিন্তু এখন তো পানি নেই! কত নীচে নেমে যেতে পারে পানির স্তর? কত আগে জমেছিল এখানে পানি? মাথাটা কাজ করতে চাইছে না। কেবলই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। শুয়ে পড়ে দীর্ঘ একটি নিদ্রা। জীবনের চেয়েও লম্বা একটা ঘুম।

'ইয়াসীন!' সতর্ক কণ্ঠে ডাকল মোকাটো। চোখে স্পষ্ট ভয়।

'নোনা ঘাস অর্থাৎ—পানির স্তর খুব বেশি নীচে নয়।' তাকে অভয় দিয়ে হাসল ইয়াসীন।

কতটুকু জানা আছে ওর মেসকাইট আর নোনা ঘাস সম্বন্ধে? ভাবতে চাইছে ইয়াসীন। পানির ধারেই জন্মায় মেসকাইট। তবে ওগুলোর শিকড় পঞ্চাশ ফুট গভীরে যেতে পারে। কিন্তু নোনা ঘাসের শিকড় দশ ফুটের নীচে যায় না। দশফুট? কমও তো হতে পারে!

রাইফেল নামিয়ে রাখল সে পাশে। পিঠে বাড়তি রাইফেলের বোঝাটাও নামাল। টলতে টলতে গিয়ে বসল শুকনো কাদার উপর। হাঁটু গেড়ে সরাতে শুরু করল শক্ত কাদার চাঙড়।

খুঁড়ে চলেছে ইয়াসীন। নীচ থেকে কেবলই উঠে আসছে বালি। শতাব্দীর খরায় পড়ে থাকা বাইসনের খুলির মত খটখটে, শুকনো!

জুলজুল করে তার দিকে তাকিয়ে আছে মোকাটো।

মাটির সোঁদা গন্ধ অস্পষ্ট ঝাঁঝের মত এসে লাগছে নাকে। হাতের ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলো জ্বলছে অ্যালকালীর স্পর্শে। কিন্তু কোনদিকে খেয়াল নেই ইয়াসীনের। খুঁড়ে চলেছে সে। একটু একটু করে গভীর হচ্ছে গর্ত।

ফিরে এল হেনরী। ঝুঁকে, দেখতে চেষ্টা করছে ইয়াসীনের খোঁড়া গর্তটা। 'কবরটা ছোট হয়ে যাবে তোমার জন্যে।' মন্তব্য করল সে। কণ্ঠে বিদ্রূপ।

'পাহারায় ফিরে যাও হেনরী।' হাতের কাজ থামল না ইয়াসীনের।

'চলে গেছে মোযেভরা।'

'তবু পাহারায় ফিরে যেতে বলছি।'

'তুমি বলার কে হে?' খেঁকিয়ে উঠল হেনরী। 'আমার মতই একজন সাধারণ সৈনিক, অথচ আদেশ করছ অফিসারের মত?'

থেমে গেল ইয়াসীনের হাত। উঠে দাঁড়িয়ে হেনরীর মুখোমুখি হলো সে। তাকিয়ে আছে চোখে চোখে।

'বাঁচার শেষ সুযোগ দিলাম তোমাকে। ফিরে যাও পাহারায়। নইলে খুন হয়ে

যাবে।' শান্ত ভাবে বলল ইয়াসীন।

তার দিকে তাকিয়ে আছে হেনরী। ক্ষণিক ইতস্তত করল। তারপর নামিয়ে নিল চোখ। পায়ে পায়ে ফিরে গেল পাহারায়।

আবার হাঁটু পেতে খুঁড়তে বসে গেল ইয়াসীন। মোকাটোর নির্লিপ্ত চোখ চেয়ে রইল সে দিকে। নিস্পলক।

দীঘল শরীর। চওড়া কাঁধ। পাথরের মত খাঁজকাটা বাহু ও বুক। কালো চুল। আরও কালো চোখের মণি। চলাফেরায় মরু সিংহের মত শক্তির নিঃশব্দ স্ফুরণ। এক অবাক লোক এই ইয়াসীন–ভাবছে মোকাটো।

চামড়াটা তোমার রেড ইন্ডিয়ানদের চেয়েও বাদামী। কোন্ দেশের মানুষ তুমি?–একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল মোকাটো।

গ্রীন ইন্ডিয়া। ছোট্ট করে জবাব দিয়েছিল ইয়াসীন।

দেশটা চিনতে পারেনি মোকাটো। দুর্ভাগ্য তার!

চেনাতে চেষ্টা করেনি ইয়াসীনও। কম কথার মানুষ সে বরাবর। কারও সাথে মেশে না, কখনও মদ খায় না, কাউকে চিঠি লেখে না। অথচ প্রচুর পড়াশুনা করে।

অস্ত্রে অব্যর্থ, অশ্বে নিপুণ–তুখোড় এক মরু যোদ্ধা। তিন বছর ধরে আছে ইয়াসীন এই ইন্ডিয়ান ফাইটিং আর্মিতে–জানে মোকাটো। দুবার কর্পোরাল পদে উঠেছিল লোকটা। দুবারই নেমে যেতে হয়েছে সাধারণ সৈনিকের কাতারে। অথচ কথাবার্তা চাল-চলন খোদ অফিসারের মত।

ওর সাথে নিজের কিছু মিল খুঁজে বের করার চেষ্টা করে মোকাটো। কোথায় যেন মিল আছে, অথচ কিছুতেই তা ধরা যায় না। হয়তো আমার মতই একটা পরাজিত অতীত আছে ইয়াসীনের–ভাবে মোকাটো। উদ্বাস্তু এবং নির্দিষ্ট একটা ভবিষ্যৎ!

খুব সহজে, কেউ আসতে চায় না এই ইন্ডিয়ান ফাইটার আর্মিতে। বুনো পশ্চিমে মানুষ আসে সৌভাগ্যের সন্ধানে। কেউ গরুর পাল জড়ো করে র‍্যাঞ্চ গড়ে তোলে, কেউ সরাইখানা খোলে–বসায় জমজমাট মদ কিংবা জুয়ার আড্ডা। কেউবা ওয়্যাগন শপে চালিয়ে বেড়ায় যাযাবর ব্যবসা। সুখ আর ঐশ্বর্য লুকিয়ে আছে পশ্চিমের এই মাটিতে, পাহাড়ে, অরণ্যে। সবাই খুঁজে ফেরে তা। কেউ পায়, কেউ পায় না। তবু আশা ছাড়ে না কেউ।

রেড ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যোদ্ধাবাহিনীতে যারা যোগ দেয়–তারা আলাদা জাতের মানুষ। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর রোমাঞ্চ-উন্মাদনা যুদ্ধে টেনে আনে তাদের।

কেউ কেউ হয়তো নিষ্কৃতি পেতে চায় কোনও দুঃসহ অতীত থেকে। একদিন নিজস্ব লোকালয় ছেড়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় তারা।

আর এক জাতের মানুষ আছে, জীবনটাকেই যারা একটা বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। ছেলেবেলায় খেলনা পিস্তলটা হয় তাদের সবচেয়ে প্রিয় খেলনা, কৈশোরে সমবয়েসীদের সাথে ঘুষোঘুষি করে নাক ফাটায়–তারপর বড় হয়ে হাতে তুলে নেয় রাইফেল।

লোভী আর দুর্বিনীত হলে কুখ্যাত বন্দুকবাজ হয় তারা। অন্যথায় সুযোগ মত এসে জুটে যায় সেনা দলে। অদ্ভুত এক আত্মধ্বংসী প্রবণতা থাকে এদের।

যেমনটি আছে ইয়াসীনের। তবে মানুষটা খারাপ নয়। মনে মনে রায় দিল মোকাটো।

একনাগাড়ে খুঁড়েই চলেছে ইয়াসীন। বেশ গভীর হয়েছে গর্তটা। নেমে পড়ল সে গর্তের ভিতরে। দুই হাতে তুলে আনতে লাগল শুকনো বালি ও মাটি।

প্রচণ্ড পরিশ্রমের কাজ। অবসন্ন শরীরে–হাপরের মত হাঁপাচ্ছে সে। তবু সহিষ্ণু উটের মত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে চালিয়ে যাচ্ছে কষ্টকর কাজটা।

মোকাটো এগিয়ে গেল গর্তটার কিনারে। মাটির সোঁদা গন্ধ এসে লাগল তার নাকে। হাত রাখল সে ইয়াসীনের পেশল বাহুতে। এবারে আমি? অনুমতি চাইল।

পালাক্রমে খুঁড়তে আরম্ভ করল ওরা দুজন।

মেসকাইটের ঝোপের এপাশে বসে বসে ঢুলছিল হেনরী। আড়াল থেকে ইয়াসীন বেরিয়ে এল। হাতে রাইফেল।

'ওঠো, হেনরী।'

চমকে তার দিকে তাকাল হেনরী। উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। 'কী করতে চাও তুমি'–ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

'ছুটি দিতে চাই।' হাসল ইয়াসীন। 'ওখানে পানি পাওয়া গেছে। যাও, আমি থাকছি পাহারায়।'

আবার বসে পড়ল হেনরী ধপ করে। 'এটা কী ধরনের ঠাট্টা?' করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করল।

'যাও!' ধমকে উঠল ইয়াসীন।

ধীরে ধীরে দূর হয়ে গেল তার দৃষ্টির অবিশ্বাস। পড়িমরি করে ছুটল সে মেসকাইট ঝোপের দিকে।

কোথাও কোনও জনমানুষের চিহ্ন নেই। মোকাটোর মন্তব্যই হয়তো ঠিক। আর আসবে না মোযেভরা। যদি আসেও ঘাবড়ানোর কারণ নেই। পানি পাওয়া গেছে। লড়তে আপত্তি নেই ইয়াসীনের। ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার পথ নির্দিষ্ট করতে

লাগল ও বসে বসে।

এখান হতে দক্ষিণ পুবে রয়েছে ইবেক্স পাহাড়। সঠিক দূরত্ব জানা নেই ওর। তবে অন্যদের কাছ থেকে যা শুনেছে, তাতে মাইল পনেরোর কম নয়। এমন বিধ্বস্ত অবস্থায় পায়ে হেঁটে অত দীর্ঘপথ অতিক্রম করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তবে পানি থাকবে সাথে। ওখানে পৌছাতে পারলে আরও পানি পাওয়া যাবে। অতএব চেষ্টা করা যেতে পারে।

ঝোপের ওপাশে ফিরে গেল ইয়াসীন। বেশ স্বচ্ছ হয়ে এসেছে কোমর সমান গভীর গর্তটার পানি। বোতল ভরে নিল সে।

হাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে শ্রান্ত হেনরী। শুয়ে আছে মোকাটো। পা ছড়িয়ে বসে আছে পাওয়েল। অনেক সুস্থ দেখাচ্ছে তাকে। 'তোমার জন্যে এতদূর আসতে পেরেছি আমরা।' বলল সে। 'নেতৃত্ব দিতে জানো তুমি। হয়তো এর আগে অফিসার ছিলে অন্য কোথাও, তাই না?'

তার কথার জবাব দিল না ইয়াসীন। 'মোকাটো?' ডাকল সে। 'আরও অনেক দূর যেতে হবে আমাদের। ইবেক্স পাহাড়ের ঝর্ণাটা চেনো?'

উঠে বসল মোকাটো। 'শুনেছি ওটার কথা। তবে যাইনি কখনও।'

'বারো মাইল দূরে আছে ওটা।' ইচ্ছা করে কমিয়ে বলল ইয়াসীন। 'পারবে?'

'সাথে পানি থাকলে সব পারে মরুভূমির সৈনিক,' বলল মোকাটো। 'আর যদি থাকে একজন যোগ্য নেতা। তোমার মত! যে–ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায় গুলি চালাতে জানে। জানে মেসকাইট এবং নোনা ঘাসের গভীরে পানির সন্ধান। আর কী কী জানো তুমি, ইয়াসীন?'

'বিশ্রাম নিতে,' বলল ইয়াসীন। 'এবার পাহারায় থাকবে তুমি।'

মোকাটো উঠে এগিয়ে গেল গর্তটার কাছে। পানি ভরছে বোতলে। কী মনে করে পিছন ফিরে তাকাল ইয়াসীনের দিকে। 'তোমার সাথে কথা বলা উচিত ছিল অফিসারের। তুমি হয়তো জানো ঠিক কী খুঁজছিল সে।'

'মানে?'

'কিছু খুঁজছিল ও। সবাইকে প্রশ্ন করছিল। মরুভূমি সম্পর্কে আজগুবি সব প্রশ্ন।' পাহারায় ফিরে গেল মোকাটো।

শুয়ে পড়ল ইয়াসীন। তৃষ্ণা মিটেছে তার। শরীর জুড়ে শিশিরের প্রশান্তি। শুধু পা দুটো টনটন করছে ব্যথায়। ইচ্ছে হচ্ছে শীতল জলে ভিজিয়ে নেয় পা। কিন্তু উঠল না। ক্রমাগত হাঁটার ফলে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে পা। ফোস্কা পড়ে ফেটে ঘা হয়ে গেছে। এখন পানিতে পা ডুবালে সাথে সাথে ফুলে কলা গাছ হবে। কিছুতেই জুতোয় ঢুকবে না। এরকমই হয়। আনমনে হাসল ইয়াসীন। একটু আরাম

পেলে—আরও একটুর সন্ধান করে মানুষ।

কিন্তু আরামের সময় এটা নয়। সন্ধ্যা নামছে। উঠল ইয়াসীন। চারজনের দলটা আবার শুরু করল যাত্রা।

আকাশে একটা দুটো করে তারা ফুটছে। ঝিরঝির বইছে শীতল বাতাস। চারদিক নিঝুম। শুধু চারটে অবসন্ন মানুষ নতুন আশায় হেঁটে চলেছে। আলগা বালিতে মিশে যাচ্ছে তাদের অস্পষ্ট পায়ের আওয়াজ।

ঘণ্টাখানেক হেঁটে থামল ওরা। 'মোযেভরা-আর অনুসরণ করে আসছে না।' বলল মোকাটো।

দশ মিনিট বিশ্রাম।

'মার্চ।' শব্দ উঠল রাতের মরুভূমিতে।

ডানদিকে পাহাড়ের সারি। নিষ্প্রাণ মরুভূমি ফুঁড়ে হঠাৎ মাথা তুলেছে তাদের উদ্ধত শিখর। অবাক তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। শুধু পাথর আর পাথর। অনন্ত কাল ধরে স্থির, স্তব্ধ।

হেঁটে চলেছে সবাই মরুভূমির ধু-ধু প্রান্তরে এমন অনেক চলতে হয়েছে ইয়াসীনকে। ঘোড়ায় কিংবা উটে কিংবা পায়ে হেঁটে। মরুভূমিতে পথ অতিক্রমের হিসাব বিভ্রান্ত করতে পারে না তাকে আর।

প্রথম ঘণ্টায় তারা হেঁটেছিল আড়াই মাইল, তারপরের ঘণ্টাতেও তাই। তৃতীয় ঘণ্টায় অবশ্য সেটা কমে যাবে কিছু। মানুষগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া সামনে দেখা যাচ্ছে বেশ উঁচু একটা পাহাড়ী আল।

অনেক উত্তরে নিয়ে এসেছিল লেফটেন্যান্ট তাদের। ইয়াসীন যতটা ভেবেছিল তার চেয়েও অনেক উত্তরে। হাঁটতে হাঁটতে মোকোটোর কথাগুলো মনে পড়ল। কিছু খুঁজছিল অফিসার।

কৌতূহল জেগে উঠল ইয়াসীনের মনে। হয়তো মোকাটোই ঠিক। স্মৃতি হাতড়ে লেফটেন্যান্টের কাজে কর্মে অনেক অসামঞ্জস্য বের করে ফেলল সে। অনেক অসংলগ্ন কথোপকথন কানে বাজল। কিন্তু কী খুঁজছিল লোকটা?

এই পশ্চিমা মরুভূমিতে লেফটেন্যান্ট ছিল আনকোরা নতুন। অথচ টহলের সময়, সামনের গন্তব্য সম্পর্কে বেশ নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিল সে। হয়তো ক্যাম্প থেকে বেরোনোর আগে, কমান্ডিং অফিসার জানিয়েছিল তাকে সব। কিন্তু কমান্ডিং অফিসার নিজেও এদিকটায় আসেনি কখনও। ক্যাম্প থেকে এত উত্তরে এর আগে টহলে আসেনি কেউ। তা হলে কীভাবে অমন নিখুঁত বর্ণনা সে দিতে পারল?

টহল দেবার আসল উদ্দেশ্য হলো—মরুভূমিতে যাতায়াতের সরকারি রুটগুলো

বিপদমুক্ত রাখা। যাতে ছাউনিতে রসদ পৌঁছতে পারে নির্বিঘ্নে, কিংবা স্টেজকোচের বহরগুলো এক মরু শহর হতে অন্য শহরে যাবার পথে আক্রান্ত না হয়। অথচ সেই নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে—অনেক সরে এসেছিল লেফটেন্যান্ট। সরতে সরতে জীবন-মৃত্যুর সীমারেখা পার হয়ে গেল। বেচারা! আফসোস হয় ইয়াসীনের। কোনওদিনই হয়তো জানা যাবে না, কী খুঁজছিল তরুণ অফিসার।

ইবেক্স পাহাড়ে পৌঁছতে রাত পোহাল। চমৎকার ঝর্ণাটা খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না বেশি। সবাই পেট আর বোতল ভরে নিল পানিতে। দ্রুত বাড়ছে মরুভূমির বেলা। পাহাড়ের ছায়ায় জিরোতে বসল ওরা।

একসময় অতিক্রান্ত হলো মরুভূমির অলস দুপুর। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। পড়ন্ত বিকেল। আবার শুরু হলো যাত্রা।

পাহাড়ের সারি হাতের ডানেই রয়েছে। ট্র্যাকের চিহ্ন পাওয়া গেল। সামনে ছোট্ট একটা মালভূমি। সেটা পার হয়ে পাহাড়ের পশ্চিমে এল ওরা। হারিয়ে গেল ট্র্যাকটা।

পাহাড়ের দক্ষিণপ্রান্তে পানির সন্ধান মিলল অযাচিত ভাবে। দলটাকে থামাল ইয়াসীন। কিছু বিশ্রাম প্রাপ্য হয়েছে অনেকক্ষণ আগেই।

সন্ধ্যার পরপরই আবার শুরু হলো যাত্রা। ক্রমাগত দক্ষিণে চলেছে তারা। দশমাইল সামনে বাফেট স্প্রিং, জানে ইয়াসীন। তবে, একটা বিশাল ঢালের চড়াই বেয়ে উঠতে হবে তাদের। ভীষণ কষ্টকর কাজ।

বাফেট স্প্রিং পৌঁছে, থামল দলটা। এখানেও আছে প্রচুর পানি। তৃষ্ণা কোনও সমস্যা নয় আর। তাই খাবারের কথা ভাবছে ওরা!

'আর কতদূর গেলে পাব খাবার?' ভাবনাটাকে শব্দে রূপ দিল পাওয়েল। 'অনেক তো হলো!'

কিছুই হয়নি। তবে হতে পারে যদি হাঁটো আরও মাইল বিশেক। বিটার স্প্রিং-এ পৌঁছে যাবে। বেশ বড় ঝর্ণা। হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে কোনও মরুকাফেলার সাথে। হাত পাতলে জুটেও যেতে পারে খাবার। যেন কিছুই হয়নি, এমন ভঙ্গিতে বাতাসের উদ্দেশে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল ইয়াসীন।

মোকাটো বিড়বিড় করে শাপ দিল নির্লিপ্ত ইয়াসীনকে। এমনভাবে তাকাল পাওয়েল, যেন সব দোষ ইয়াসীনের। তার কাঁধ চাপড়ে দিল ইয়াসীন। 'বিটার স্প্রিং থেকে ক্যাম্পকেডি খুব দূরে নয়,' বলল।

'তোমার কাছে দক্ষিণ মেরুও খুব দূরে নয়।' আহত স্বরে জবাব দিল পাওয়েল।

কোনও কথা বলছে না হেনরী। শুধু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ইয়াসীনের

দিকে।

সেটা লক্ষ করে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল পাওয়েল। সৈনিক হিসাবে সে সাহসী নয়। তাই বিপদের বার্তা সবার আগে পৌঁছায় তার কাছে। হেনরীর দৃষ্টিতে বিপদ দেখতে পেল সে।

অমন অদ্ভুত ভাবে ইয়াসীনের দিকে কেন তাকিয়ে আছে হেনরী? ষড়যন্ত্রে ভরা দুটো চোখ। শত্রুর দৃষ্টিতে যেন মেপে নিচ্ছে ইয়াসীনকে। ব্যাপারটা ভাল লাগল না পাওয়েলের। ইয়াসীনের দিকে ফিরল সে।

'ঠিক আছে। আমি তোমার সাথে,' জানাল পাওয়েল।

এর দুদিন পর, ক্যাম্পকেডিতে পৌঁছাল ওরা অবশেষে।

তখন গভীর রাত। ঢোকার মুখে সাবধান করল পাহারারত সৈনিক।

তা হলে ফিরে এলাম শেষপর্যন্ত! বিস্ময়কর ভাবনাটা নাড়াচাড়া করতে করতে নিজের কোয়ার্টারের দিকে এগোল ইয়াসীন। ক্ষুধায় ক্লান্তিতে অবশ হয়ে গেছে শরীর। এমন সময় পিছন থেকে তাকে ডাকল কেউ।

'সিপাহী ইয়াসীন! কমান্ডিং অফিসার তোমাকে রিপোর্ট করতে বলেছেন। এক্ষুণি। তাঁর অফিসে।'

চার

ক্যাম্পের এক প্রান্তে কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন রিচার্ডের অফিস। দরজায় ভারি ক্যানভাসের পর্দা। বিবর্ণ, ধূসর কাঠের দেয়ালে—মলিন কয়েকটা ম্যাপ। খটখটে চেয়ার টেবিলে সরুসরু ফাটল। মেঝেতে কিচ্‌কিচ্ করছে হালকা বালুর আস্তর। মরুভূমি উঠে এসেছে এখানেও!

ওধারে বসে আছে ক্যাপ্টেন রিচার্ড। গায়ে ইউনিফর্ম নেই, শুধু গেঞ্জি। এই মাত্র উঠে এল শয্যা ছেড়ে, তার প্রমাণ। মোমবাতির ম্লান আলোয়, তার মুখোমুখি হলো ইয়াসীন।

'সার।'

'সংক্ষেপে বলে ফেলো কী হয়েছিল,' বলল ক্যাপ্টেন।

বেছে বেছে শব্দ প্রয়োগ করল ইয়াসীন। অল্প সময়েই গত কয়েকদিনের সমস্ত ঘটনা জেনে গেল ক্যাপ্টেন। চেয়ার ছেড়ে উঠল সে। চিন্তিত ভঙ্গিতে এগোল দেয়ালের ম্যাপগুলোর দিকে। 'দেখাতে পারবে ঠিক কোন জায়গায়

ঘটেছিল ঘটনাটা?'

'ইয়েস, সার।' দেয়ালের কাছে এগিয়ে গেল ইয়াসীন। আঙুল রাখল একটা ম্যাপে। 'এখানে।'

'মাই গড! অত উত্তরে কেন গেল জুলিয়ান! তোমাদের কিছু বলেছিল? তার পরিকল্পনা সম্পর্কে কোনও আভাস বা অন্য কিছু?'

'এটা, অন্যান্য বারের মতই একটা রুটিন টহল। এটুকু জানানো হয়েছিল।'

চেয়ারে ফিরে গেল ক্যাপ্টেন। চিন্তিত ভঙ্গিতে তা দিচ্ছে গোঁফে। 'কতদিন আছ তুমি ইন্ডিয়ান ফাইটিং আর্মিতে?' ইয়াসীনের দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করল।

'তিন বছর সার।'

'চাকরির মেয়াদ তা হলে তোমার শেষ?'

'দশদিন বাকি আছে।'

'সার্ভিস রেকর্ড বলছে, দুবার কর্পোরাল পদ পর্যন্ত প্রমোশন হয়েছিল তোমার। নেমে গেলে কী কারণে?'

'মারপিট, সার। জাত তুলে গাল দিয়েছিল।'

'সেনাবাহিনীতে গালি হজম করা শিখতে হয়,' মন্তব্য করল ক্যাপ্টেন রিচার্ড। তারপর চট করে তাকাল ইয়াসীনের চোখে। 'অফিসার ছিলে কখনও?'

ক্ষণিক ইতস্তত করল ইয়াসীন। 'ইয়েস, সার। অন্য আর্মিতে।'

'ছেড়ে দিলে কেন? সেখানেও গাল দিয়েছিল কেউ?' তিক্তকণ্ঠে জানতে চাইল রিচার্ড।

'নো, সার। ভাল লাগেনি, তাই চলে এসেছিলাম। আমি একজন ভারতীয়, সার। বর্তমানে বৃটিশ শাসন চলছে সেখানে। দেশটা থেকেও নেই আমার। অগত্যা ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে যুদ্ধ করি দেশ-বিদেশে। ভাল না লাগলে করি না সে যুদ্ধ।'

'মিশরের বাহিনীতে ছিলে কখনও?'

'ইয়েস, সার

'দ্যাটস গুড।' ক্যাপ্টেন রিচার্ডের দৃষ্টিতে প্রশংসা। 'তা হলে, কিছু জানো মনে হয়।' ঠিক আছে, লিখিত রিপোর্ট চাই আমি। আর লেফটেন্যান্ট জুলিয়ানের সব জিনিসপত্র প্যাক করো এখানে নতুন এসেছিল সে। খুব বেশি জানি না আমি তার ফ্যামিলি সম্পর্কে তবে ব্যক্তিগত জিনিসপত্রগুলো পাঠাতে হবে তাদের কাছে।'

'এক্ষুণি সব করতে হবে, সার?'

ভ্রু তুলল রিচার্ড 'নো! আগে বিশ্রাম প্রয়োজন তোমার ঠিক আছে যাও

এখন। তবে অফিসার ছিলে তুমি, সুতরাং রিপোর্ট যেন সেরকমই হয়। মোযেভদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই আমি। ওদের জীবন, ওদের যুদ্ধ, ওদের এই মরুর দেশ, সবকিছু কৌতূহলী করে তোলে আমাকে।'

পরদিন দুপুরে ঘুম ভাঙল ইয়াসীনের। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। ব্যথায় টাটাচ্ছে ফুলে উঠা পা দুটো। চারদিক নিস্তব্ধ। ক্যাপ্টেনকে বাদ দিয়ে আর মাত্র আটজন সিপাহী আছে ক্যাম্পে। তার মধ্যে তিনজনের অবস্থা তারই মত শোচনীয়।

পা দুটোকে যথেষ্ট দয়া দেখিয়ে আস্তে আস্তে বিছানা ছাড়ল সে। ড্রেস করল, শেভ হলো ধীরেসুস্থে। তারপর খেয়েদেয়ে হাজির হলো জুলিয়ানের কোয়ার্টারে।

দরজায় মোটা ক্যানভাসের পর্দা। ভিতরে ঢুকে থমকে গেল ইয়াসীন। ট্র্যাঙ্কটা হাঁ করে খোলা। জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মেঝেতে। তার আগে ঢুকেছিল কেউ ওখানে।

বাইরে বেরিয়ে এল ও। মাটিতে নানা ধরনের পায়ের ছাপ। কোনটা গেছিল ঘর পর্যন্ত–বোঝা মুশকিল। পাশের কোয়ার্টারে ক্যাপ্টেন রিচার্ড থাকে। তাকে ডেকে আনল সে।

'চোর!' ধমকে উঠল রিচার্ড। 'আটজন মাত্র মানুষ, তার ভেতরেই চোর!'

'সাতজন সার।' তাকে শুধরে দিল ইয়াসীন। 'আমার পারমিশন আছে ঢোকার।'

'ঠিক আছে, দেখছি আমি।' আর কথা না বাড়িয়ে নিজের কোয়ার্টারে চলে গেল ক্যাপ্টেন রিচার্ড।

সাবধানে, জুলিয়ানের জিনিসপত্র গুছিয়ে ট্রাঙ্কে তুলল ইয়াসীন। সম্ভবত খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর সাদাসিধে মানুষ ছিল লেফটেন্যান্ট জুলিয়ান। মরুভূমিতে ডিউটিতে আসা একজন অফিসারের জন্যে কিছুটা বেমানান। কেমন খটকা লাগল তার আবার উল্টেপাল্টে দেখল সে জিনিসগুলো।

প্রতিটা ইউনিফর্ম নতুন। প্রতিজোড়া বুট নতুন। একজোড়া ইউনিফর্ম ও একজোড়া বুট কখনও ব্যবহার করা হয়নি আগে। নিত্যদিনের অপরিহার্য জিনিসগুলোও নতুন কেনা। সদ্য কমিশন প্রাপ্ত অফিসাররাও এভাবে সব নতুন জিনিস পত্র নিয়ে চাকুরীতে আসে না। মরুভূমিতে তো নয়ই। তা ছাড়া, ব্যাচেলর হলে–তাদের সাথে থাকে ছবি, পত্রিকা, বই বা সময় কাটানোর জন্য অন্য কিছু। সে-সব কিছুই আনেনি জুলিয়ান। এমন কী মরুভূমিতে অতি প্রয়োজনীয় একটা বাড়তি সাবানও নয়। বোধহয় জানত–অল্পদিনেই চলে যাবে সে।

একে একে জিনিসপত্রগুলোর একটা ফর্দ তৈরি করল ইয়াসীন। তারপর নিজে নিয়ে আসা ছোট্ট পোঁটলাটা খুলে ঢালল টেবিলের উপর। এগুলোও জুলিয়ানের

তার মৃতদেহ হতে ইয়াসীন সংগ্রহ করেছিল, ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনার জন্য। একটা সোনার আংটি, রুমাল, তিনটে চাবিসমেত একটা রিং ও একটা মানিব্যাগ।

মানিব্যাগটা খুলল সে। ঝনঝন করে দশটা সোনার ঈগল পড়ল টেবিলে। আরিব্বাপ—রীতিমত বড়লোক! মানিব্যাগটা রেখে দিচ্ছিল ইয়াসীন। কী মনে করে আবার হাতিয়ে দেখল। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মোটা মনে হচ্ছে। একটা গোপন পকেট। তার ভিতরে পাওয়া গেল ভাঁজ করা একখণ্ড মলিন কাগজ-আকৃতির পাতলা চামড়া।

দুর্বোধ্য আঁকিবুকি তাতে। লাল কালিতে বেশ কয়েকটা গুণ চিহ্ন আর ছোট্ট বৃত্ত। একটু লক্ষ করতে সংকেতগুলো চিনে ফেলল ও। গুণ চিহ্ন পাহাড় আর বৃত্ত-ওয়াটার হোল নির্দেশ করছে। মোযেভ মরুভূমির ম্যাপ আঁকা রয়েছে পাতলা চামড়াটায়!

ম্যাপটা অসম্পূর্ণ। ডেথভ্যালি দেখানো হয়নি। যে পর্বতশ্রেণী মোযেভ মরুভূমিকে পশ্চিমের সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে তাও অনুপস্থিত। অনেক ছোট ছোট পাহাড় বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে কলোরাডো নদীটা দেখানো হয়েছে নিখুঁত ভাবে। এবং ইয়াসীনরা যে এলাকায় টহলে গিয়েছিল তার উত্তর পুবের মরুভূমি আর পাহাড়গুলো স্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত। কৌতূহল জাগানো একটা ম্যাপ। মরুভূমি সম্পর্কে যার বিস্তারিত অভিজ্ঞতা নেই, তার পক্ষে কিছুই বোঝা সম্ভব নয়। হয়তো গোপনীয় কোনও ম্যাপ!

কিছুক্ষণ চিন্তা করল ইয়াসীন। ম্যাপটা ভাঁজ করে রেখে দিল নিজের পকেটে। বাকি সব কিছু ঢুকাল ট্রাঙ্কে। তারপর সেটা বয়ে নিয়ে চলল ক্যাপ্টেন রিচার্ডের কোয়ার্টারে।

'ওটা তোমার জিম্মায় রেখে দাও,' বলল ক্যাপ্টেন রিচার্ড। 'আগামীকাল স্যানবার্নারডিনো যাবে এক মরুযাত্রী। তার কাছে দিও। এই ঠিকানায় পৌঁছে দেবে।' ঠিকানাটা দিল সে।

নিজের কোয়ার্টারে ট্রাঙ্কটা নিয়ে চলল ইয়াসীন। ভিতরে ঢোকার মুখে হেনরীর সাথে দেখা।

'এটা কি জুলিয়ানের ট্রাঙ্ক?'

'হ্যাঁ। আমার জিম্মায় রাখতে হবে আপাতত।'

'তারপর?'

'পাঠিয়ে দিতে হবে একটা ঠিকানায়। তার বোন না কে যেন হয়—তার কাছে।'

'মাত্র একটা ট্রাঙ্ক। তাও খুব বেশি জিনিস ধরবে না ওতে। এর আগে যে

ছাউনিতে ছিলাম, সেখানে পুরো একটা সংসার নিয়ে আসত অফিসাররা। জুলিয়ান একটু অন্যরকম ছিল, কী বলো?'

'জানি না।'

'রিচার্ডের সাথে তোমার একটু বেশি মাখামাখি মনে হচ্ছে আজকাল। কী ব্যাপার?' চোখ টিপল হেনরী।

'একজন অফিসারের কমতিতে, কিছু অফিসারের কাজ করে দিচ্ছি আর কী।' কথাগুলো বলে আর দাঁড়াল না ইয়াসীন। ঢুকে গেল নিজের কামরায়।

মনে মনে হেনরীকে অপছন্দ করে সে। বেয়াড়া ধরনের আচরণ। শক্ত শরীর। কিছুতেই কাবু হয় না। বুলেটের জখমটা বেশ মারাত্মক ছিল ওর। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল। সেই অবস্থায় লড়ে ফিরে এসেছে। পাওয়েলের মত ভেঙে পড়েনি। এরাই টিকে থাকে। আর যারা টিকে থাকে, তাদের অধিকাংশই মন্দলোক।

ইয়াসীনের মাথায় ঘুরছে ম্যাপটা। ওটার জন্যেই হয়তো গোপনে ঢুঁ মেরেছিল কেউ জুলিয়ানের কোয়ার্টারে। ধারণাটা অমূলক হতে পারে। হয়তো হুইস্কির নেশা চেপে গিয়েছিল কারও। থাকতে না পেরে...।

কিন্তু ম্যাপ কেন? সংকেতের সাহায্য নিয়ে আসলে কী দেখানো হয়েছে? আর জুলিয়ানের কাছেই বা তা আসল কীভাবে। সে তো এসেছিল। এ অঞ্চলে জীবনে এই প্রথম!

যে এঁকেছে সে-ও খুব ভাল চেনে না অঞ্চলটা। হয়তো একবার মাত্র এসেছিল। পাহাড়গুলো নিখুঁতভাবে আঁকতে পারেনি। অবশ্য কম্পাসের অভাবেও হতে পারে অমন। কলোরাডো নদীর পশ্চিম ও উত্তর দিকটা দেখানো হয়েছে। ক্যাম্পকেডির এই ছাউনি ও তার আশপাশটা বাদ গেছে। খুব প্রাচীন ম্যাপ। এবং সম্ভবত অসম্পূর্ণ।

তা হলে বাকিটা কোথায়? ক্যাপ্টেন রিচার্ডের কথা মনে হলো ইয়াসীনের। মন্দ নয় লোকটা। তবে ঝিমিয়ে গেছে বেশ বয়স আর মরুভূমির সম্মিলিত ফলাফল। ধার নেই তেমন হয়তো ভাল সুযোগ পায়নি ক্যারিয়ার গড়ার। অথবা এসেছিল সুযোগ, চিনতে পারেনি।

সেনাবাহিনী এরকমই। খুব বেশি সুযোগ আসে না তবে বড় যুদ্ধটুদ্ধ বাধলে আলাদা কথা। কিন্তু যুদ্ধের কোনও সম্ভাবনা নেই অদূর ভবিষ্যতে। অর্থাৎ রিচার্ডের ভবিষ্যৎও শেষ। বাকি দিনগুলো কাটবে এ ক্যাম্প হতে ও ক্যাম্পে একঘেয়ে, নিরুত্তাপ বড়জোর মেজর পর্যন্ত উঠতে পারে।

রাইফেল আর জুলিয়ানের কাছে পাওয়া পিস্তলটা পরিষ্কার করতে করতে

বিকেল হয়ে গেল। মোকাটোকে সাথে নিয়ে ছাউনির বাইরে আসতে হলো ইয়াসীনকে। ক্যাম্পের ঘোড়াগুলোকে নিয়ে এসেছে ওরা। কিছু দূরে একটা ঘেসো মাঠ আছে। খাওয়াতে হবে ঘোড়াগুলোকে।

হেঁটে যাচ্ছে ওরা। বেশ সামনে একটা ঝোপ। তার আড়ালে সামান্য নড়াচড়া। সতর্ক হয়ে গেল ইয়াসীন। এদিকে আসে না ইন্ডিয়ানরা। তা হলে কে?

ঝোপটার কাছে এগিয়ে এল। নেই কেউ। তবে ছিল। বুটের ছাপ দেখা যাচ্ছে বালিতে। অনায়াসে চিনতে পারল ইয়াসীন। হেনরীর বুটের ছাপ। তাকে আড়াল থেকে লক্ষ করছে হেনরী।

কী চায় হেনরী? ম্যাপটা? সে কি জানে ওটার অস্তিত্ব? নাকি স্বর্ণমুদ্রাগুলোর ধান্ধায় আছে। হেনরীকে খুব ভাল চেনে না ইয়াসীন। সেও এখানে এসেছে অল্পদিন। জুলিয়ানেয় কোম্পানীতে একই সাথে এখানে এসেছিল, আরও দুজনের সাথে। ভীষণ লোভী মনে হয় লোকটাকে।

পৌঁছে গেল ওরা মাঠটাতে। ছোট্ট এক চিলতে জমি। ঘাস বেশি নেই। চারদিকে সেই চিরাচরিত মরুভূমি অথবা পাহাড়। এখানে ওখানে বৃক্ষের হঠাৎ বসত। যেন করুণা করেছে এই রুক্ষ অঞ্চলটাকে।

রোদের তাপ এখনও কমেনি। সবকিছু কেমন কাঁপা কাঁপা। একটা হাওয়ার ঘূর্ণি বালি উড়িয়ে প্রেতের নাচ নাচছে দূরে। আরও অনেক দূরে অস্পষ্ট নীল পাহাড়ের সারি দিগন্তে বিলীন। নিষ্কলুষ আকাশ। অরণ্য নির্বাসিত ঊষর প্রান্তর। তবু কী শান্ত নির্জন। এ-ও এক দেশ। এক আলাদা সৌন্দর্য!

ভালবাসি এই বেঁচে থাকা—মনে মনে উচ্চারণ করে ইয়াসীন।

তবু এখানে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হয়। নইলে বাঁচতে দেয় না মোযেভরা। দোষ মোযেভদের নয়। তারাও যুদ্ধ করে বাঁচে। তারাও ভালবাসে এই রুক্ষ প্রান্তর। এই বেঁচে থাকা!

অবশ্য দিন ফুরিয়েছে ইয়াসীনের। মেয়াদ শেষ হয়েছে চাকুরীর। ভাললাগার হিসাব যাই হোক—চলে যেতে হবে এদেশ ছেড়ে। চাকুরীর হিসাবে।

আর কয়েকটা দিন বাকি। তারপর? কোথায় যাবে ইয়াসীন? কোথায় ফিরবে? জন্মভূমিতে? অথবা বোস্টনে? নাকি এক রণাঙ্গন হতে আর এক রণাঙ্গনে অব্যাহত থাকবে তার এই ছুটে চলা। এবারে কোন্‌দিকে তা হলে? কোন্ দেশে?

শুরুটা হয়েছিল ভারতে। বাংলায়।

ইয়াসীন বেগ নামে এক কিশোর নবাব তনয়—বাড়ি হতে পালিয়ে গিয়ে যোগ দিল বৃটিশ সেনাবাহিনীতে। তেমন কোনও কারণ নেই? অথবা ছিল কারণ!

কিন্তু সেই যে গেল—আর ফিরল না পিছনে।

সেনাবাহিনীতে দারুণ দক্ষতা দেখাল দামাল ছেলেটা। সুনজরে পড়ে গেল জেনারেলের। বৃটেনে পাঠিয়ে দেয়া হলো তাকে, রানীর গার্ড রেজিমেন্টের জন্য। পড়াশুনার সুযোগ দেওয়া হলো।

সুযোগের সদ্ব্যবহার করল ইয়াসীন। একজন তরুণ অফিসার হিসেবে যোগ দিল ফ্রান্সিস টাউনসেন্ড ওয়ার্ডের সেই বিশ্বখ্যাত সেনাদলে। যুদ্ধ করতে চলে গেল সুদূর সাংহাই।

মোকাও দখল করার পর অকস্মাৎ দুঃসংবাদ এল ভারত হতে। সিপাহী বিদ্রোহের কারণে সেখানে হত্যা করা হয়েছে হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্যকে। ভীষণ চোট লাগল মনে। ছেড়ে দিল সে বৃটিশ সেনাবাহিনী। লুকিয়ে উঠে পড়ল সমুদ্রগামী এক জাহাজে।

কোথায় যাবে ঠিক নেই কোনও।

বন্দর আব্বাসে হঠাৎ নেমে গেল জাহাজ হতে। পারস্য অতিক্রম করে–হাজির হলো আফগানিস্তান। যোগ দিল বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে।

কিন্তু নানান বিশৃংখলতার কারণে বেশিদিন টেকা গেল না। পালাতে হলো।

তারপর হাজার মাইল খাঁ খাঁ মরুভূমি পাড়ি দিয়ে–উত্তর আফ্রিকা!

সেখানে তখন যুদ্ধ করছিল ফ্রান্সের সেনাবাহিনী। তাদের দলে যোগ দিল ইয়াসীন। না দিয়ে উপায় ছিল না। পকেটে পয়সা নেই। যুদ্ধ ছাড়া জানা নেই অন্য কিছু।

অল্পদিনেই ইয়াসীনের প্রতিভার পরিচয় পেল তারা। ওকে ক্যাপ্টেনের র‍্যাংক দেওয়া হলো। কিন্তু সে যুদ্ধটাও ভাল লাগল না বেশিদিন।

তাই আমেরিকার উদ্দেশে পাড়ি জমাল সে। এখানেও যোগ দিল সেনাবাহিনীতে। যুদ্ধ করে ফিরতে লাগল এক রণাঙ্গন থেকে আর এক রণাঙ্গনে।

'ইয়াসীন!' ক্যাপ্টেন রিচার্ডের গলা চমকে দিল তাকে। কখন যেন ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসেছে ক্যাপ্টেন।

'ইয়েস, সার।'

'ফিরে গিয়ে কী করবে?'

'জানি না, সার।'

'টাকা পয়সা জমেছে কিছু?'

'সামান্য।'

'তা হলে কোনও ব্যবসায় নামতে পারো। লাস ভেগাসে আমার ভাইয়ের একটা হোটেল ব্যবসা আছে। তুমি বললে তার কাছে একটা চিঠি লিখে দিতে পারি।'

'ভেবে দেখি, সার।'

'ভাববার খুব একটা সময় নেই। মাত্র কয়েকটা দিন বাকি আছে তোমার। আমিও চলে যাব এখান থেকে। বদলির আদেশ এসেছে আমার।'

'সার?'

'হ্যাঁ। নতুন কমান্ডিং অফিসার একজন মেজর। মেজর আব্রাহাম সাইক।'

নামটা শোনার সাথে সাথে চোয়াল শক্ত হলো ইয়াসীনের। 'তাকে চিনি, সার।'

পাঁচ

'চেনো মেজরকে!' বিস্মিত ক্যাপ্টেন রিচার্ড।

'ইয়েস, সার। একাধিকবার দেখা হয়েছে আমাদের। আমাকে তার পছন্দ হয়নি। আমরা ভারতীয়রা বিধাতার অপসৃষ্টি—একথাটা প্রচার করতে ভালবাসে সে।'

'আমিও শুনেছি কথাটা। আশা করি তার সাথে আর একবার দেখা হওয়ার আগেই তোমার ছাড়পত্র এসে যাবে।'

'ওতে খুব একটা আসে যায় না, ক্যাপ্টেন। আমরা ভারতীয়রা অনেক সয়েছি ব্রিটিশদের অত্যাচার। আর একটুতে খুব একটা হেরফের হবে না। তা ছাড়া আমাদেরও নিজস্ব ঘৃণা ভালবাসা আছে।'

'দেশ ছাড়লে কেন তবে?'

'অজানার সন্ধানে।'

'ঐশ্বর্যের সন্ধানে নয়?'

'এ প্রশ্ন হঠাৎ!' মনে মনে সতর্ক হয়ে গেল ইয়াসীন।

'কেন, শোনোনি তুমি? এই মোযেভ মরুতে নাকি লুকানো আছে রাশিরাশি সোনা!' খাদে নামল ক্যাপ্টেনের গলা।

'কোথায়?'

'ওরা বলে সোনার নদী। এই মরুভুমির নীচে কোথাও বয়ে চলেছে। হারিয়ে গেছে বিশাল একপাতাল গুহায়!'

শ্রাগ করল ইয়াসীন 'ওরকম গল্প সব মরুভূমিরই থাকে। অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানরা বেরিয়ে ছিল আফ্রিকা বিজয়ে। খৃষ্টানদের কাছ হতে তারা জিতে নেয়

সমস্ত উত্তর আফ্রিকা। ফলে, অনেক খৃষ্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে প্রাণ বাঁচায়। কিন্তু ধ্বংস হয়ে যায় বাকিরা। কেউ মারা পড়ে, কেউ অন্যত্র পালিয়ে যায়, কেউ বা আত্মগোপন করে। ফলে অবশিষ্ট থাকে না কোনও খৃষ্টান। স্রেফ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তারা।

'ওদিকে আজব সব গল্প তৈরি হলো সাহারা মরুভূমিকে ঘিরে। গভীর রাতে নাকি রহস্যময় গুমগুম শব্দ শোনা যায়। চাঁদনী রাতে ধু-ধু মরুভূমিতে ক্ষণিকের জন্যে দেখা যায় বেপরোয়া ঘোড়সওয়ারদের অপসৃয়মাণ ছায়া। ওখানকার বর্বর আর তুরেগরা বলে-মরুভূমির নীচে নাকি বিশাল সব পাতাল শহর গড়ে তুলেছে খৃষ্টানরা। ওই শব্দ সে সব শহরের। যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। আর সুযোগের অপেক্ষায় আছে। আচমকা আক্রমণ করে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে মুসলমানদের।'

'তা হলে তো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে তাদের!' হালকা গলায় বলল রিচার্ড। 'তবে মোযেভ মরুভূমির, সব কথাই কিন্তু গুজব নয়। থাকতেও তো পারে তেমন কোনও নদী? যা-মরুভূমির তাপ সইতে না পেরে হারিয়ে গেছে নীচে। হয়তো কেনেও সোনার খনি আছে নদীটার আশেপাশে কোথাও। মোযেভদের কথাই ভেবে দেখো। প্রচুর সোনা ব্যবহার করে ওরা। কোথায় পায়?'

'বয়সে তুমি যুবক-ইয়াসীন। স্বপ্ন দেখার বয়স তোমার। সুখের স্বপ্ন, ঐশ্বর্যের স্বপ্ন, রাশি রাশি সোনার স্তূপের সোনালী স্বপ্ন। তোমার বয়েসটা যদি থাকত আমার!' শেষের দিকে উদাস হয়ে গেল রিচার্ড।

পরের কয়েকটা দিন কাটল সাদামাটা। তিনজনের একটা দল দক্ষিণের ট্র্যাকগুলোতে টহল দিয়ে ফিরে এল। পুবে বেরোল তিনজনের আর একটা দল। ইন্ডিয়ানদের মুখোমুখি হলো তারা। সামান্য গুলি বিনিময়ও হলো। তবে ঘটনা বলতে যা বোঝায়, ঘটল না তেমন কিছু। কয়েকবার মোযেভদের দেখা গেল ক্যাম্পকেডির আশেপাশে।

দুবার দুটো ওয়াগনের বহর-কলোরাডো যাবার পথে ক্ষণেক থেমে গেল ক্যাম্পে। লা-পাজ এর কাছে একজনের অকালমৃত্যুর দুঃসংবাদ রেখে গেল তারা। শক্তপোক্ত মরুযাত্রী সব। কাফেলায় কাফেলায় জীবন কেটেছে তাদের। মরুভূমি আর মোযেভ-দুটোই ভাল চেনে। জানে কী করে ওদের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে হয়। তবু কোনও যাত্রায় কমবেশি লোকসান এড়াতে পারে না। হয়তো ঘোড়া কিংবা ওয়্যাগনগুলো কেড়ে নিল ইন্ডিয়ানরা। কখনও হয়তো ঘোড়া মরূদ্যানে কোনওদিনই পৌঁছাতে পারল না কোনও মন্দ-ভাগ্য মরুযাত্রী। তবু এগিয়ে যায় ওদের ওয়্যাগনের কাফেলা!

জীর্ণ চেহারা ক্যাম্পকেডির। অনেকদিন আগে কাঁচা ইট গেঁথে কতগুলো ঘর তোলা হয়েছিল। সংস্কারের অভাবে তার অধিকাংশ ধসে যাচ্ছে। কখনও কখনও কলোরাডোর অকাল বন্যা এসে চেটে খায় কাঁচা ইটের মেঝে। ধ্বংস ত্বরান্বিত হয়।

কয়েকটা ঘরের অল্পবিস্তর সংস্কার করল ইয়াসীন ও অন্যান্যরা। দুটো কুড়েঘর নির্মাণ করা হলো শুকনো ডালপালা ও পাতা দিয়ে। ঘোড়ার খোঁয়াড় পরিষ্কার করা হলো। সেনাবাহিনীর একটা বড় দল আসার কথা শীঘ্রিই। কিন্তু এল না। এল না ইয়াসীনের ছাড়পত্র।

সেদিন সামনের চত্বরে গজিয়ে ওঠা ছোট ছোট ঝোপগুলো পরিষ্কার করছিল ইয়াসীন। ক্যাপ্টেন রিচার্ড এল পরিদর্শনে।

'লেফটেন্যান্ট জুলিয়ান সম্পর্কে কিছু বলার ছিল, সার,' তাকে বলল ইয়াসীন।

'গো অন।'

'আমার সন্দেহ লেফটেন্যান্টের পরিচয় ভুয়া ছিল।'

'হোয়াট?'

'তার চালচলন কথাবার্তা অবশ্য অফিসারের মতই। হয়তো সে অফিসার ছিল অতীতে। তবে এই ক্যাম্পে তার ডিউটিতে আসার অর্ডারটা মনে হয় জাল।'

'কিন্তু ভুয়া পরিচয় দিয়ে এই মরুভূমিতে চাকুরীর জোয়াল টানতে আসবে কোন্ বোকা!'

'জোয়াল টানতে হয়তো আসেনি। কিছু খুঁজতে এসেছিল। ইন্ডিয়ানদের এই এলাকায় কিছু খুঁজতে এলে প্রয়োজন হয় সশস্ত্র সঙ্গী ও পর্যাপ্ত রসদ। আর আর্মি অফিসারের পরিচয়টা দাঁড় করাতে পারলে অনায়াসে মিলে যায় দুটোই।'

'কিন্তু কী খোঁজার আছে এই নরকে?'

'কেন, সার? আপনিই তো বলেছিলেন—সোনার নদী আছে এই মরুভূমিতে কোথাও? বয়সে তরুণ ছিল জুলিয়ান। স্বপ্নের বয়স।'

'আরে ওসব তো কেবল কথার কথা। মরুভূমিতে কিছুই থাকে না। শুধু বালি আর আজগুবী সব গপ্পো ছাড়া।' অবহেলায় বাতাসে হাত ঝাপটে বলে রিচার্ড।

অবয়বে অব্যক্ত হতাশা!

ঘোড়াগুলো দিনে চলতে দেওয়া হয় ন্যাড়া মাঠটাতে। উইলী পাহারা দিচ্ছিল ওগুলো। ইয়াসীন যোগ দিল তার সাথে। তখনও সকাল।

পাহাড়ের কাজল ছায়া পড়েছে—দূরের ক্যানিয়নগুলোতে। পাহাড়ের চূড়ায় চিকমিক করছে রোদ। অপরূপ আলোছায়া। প্রহরে প্রহরে বসন পাল্টায়

মরুভূমির পাহাড়। সূর্যোদয়ে একরকম, সম্পূর্ণ আলাদা সূর্যাস্তে।

'দেশটাকে মাঝে মাঝে খুব ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। অবশ্য তোমাদের মিনেসোটা হয়তো আরও সুন্দর।' উইলিকে বলল ইয়াসীন।

'এর চেয়ে অনেক সুন্দর।' জন্মভূমি সম্পর্কে চিরকালীন সিদ্ধান্তটা জানাল উইলী। 'সবকিছু অন্যরকম সেখানে। এমনকী সিউ ইন্ডিয়ানরাও।'

'লেফটেন্যান্ট জুলিয়ানের সাথে এখানে এসেছিলে তুমি, তাই না, উইলী?'

'সাথে ঠিক নয়। বেলাইউনিয়নে স্টেজকোচের অপেক্ষায় ছিলাম আমরা। এমন সময় অফিসার এল সেখানে। জানাল সে-ও ক্যাম্পকেডির যাত্রী।'

'কেউ তুলে দিতে আসেনি?'

'একজন। তীক্ষ্ণ চোখ আর ভাঙা নাক লোকটার। ফিসফিসিয়ে কথা বলে ভিতরের বুক পকেট থেকে একটা লম্বা খাম দিয়েছিল লেফটেন্যান্টকে। এই ক্যাম্পে বদলির কাগজপত্র ছিল তাতে।'

'তুমি জানলে কী করে?' ঝট করে তার চোখে তাকাল ইয়াসীন।

'ক্যাপ্টেন রিচার্ডের অফিসে নিয়োগপত্র হিসাবে ওই ইনভেলাপটাই দাখিল করতে দেখেছি তাকে আমি।'

'হয়তো কোনও পাড়া প্রতিবেশী।'

'নাহ্-তার চেয়েও ঢের ঘনিষ্ঠ কেউ। না হলে অফিশিয়াল কাগজপত্র তার কাছে রাখতে দেয়!'

হুঁ-তা হলে জুলিয়ানের বদলির কাগজগুলো ছিল আর একজনের পকেটে!

প্রসঙ্গ পাল্টাল ইয়াসীন। কিন্তু কোনও আলাপই জমল না বেশিক্ষণ। অগত্যা ফিরে এল সে মাঠ থেকে।

কোয়ার্টারে ঢুকেই ধাক্কা লাগল হেনরীর সাথে। চোখ আটকে গেল মেঝেতে ছড়ানো নানান জিনিসপত্রে। ডাফেলব্যাগটা হাঁ হয়ে আছে!

'কী হচ্ছে এখানে? মরবার জায়গা ছিল না আর?' ধমকে উঠল ইয়াসীন।

'তামাকের তেষ্টা পেয়েছিল খুব। ভাবলাম তোমার যদি থাকে-'

'থামো। ঠগ কোথাকার। আমি সিগারেট খাই না, ভালভাবেই তুমি জানো।'

জোর করে হাসবার চেষ্টা করল হেনরী। 'তাইতো! মনেই ছিল না কথাটা।'

'ফের যদি আমার কামরায় দেখি তোমাকে-বাপের নামটাও ভুলিয়ে ছেড়ে দেব।'

'ও. কে, সার্জেন্ট। তোমার বাপের নামটাও মুখস্থ রেখো।' ইয়াসীনকে ঠেলে-বেরিয়ে গেল সে।

কী খুঁজতে এসেছিল হেনরী? সে-ও কি জানে গোপন কোনও তথ্য? নাকি

নিছক কৌতূহল।

পর্দার ফাঁক দিয়ে দূরে তাকাল ইয়াসীন। বাইরে একটানা বালি আর রোদ। বাতাস থমকে আছে। মানুষের চিহ্ন নেই কোথাও। তবু ইন্ডিয়ানরা আশেপাশেই আছে। সামান্য সুযোগের অপেক্ষায়। যদি জানত–এখানে সৈন্যের সংখ্যা মাত্র আট!

তদারকির কাজগুলো আজকাল ছেড়ে দিয়েছে ক্যাপ্টেন রিচার্ড। ইয়াসীনই করে দেয় সব। ঘোড়াগুলোকে খোঁয়াড়ে ফিরিয়ে আনল সে। ডিউটি বেঁটে দিল সৈন্যদের মধ্যে। বেলা শেষ প্রায়।

পাহাড়ের চূড়ায় ঝুলে আছে শেষ বিকেলের সূর্য। তারপর নেই। ঝপ করে নামল রাত। মরুভূমি মুখে টেনে নিয়েছে কালো নেকাব।

রাতের প্রথম প্রহর সামলাবে দুজন। হেনরী আর কিড। আলাদা ধরনের দুই চরিত্র। মরুভূমিতে অভ্যস্ত হেনরী ফাঁকি দেবে না ডিউটিতে। এখানে ডিউটিতে ফাঁকি দেওয়া মানে নিজেরই বিপদ। এতদিনে ভাল করে জেনে গেছে সে। কিড অবশ্য এতখানি উপলব্ধি করে না। প্রয়োজনও মনে করে না। মনে তার একটাই চিন্তা। পালাতে হবে আর্মি থেকে। যত শীঘ্র সম্ভব।

'ক্যাপ্টেনকে একটু বুঝিয়ে বলো না, সার্জেন্ট!' ইয়াসীনকে সেধেছে কিড। 'এই যুদ্ধ-টুদ্ধ আসলে আমার কম্মো নয়। বউটার উপর মেজাজ দেখাতে চলে এসেছি ঝোঁকের মাথায়। আসলে তো ভালবাসি। ফিরে যেতে চাই।'

করুণ হাসল ইয়াসীন। 'চাইলেই যদি ফিরে যাওয়া যেত!'

'মানে? জোর করে রেখে দেওয়া হবে নাকি আমাকে!'

'এটা গোল্লাছুট খেলা নয়, ম্যান। ইচ্ছে করলেই তুমি থুড়ি বলতে পারো না এখানে।'

'তা হলে বউ? ছেড়ে দেবেতো আমাকে!'

'যদি সে ভয় থাকে তবে তুমিই ছেড়ে দাও তার চিন্তা। ভাল থাকবে। লাগাম টেনে ধরো বোকা মনটার। মাঠ থেকে ইচ্ছামত বিদায় নেওয়া যায় না এ খেলায়। শেষ পর্যন্ত খেলে, তারপর যাওয়া।'

কোয়ার্টারের সামনে সময় কাটাতে বসে আছে ইয়াসীন। আকাশে চোখ ঠিকরে পড়ছে চাঁদ। ঘোলা জোছনায় কেমন এলোমেলো মনে হয় সব। দূরে কাছে ছায়ার লুকোচুরি। যেন ওত পেতে আছে কোনও ঘাতক ইন্ডিয়ান। কী অসহ্য নিঝুম চারদিক!

ইয়াসীনের সাড়া পেয়ে বাইরে আসে রিচার্ড। 'বুঝি না এই দেশ, এই মানুষ। তবু ছেড়ে যাবার কথা মনে হলে বুকের মধ্যে দুঃখের ধস নামে!' আনমনে

বলে সে।

'যোদ্ধার বেশেই জীবনটা কাটিয়ে গেলেন। তাই না, ক্যাপ্টেন?'

'তবু যুদ্ধ করা হলো না, এই যা দুঃখ। নইলে আজ জেনারেল হয়ে বিদায় নিতে পারতাম।'

'মানে?'

'আর্মিতে ঢুকেছিলাম বড় যুদ্ধটার আগে। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা ছিল আমার। রক্তে ছিল প্রলয় মাতন। অথচ সেটা শান্তির সময়। একটা ভাল লড়াইয়ের জন্যে আফসোস করে করেই জুড়িয়ে গেলাম। সেনাবাহিনী ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় নামলাম।'

'জেনারেল হপকিন্‌স্ এর মত?'

'অনেকটা। তবে সঠিক সময়ে আর্মিতে ফিরতে পেরেছিল সে। কিন্তু ব্যবসার লোভ আমাকে লড়তে দিল না। তারপর গেরিলাবাহিনী যখন আমার স্টোরটা পুড়িয়ে দিল, ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। আবার তুলে নিলাম রাইফেল আর ইউনিফর্ম। অথচ যুদ্ধের আগুন তখন নিভে গেছে। ফিরে এসেছে শান্তির শীত!'

'জীবনে উন্নতি করার জন্য যুদ্ধটা হয়তো প্রয়োজন ছিল আপনার। কিন্তু সবাই চায় শান্তি।'

'শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই যুদ্ধ করে মানুষ। কিন্তু তোমার মুখে এসব কথা কেন, ইয়াসীন? তুমিও তো যোদ্ধা একজন।'

'পরাধীন দেশে জন্মেছি, সার। জীবন মানেই একটা ক্ষমাহীন যুদ্ধ, আমার কাছে।'

'মেজর আব্রাহাম সাইককে কতদিন ধরে চেনো?'

'তা, হবে অনেকদিন। সে-ই তো কর্পোরাল পদ থেকে নামিয়ে দিয়েছিল আমাকে। দু'দুবার।'

'বিশেষ কিছু ঘটেছিল নাকি?'

'মনে নেই ভাল। তবে একদিন আগবেড়ে একটু উপকার করতে গেছিলাম তার। কাপড় কাচা নিয়ে আন্দাজে ঝগড়া বাধিয়েছিল এক চাইনীজ ধোপার সাথে। অথচ ভাষাটা জানে না সে। আমি এগিয়ে গেছিলাম দোভাষীর ভূমিকায়। তাতে খুশি হবার বদলে উল্টে রেগে গেল আমার ওপর।'

'দোভাষী? চাইনীজ জানো নাকি তুমি?'

'সাতটা ভাষা জানি আমি, সার। কিন্তু একজন ভারতীয়র জন্যে সেটাও অপরাধ। অকারণে দুর্ব্যবহার শুরু করল মেজর। সবচেয়ে কঠিন ডিউটিগুলো চাপিয়ে দি আমার ঘাড়ে। টেনে যাচ্ছিলাম তবু। কিন্তু মেয়েটা ডুবিয়ে দিল

একদম।'

'মেয়ে!'

'মরুভূমির ক্যাকটাস ফুলের মত। দুষ্প্রাপ্য, সুন্দর। মেজর সাইক নিমন্ত্রণ করেছিল তাকে। ঘুরে ফিরে দেখছিল সে আমাদের সেনানিবাস। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল হঠাৎ। মেজর ইয়াসীন!—বলে ছুটে এল কাছে।

'আমি তো হতবাক। চিনতে পারলাম না সহসা। তারপর নাম বলতেই মনে পড়ল সব। খুব মিষ্টি একটা নাম। বেলিন্দা!

'ওর সাথে দেখা হয়েছিল চীনে। সোকাও-এর কাছাকাছি একটা প্যাগোডার পাশে পজিশন নিয়েছিলাম আমরা। এমন সময় সেখানে এল ওরা। বেলিন্দা আর তার বাবা। পালিয়ে এসেছে বিদ্রোহীদের বন্দী শিবির হতে। এমনিতেই শত্রুরা ঘিরে ফেলেছিল আমাদের। তার উপর ক্ষুধার ক্লান্তিতে অবসন্ন দুজন অসহায় মানুষের বোঝা। কিন্তু সার—সেটা ছিল ওয়ার্ডের দুর্ধর্ষ সেনাদল। আর আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আমাকে। চীন সাগরের টাইফুন বইয়ে দিয়েছিলাম গোটা অঞ্চলটার ওপর। শত্রুর অবরোধ ভেঙে তছনছ করে বেরিয়ে এসেছিলাম মুক্ত এলাকায়।

'চিনতে না পারার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিলাম বেলিন্দার কাছে। চিনিই বা কী করে! চীনে যখন দেখেছিলাম—ওর চোখে ছিল শরতের চকিত চপলতা। কালে কালে কোথাও উধাও হয়েছে তা! সেখানে ঠাঁই নিয়েছে রহস্য-কাজল শাওন।'

'ওখানে মেজর ছিলে তুমি? মাইগড! অত ওপরে উঠলে কীভাবে?'

'ফ্রান্সিস টাউনসেন্ড ওয়ার্ডের আর্মিতে বর্ণভেদ ছিল না ক্যাপ্টেন। পৃথিবীর প্রায় সব জাতির মানুষ ছিল তার বাহিনীতে। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা সব। চামড়ার রং সেখানে যোগ্যতার শর্ত ছিল না। যুদ্ধই নির্ধারণ করে দিত কার স্থান কোথায় হবে।'

'সাইকের সামনেই মেয়েটার সাথে আলাপ হয়েছিল তোমার?'

'প্রথমে লক্ষ করেনি। পরে দেখতে পেয়ে তো মহাখাপ্পা। একজন সাধারণ সিপাহীর এতবড় স্পর্ধা! তার আমন্ত্রিত অতিথিকে সামান্য সম্মান দেখানো তো দূরের কথা—একেবারে বন্ধুর মত আলাপ! রেগেমেগে তেড়ে আসছিল আমার দিকে। বেলিন্দার অন্তরঙ্গ কণ্ঠস্বর নিভিয়ে দিল তাকে। শতমুখে আমার প্রশংসা করে চলেছে সে সাইকের কাছে।

'কিছুক্ষণ পরে সেখানে এলেন বেলিন্দার বাবা। চীনে তাঁদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য বারবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন তিনি। বেড়াতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন। ব্যাপার দেখে সরে পড়ল মেজর সাইক।

'তার দুইদিন পরে বদলীর আদেশ আসে আমার। পশ্চিমের এক দুর্গম সীমান্ত ঘাঁটিতে।'

'মেয়েটা?' আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করল রিচার্ড।

'জানি না।'

ছয়

উপরতালার মানুষ মেজর আব্রাহাম সাইক।

প্রবল আত্মবিশ্বাসী। সবসময়ই বুদ্ধিমানের মত ঠিক কাজটি করে। আর, অন্যরা সবাই যে ভুল করে তাতে তার কোনও সন্দেহ নেই। মায়ের দুধের সাথে এধরনের কিছু সংস্কার গিলে বড় হয়েছে সে।

নিজের সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা সাইকের। উচ্চবিত্ত পিতার একমাত্র পুত্র হয়ে জন্মেছে সে উঁচু বংশে। লেখাপড়া শিখেছে উপর তালার স্কুলে। রোববারের প্রার্থনায় গেছে শহরের সবচেয়ে উঁচু গির্জাটায়।

দেখতে শুনতেও উঁচু লম্বা। উন্নত কপাল, গ্রীবা। চিতানো বুক। নাক উঁচু এবং নজরটাও উপরের দিকে। তাই সমপর্যায় বা তার চেয়ে উঁচুতালার লোকজনই সে শুধু দেখতে পায়। তাদের সাথে মিলেমিশে ভাল হয়ে থাকে।

অধস্তনদের মানুষ হিসাবে গণ্য করতে কষ্ট হয় তার। হবারই কথা। অত উঁচু হতে–নীচের মানুষগুলোকে খুব ছোট দেখায়। এটা পৃথিবীর নিয়ম। আর এই নিয়ম নির্ভুল ভাবে মেনে চলে মেজর আব্রাহাম সাইক।

শুধু একটা দুঃখ মেজরের। সেনাবাহিনীতে খুব উঁচু র‍্যাংক পেল না! ভাল অফিসার সে। বরাবরই ভাল। স্কুলের নিয়মিত ছাত্র হিসাবে রেজাল্ট ভাল করত। তবু প্রথম পাঁচজনের মধ্যে থাকা হয়নি। কলেজে খুব খেটেও ফার্স্টক্লাশ জোটেনি সামান্যের জন্য। ভাল সন্দেহ নেই। তবে সেরা নয়।

সেনাবাহিনীতে ঢুকে খুব দ্রুত উঠে এসেছিল মেজর র‍্যাংক পর্যন্ত। তারপর আর ওঠা সম্ভব হয়নি।

বড় যুদ্ধের সময় একটা অশ্বারোহী দলের অধিনায়ক ছিল সে। লড়াইয়ে–আলোচিত হবার মত সাফল্যও দেখিয়েছিল। অবশ্য সহযোদ্ধারা ভিন্নমত পোষণ করে ব্যাপারটায়। আক্রমণে ইতস্তত করছিল নাকি সাইক। এমন সময় তার ঘোড়াটা ভয়ে দিশেহারা হয়ে ছুট লাগায় সামনে। সোজা ঢুকে পড়ে

শত্রু বেষ্টনীতে। বাধ্য হয়ে অন্যরাও তার সাথে এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করে। তুলনামূলক ভাবে দুর্বল ছিল শত্রুপক্ষ। তাই লড়াইটায় জিতই হয়।

সাইক অবশ্য অন্য কথা বলে। এবং তার কথাই ঠিক মনে করে। শত্রুর প্রতিরক্ষায় ত্রুটি ধরতে পেরেছিল সে। তাই ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে পেরেছিল তাদের।

খুব তাড়াহুড়োয় শেষ হয়ে গেল যুদ্ধটা। নইলে জেনারেল পর্যন্ত উঠতে পারত সাইক। কর্নেল তো বটেই। শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে তার সাধ!

বাধ্য হয়ে সে বদলি হয়েছিল ইন্ডিয়ান ফাইটিং আর্মিতে। এখানে যদি কোনও চমক লাগানো সাফল্য দেখানো যায়–ওঠা যায় আরও উঁচুতে! আশায় আশায় সেনাবাহিনীতে রয়েছে গেছে সাইক।

তারা বাবা কিন্তু বলেছিল ফিরে যেতে। তাদের শহরের সবচেয়ে বড় ব্যাংকটার মালিক তার বাবা। বলেছিল, ফিরে গিয়ে সংসারী হতে। কথাটা পছন্দ হয়নি তার। ঠিক মনে হয়নি হয়তো!

সংসারী হতে আপত্তি থাকত না। যদি সেরকম একটা মেয়ে পাওয়া যেত। আশেপাশে কাউকে পছন্দ হয় না তার। উপর দিকেও নেই তেমন কেউ। শুধু একজন ছাড়া। বেশ উঁচু বংশের মেয়ে। নাম বেলিন্দা ব্রাউন।

নামজাদা রাষ্ট্রদূতের একমাত্র মেয়ে। জাঁদরেল জেনারেলের আদরের ভাগ্নী। প্রথম দর্শনেই পছন্দ হয়েছিল মেয়েটিকে। অনেক তেলটেল দিয়ে, তার সেনানিবাসে দাওয়াত করে এনেছিল বাপবেটিকে। কিন্তু সব নষ্ট করে দিল সেই ইন্ডিয়ান হারামজাদাটা।

ইয়াসীনের সাথে বেলিন্দাকে কথা কইতে দেখে এমন রাগ হয়েছিল তার! কী কথা তার সাথে? তার মত একজন কালার্ড নেটিভের সাথে!

'লোকটা ভবঘুরে ধরনের, মিস ব্রাউসন বিধাতার অপসৃষ্টি একজন নগণ্য ইন্ডিয়ান!' পরে বোঝাতে চেয়েছিল সে বেলিন্দাকে।

তার কথায় আমলই দিল না বেলিন্দা। 'বাবা ছিলেন ভারতে। ছোটবেলায় আমিও গিয়েছিলাম। চমৎকার একটা দেশ। খুব প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী একটা সংস্কৃতি আছে ওদের। একটা গৌরবময় অতীত আছে। জাতি হিসাবে খুব বিনয়ী আর অতিথিপরায়ণ ওরা। তা ছাড়া চীনে–একজন মেজর ছিল ইয়াসীন!'

অগত্যা প্রসঙ্গ পাল্টাতে বাধ্য হয়েছিল সাইক। এমনিতেই কম বোঝে মেয়েরা। তার উপর মাথায় যার ভারতীয় ভূত চেপেছে–সে কী করে বুঝবে তার উচ্চমর্গের যুক্তি!

মোযেভের পথে যেতে যেতে, ঘুরে ফিরে ইয়াসীনকেই ভাবছে মেজর সাইক

সাথে চলেছে অশ্বারোহী সৈন্যের তিনটি প্লাটুন। পকেটে নানান জিনিসপত্রের সাথে ইয়াসীনের ছাড়পত্র। চাকুরির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে লোকটার। ক্যাম্পকেডিতে পৌঁছে ছাড়পত্রটা দিতে হবে তাকে। একদম নাগালের বাইরে চলে যাবে ইয়াসীন। অথচ তার জন্যেই ওর নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল বেলিন্দা!

এভাবে চুপচাপ ইয়াসীনকে ছেড়ে দিতে মন টানছে না সাইকের। উদ্ধত ভারতীয়টাকে আরও কিছু শাস্তি দেওয়া উচিত। কিছুতেই তার কাছে মাথা নোয়ায়নি সে। অতীতে, কঠিন সব ডিউটি অবলীলায় পালন করেছে। কোথাও সামান্য খুঁত ধরা যায়নি। দু'দুবার কর্পোরাল পদ থেকে সাধারণ সিপাহীর কাতারে নামিয়ে দিয়েছিল তাকে সাইক। সামান্য ছুতোয়। চীনে নাকি মেজর ছিল লোকটা। কথাটা বিশ্বাস করতে বাধে সাইকের। অবিশ্বাস করতেও!

তবে বেলিন্দা ব্রাউনকে পাবার পথে সে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইয়াসীনের দেখা পেয়েই–সাইকের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল মেয়েটা।

কিন্তু তাকে আরও কিছু শাস্তি দেবার উপায় খুঁজে পাচ্ছে না সাইক। একটা কাজ অবশ্য করা যায়। ছাড়পত্রটা আটকে রাখা যায় বেশ কিছুদিন। তবে নিছক অন্যায় হবে তা।

অস্বস্তিকর চিন্তাটা এড়িয়ে গেল মেজর সাইক। বর্তমানে আরও গুরুত্বপূর্ণ সব ভাবনা আছে তার। যেমন মোযেভ মরুভূমিতে এই বদলি। ব্যাপারটা ঠিক করেনি উপরওয়ালা। যুদ্ধ করতে পাঠানো হচ্ছে না তাকে। একদল সৈন্য অবশ্য দেওয়া হয়েছে সাথে। তবে সে শুধু পাহারা দিতে। মার্ল স্প্রিং, বিটার স্প্রিং, রক স্প্রিং এবং ফোর্ট পিউটে সেনাচৌকি বসাতে হবে। এলাকাটাকে রাখতে হবে কড়া পাহারায়। যাতে ওয়্যাগন চলাচলের সরকারী রুটগুলো শত্রুমুক্ত থাকে। তার বেশি কিছু করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে হেডকোয়ার্টার হতে। নিছক প্রয়োজন না হলে মোযেভদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া সম্পূর্ণ নিষেধ।

এর আগে কখনও মরুভূমি দেখেনি সাইক। মরুভূমির সেনানিবাস এবং যুদ্ধ সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই তার। ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত এসেছে সে জাহাজে চেপে। রওনা হবার আগে অন্য মরুভূমিতে অভিজ্ঞ একাধিক অফিসারের সাথে কথা বলেছে। তারও আগে নিউমেক্সিকো আর টেক্সাসে অ্যাপাচি ইন্ডিয়ানদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কাহিনি শুনেছে। সে তুলনায়–মোযেভ ইন্ডিয়ানদের সাদামাটা মনে করে সাইক। জমবে না ওদের সাথে–কথাটা ভাবতেই কেমন হতাশ বোধ করে সে।

ক্যাম্পকেডি মোযেভ নদীর তীরে অবস্থিত। কল্পনায় ক্যাম্পটাকে দেখতে চেষ্টা করে সাইক। অবিরল জলের কলতানে মুগ্ধ, কোনও শ্যামল সেনানিবাস।

গরম অসহ্য বোধ হলে হয়তো উপভোগ করা যাবে নৌবিহারের অবকাশ।

অথচ–মরুভূমির সাথে প্রথম সাক্ষাতেই গলা শুকিয়ে গেল সাইকের। একটা উঁচু গিরিপথ পেরিয়ে জীবনে এই তার প্রথম মরুভূমি দর্শন। অবিরল জল আর শ্যামল ছায়া উধাও হয়ে গেল মন থেকে।

দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড, ক্যাপ্টেন ম্যালেটের দুঃখ হলো শোকাহত মেজরকে দেখে। সান্ত্বনায় কেঁপে গেল তার কণ্ঠ। 'মরুভূমিটা সমুদ্রের মতই সীমাহীন। প্রায় চোদ্দ হাজার বর্গমাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে।'

'বলো কী! তবে তো গোটা ম্যাসাচুসেট রাজ্যই লুকিয়ে রাখা যাবে এর ভেতর!'

'ইয়েস, সার। সাথে কানেকটিকাট রাজ্যেরও কিছুটা রাখা যেতে পারে। এবং সর্বত্রই সীমাহীন জলকষ্ট!'

তার সারা জীবনে, কল্পনা আর বাস্তবে এতটা পার্থক্য এই প্রথম। মাত্র তিন প্লাটুন সৈন্য নিয়ে এই নরকে টহল দিয়ে বেড়াতে হবে। কাজটা প্রায় অসম্ভব মনে হলো সাইকের।

'এর আগে মরুভুমির অভিজ্ঞতা আছে তোমার, ম্যালেট?'

'সৈনিক হিসাবে নেই। তবে ওয়্যাগন কাফেলায় একাধিকবার পাড়ি দিয়েছি মরুভূমি। পানিটাই প্রধান সমস্যা। তৃষ্ণায় বেরিয়ে যেতে চায় জীবন।'

'ইন্ডিয়ানরা বাঁচে কীভাবে?'

'সহ্য করে। তৃষ্ণার সাথে যুদ্ধ করে। তা ছাড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করে তারা মরুভূমিতে। জলকেন্দ্রিক জীবন যাত্রা। পানির উৎস, ছোটবড় প্রতিটা ওয়াটার হোল এবং স্প্রিং তাদের নখদর্পণে।'

সন্ধ্যার আগেই বাহিনী নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছল সাইক। ক্যাম্পের করুণ দৃশ্যে আঁধার হয়ে গেল তার চেহারা। কোনও ব্যাকরণেই সেনানিবাস বলা যাবে না কেডিকে। কাঁচা ইটে গাঁথা কতগুলো হাড়পাঁজর বের করা ইমারত। তার কোলে দু'তিনটে শুকনো পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘর। বৃক্ষ উপস্থিত, তবে দুর্ভিক্ষের করুণ চেহারা তার। নদী নেই কোথাও। কিন্তু একটা নালা আছে অদূরে। জলের ক্ষীণ ধারাটি স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষায় আছে অন্তিম মুহূর্তের। ওটারই নাম মোযেভ নদী!

অপেক্ষায় ছিল রিচার্ড। 'স্বাগতম, সার।' আমন্ত্রণ জানাল সে। 'পথশ্রমে ক্লান্ত আপনি। গরম পানি আছে। স্নান সারতে পারেন, যদি ইচ্ছে হয়।'

'সৈন্যদের ফলইন করানো হয়নি কেন? জানে না তারা, নতুন কমান্ডিং অফিসার আসছে?'

'আটজন মাত্র সৈন্য। তিনজন পাহারায় আছে, সার। অন্য তিনজনের একটি

দল এইমাত্র টহল থেকে ফিরল।'

ব্যাপারটা সাইকের বিচারে অসন্তোষজনক। কিন্তু উদ্যম অবশিষ্ট নেই তার। রিচার্ডের কোয়ার্টারে একমাত্র খটখটে চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়ল সে।

সযত্নে রক্ষিত হুইস্কির বোতলটি বের করে আনল রিচার্ড। গেলাসে ঠোঁট কোয়াতেই আরাম অনুভব করে সাইক। মোযেভ ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে রিচার্ডের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় মনোযোগী হয়।

'দুজন মানুষকে ভীষণ প্রয়োজনীয় মনে হবে এখানে আপনার,' বলে যেতে থাকে রিচার্ড। 'দুজনই ইন্ডিয়ান। তবে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। মোকাটো রেড ইন্ডিয়ান। এই মরুভূমির সবচেয়ে অভিজ্ঞ সৈনিক। মরুভূমিতে ট্র্যাকিং-এর এক বিরল প্রতিভা। সামান্য সূত্র ধরে কারও পায়ের চিহ্ন নির্ভুলভাবে অনুসরণ করে পৌঁছতে পারে সে গন্তব্যে। অপরজন গ্রীন ইন্ডিয়ান, অর্থাৎ ভারতীয়। সার্জেন্ট ইয়াসীন বেগ।'

'সার্জেন্ট!'

'ইয়েস সার। লেফটেন্যান্ট জুলিয়ানের মৃত্যুর পর আমি পদোন্নতি দিই তাকে। অত্যন্ত যোগ্য লোক। যে-কোনও সাদা মানুষের চেয়ে অনেক ভাল চেনে এই মরুভূমি। টহলে বেরিয়ে জুলিয়ান নিহত হলে নেতৃত্বের ভার পড়েছিল তার ওপর। নিশ্চিত মৃত্যুর সাথে লড়ে ফেরত আনতে পেরেছে দলের অবশিষ্টদের। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অন্য কারও পক্ষে অসম্ভব ছিল কাজটা।'

'ইয়াসীনকে চিনি আমি।'

'তাকে হারাতে চলেছেন আপনি, মেজর। মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে ইয়াসীনের। ছাড়পত্র পৌঁছলেই বিদায় নেবে।'

'জুলিয়ানের ব্যাপারে,' প্রসঙ্গ এড়াল সাইক, 'কৌতূহলী হয়ে উঠছি আমি। তার মৃত্যুর রিপোর্ট পাঠিয়েছ তুমি হেডকোয়ার্টারে। অথচ সেখানে কেউ চেনে না তাকে!'

অপ্রিয় প্রসঙ্গ। বিরক্ত এবং শঙ্কায় ঘেমে গেল রিচার্ড। যথাসাধ্য বর্ণনা দিল সে জুলিয়ানের। তার জাল পরিচয়পত্র সম্পর্কে ইয়াসীনের সন্দেহটিও বাদ দিল না।

সবশেষে উঠল সোনার কথা।

'সোনা? এই মরুভূমিতে আবার সোনা!' রিচার্ডের কথায় অবাক হলো সাইক।

'পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে প্রাপ্তি সংবাদ আসে তার। আর আসে সোনার নদীর খবর। এই মরুভূমির নীচ দিয়ে বইছে।'

'নীচ দিয়ে?'

'জ্বী, স্যার। নদী টেকে না মরুভূমিতে। অত্যধিক তাপে শুকিয়ে হাওয়া হয়ে যায়, কিংবা তলিয়ে যায় নীচে। সোনার নদীটা নাকি তলিয়ে গেছে মরুভূমির নীচে। তারপর হারিয়ে গেছে বিশাল এক পাতাল গুহায়।'

'বাজেকথা।' সম্ভাবনাটা বাতিল ঘোষণা করল সাইক। তবু তার মন থেকে গেল না নদীটা। যদি থাকে! যদি পাওয়া যায়! তবে ঠিক কাজটিই করবে সে। মরুভূমি দেখাশোনা করার ভার দেওয়া হয়েছে তাকে। নদীটাও সে-ই দেখে শুনে রাখবে। একদম নিজের মত করে...। স্বপ্নের পাতাল গুহায় সহসা হারিয়ে ফেলল সাইক নদীটা। যত্তসব বাজে কথা!

স্নান সেরে আবার বোতল আর রিচার্ডের পাশে ফিরে এল সে। চুরুট ধরাল ধীরে সুস্থে। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে—প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ তুলল। 'প্রায়ই মোযেভদের দেখা পাও?'

'ওরা দেখা না দিলে দেখা পাওয়া যায় না। আর বিনা প্রয়োজনে দেখাও দেয় না ওরা। বড় অদ্ভুত এই মোযেভ গোত্রের ইন্ডিয়ানরা,' থামল রিচার্ড। 'সহজে বোঝা যায় না ওদের। সমতলের গোত্রগুলোর চেয়ে আলাদা। অ্যাপাচিদের মত ওরাও হউমা বংশের। কিন্তু অ্যাপাচিদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।'

গেলাসে চুমুক দিল রিচার্ড। হুইস্কিটা বড় চমৎকার। 'চমৎকার দেখতে ওরা। হ্যান্ডসাম এবং শক্তিশালী। অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব ওদের মেয়েদের। সবাই সাহসী। এবং হিসেবী যোদ্ধা।

'কিছু ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কার আছে ওদের। প্রাচীন নীল বা ইনকা সভ্যতার সাথে অনেক ব্যাপারে রয়েছে অদ্ভুত মিল। নদীপথে নৌকা বা ক্যানো ব্যবহার করে না ওরা। অতীতের মিশরীয়দের মত ভেলায় ভেসে চলে।

'ওদের জীবনযাত্রা কৌতূহলী করে তুলবে আপনাকে, মেজর।'

'কতগুলো বর্বর ইন্ডিয়ানের অনুন্নত জীবনযাত্রা আমাকে কৌতূহলী করার ক্ষমতা রাখে না, ক্যাপ্টেন।' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল সাইক। 'আমি কৌতূহলী হতে আসিনি এখানে, ডিউটি পালন করতে এসেছি। আর আমার ডিউটি মরুভূমিতে সরকারী কাফেলা চলাচল নির্বিঘ্ন রাখা। যদি তাতে বাধা সৃষ্টি করে মোযেভরা—বালিতে পুঁতে ফেলব আমি ওদের সব ঐতিহ্য আর সংস্কার।'

দৃষ্টিতে অবিশ্বাস নিয়ে তার দিকে তাকাল রিচার্ড 'আপনার সে সাফল্য দেখার জন্যে রয়ে যেতে পারলাম না এই যা দুঃখ আমার কত সৈন্য সাথে এনেছেন মেজর?'

'ছেষট্টি।'

'মন্দ নয়। দেখুন, মেজর–মোযেভদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার। তার মধ্যে হাজার দেড়েক বা দুয়েক–নিপুণ যোদ্ধা। সম্পূর্ণ নিজস্ব নিয়মের লড়ে তারা। গেরিলা যুদ্ধের কৌশলও জানে। ওদের কাছ হতে এ মুল্লুকটা ছিনিয়ে নেয়া বড্ড কঠিন কাজ।

'তবে অস্ত্রগুলো মধ্যযুগীয়। তীর ধনুক, থ্রোইং নাইফের মত লম্বা ছোরা, বর্শা ও ছোট হাতলওয়ালা কুড়াল। রাইফেল বা বুলেট নেই খুব বেশি। ওগুলো ব্যবহারের আগ্রহটাও কম। কারণ নিজেদের অস্ত্রেই অভ্যস্ত ওরা। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অব্যর্থ।

'ঘোড়ায় চড়ে সাধারণত যুদ্ধ করে না ওরা। কিন্তু কিছুদিন আগে ইয়াসীনদের টহল দলটাকে যারা আক্রমণ করেছিল, তারা সবাই ছিল ঘোড়সওয়ার। ওই বিশেষ ক্ষেত্রে ওরা ঘোড়া ব্যবহার করেছিল সম্ভবত দুটো উদ্দেশে। প্রথমত, পায়ে হাঁটা সৈনিকদের টিটকারি দিয়ে মনোবল ভেঙে দেওয়া, দ্বিতীয়ত, গেরিলা পদ্ধতিতে তড়িৎ আক্রমণ করে বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া।'

'তবু পারেনি তারা?'

'একমাত্র ইয়াসীনের কারণে। অন্তত মোকাটো ও হেনরি তাই বলে। ইয়াসীন প্রলোভন দেখিয়ে কাছে টেনে আনে ওদের, এবং পিস্তলের যাদু দেখিয়ে দেয় স্রেফ। অমনটি নাকি এর আগে কেউ দেখেনি কখনও। পিস্তলটার কথা জানত না মোযেভরা। প্রচুর লোকসান হয় ওদের, আর লোকসান দিতে একদম অপছন্দ করে ওরা।'

'ইন্টারেস্টিং!' কৌতূহলী হয়ে উঠল সাইক! 'কী মনে হয় রিচার্ড, আমার সাথে পারবে ওরা?'

'বলা কঠিন সার। এমনিতে খুব হিসেবি যোদ্ধা ওরা। পারার সম্ভাবনা না থাকলে সামনাসামনি লাগতেই আসবে না। কিন্তু যদি সম্ভাবনা দেখে তবে লড়বে। তার জন্যে পর্যাপ্ত যোদ্ধাও নামাবে রণাঙ্গনে। একবার মারিকোপাস ও পিমা ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, পাক্কা একহাজার সৈন্য নামিয়েছিল ওরা, অ্যাপাচিদের সাথে জোটবেঁধে।

গেলাসটা খালি করল রিচার্ড। 'ওদের তীর বা থ্রোইং নাইফগুলো লংরেঞ্জের যুদ্ধে রাইফেলের সামনে টিকতে পারবে না। তবে হাতাহাতি লড়াইয়ে সত্যিই [illegible] ওরা।'

'নদীর পাড় ধরে বসবাস ওদের?'

'অনেকটা তাই। নীডলস থেকে শুরু করে ষাট সত্তর মাইল উত্তর পর্যন্ত [illegible] ছড়িয়ে আছে। শিকারী নয় গোত্রটা। এই বন্ধ্যা মরুতে ভাল শিকার জোটে

না, তাই। চাষবাসই প্রধান সম্বল। প্রাচীন মিশরীয়দের মত। কলোরাডো নদীর বন্যার বয়ে আসা পলিতে–গম, কদু, তরমুজ, বাদাম ইত্যাদির আবাদ করে। মেসকাইট সিম ওদের অন্যতম খাদ্য।'

'চাষীদের মত পায়ে হেঁটে চলাফেরা করে?'

'সাধারণত।' সামান্য জড়ানো জিভে বলল রিচার্ড। 'তবে হাঁটে না। দৌড়ায়। দৌড়াতে পারেও। সারাদিন, দিনের পর দিন। সাইমুম ঝড়ের মত ধেয়ে আসে ওরা। সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে নিমেষে উধাও হয়।'

গেলাসে চুমুক দিল সাইক। রিচার্ডের কথাগুলো ঝাপসা হয়ে আসছে। সহসা মনের অতল হতে উঠে এল একটা নদী। সোনার নদী! এই মরুভূমিতে–আছে নাকি ওরকম একটা নদী? সোনা পাওয়া যাবে তাতে? অত সোনা!

এত সোনা দিয়ে কী করবে সাইক?

সাত

মরুভূমির সাথে দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ইয়াসীনের। গোপন রহস্য উন্মোচনের রোমাঞ্চকর সম্পর্ক। তার মাঝে হারিয়ে যাবার তৃষ্ণার্ত ভালবাসার সম্পর্ক। সেই কবে থেকে মরুভূমিকে ভালবাসে সে। অথচ বিনিময়ে মরুভূমি কিছুই দেয়নি। মরুভূমি কাউকেই কিছুই দেয় না!

শুধু শোনা যায় দেবার মত অনেক আছে তার। হয়তো অগাধ ঐশ্বর্যময় কোনও বিলুপ্ত সাম্রাজ্য, হয়তো অঢেল হিরা জহরত সমৃদ্ধ কোনও পাথুরে খনি, কিংবা হয়তো হারিয়ে যাওয়া একটা সোনার নদী! থাকতে পারে এসব মরুভূমিতে। ওই আদিগন্ত খাঁ খাঁ বালুর বিস্তারে যে কোনও ঐশ্বর্যই থাকা সম্ভব।

মরুভূমি প্রকৃতির এক আজব কোষাগার। অন্যত্র যা ধ্বংস হয়, মরুভূমিতে তা থাকে সংরক্ষিত। মৃতদেহ থেকে পানি বের করে নেয়। পচনশীল উপাদানগুলো নিংড়ে ফেলে। তারপর প্রাকৃতিক মমি বানিয়ে রেখে দেয় নিজস্ব ভাঁড়ারে। তাই, মরুভূমি খুঁড়লেই বেরিয়ে আসে ইতিহাস।

পৃথিবীর অনেকগুলো মরুভূমিতে থেকেছে ইয়াসীন। ভারতের থর মরুভূমি হতে পাড়ি জমিয়েছে আফ্রিকার সাহারায়। হাজার হাজার মাইল মরুপথ তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে শুকনো তপ্ত বালুর উজানে। কখনও উটের পিঠে কখনও ঘোড়ায় চড়ে আবার কখনও পায়ে হেঁটে।

প্রতিটি মরুভূমি সম্পর্কে অদ্ভুত সব গল্প শুনেছে সে। প্রতিটি মরুভূমিই কিছু দুর্বোধ্য প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছে সামনে। সব দেখেশুনে বিপন্ন বোধ করছে ইয়াসীন। কত অল্প জানে মানুষ, অথচ জানা বিষয় কী বিশাল!

এই মোযেভ মরুভূমিকেই বা কতটুকু জানা গেছে এ পর্যন্ত? লস্‌এঞ্জেলস-এর বাফাম সেলুনে এক লোক তাকে একটুকরো সোনা দেখিয়েছিল । স্যান গ্যাব্রিয়েল পাহাড় থেকে সংগৃহীত। ক্যাম্পকেডির মাইল খানেক দক্ষিণে, একটুকরো অ্যাজেট কুড়িয়ে পেয়েছিল ইয়াসীন। আরও দক্ষিণের একটা ক্যানিয়নে পেয়েছিল দুষ্প্রাপ্য জেসপার পাথরের কয়েকটি খণ্ড। কতগুলো রুবির টুকরোও পেয়েছিল একবার। পরে জানা গেল ওগুলো আসলে দামী গার্নেট পাথর, রুবি নয়।

একাধিকবার, টহলে বেরিয়ে এমন কিছু ইন্ডিয়ান ট্রেইল ইয়াসীন দেখেছে–যার গন্তব্য আজও অনাবিষ্কৃত। কয়েক জায়গায় দেখা গেছে দুর্বোধ্য সব ইন্ডিয়ান শিলালিপি। কত আগে কারা লিখেছিল ওগুলো–জানে না কেউ। কী লিখেছিল তাও অজানা।

একবার মরুভূমিতে ট্রেঞ্চ খুঁড়তে গিয়ে, কালো মাটির স্তর পেয়েছিল ও। নিকট অতীতে, এখানে শ্যামল অরণ্য ছিল, তার সাক্ষী। সাহারা মরুভূমিতেও পাওয়া গেছে এমনটি। হগারের একটা পাহাড়ের গায়ে বিচিত্র সব ছবি আঁকা দেখেছিল ইয়াসীন। রথটানা ঘোড়া, জিরাফ, জেব্রা এবং আরও অনেক নাম না জানা প্রাণী। ওই মরুভূমিতে এককালে ছিল তাদের কোলাহলমুখর পদচারণা। পরে কোথায় হারিয়েছে! অলৌকিক মরুপ্রেত দখল করে নিয়েছে তাদের বাসস্থান।

জীবনের এসব নির্বাক বিস্ময় বিচলিত করে ইয়াসীনকে। ইতিহাসের অপঠিত অধ্যায়গুলো খুলে দেখতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু বিদায় সমাগত। ছেড়ে যেতে হবে তাকে মরুভূমি। সবাইকে সব ছেড়ে যেতে হয়!

আবার কি ফিরে আসবে সে মরুভূমিতে? একবার ছেড়ে গেলে আবার কি ফিরে আসা হবে? কীসের জন্য ফিরে আসা?

জীবনে অনেক মরুপাগল মানুষ দেখেছে ইয়াসীন। বারবার ফিরে এসেছে তারা। রহস্যময়ী শরীরের লোভ দেখিয়ে, মরুভূমি একে একে কেড়ে নিয়েছে তাদের সব। সব কিছু।

বিত্ত বসন হতে শুরু করে হৃদয়ের অব্যক্ত প্রেম। হৃদয় সমৃদ্ধ বুকের কংকাল। মগজের অ্যালকহলিক স্বপ্ন। সম্পদ–স্থাবর অস্থাবর, সব!

নাগরীর নটিনীর ঘরে গেলেও ফিরে আসার মত অবশিষ্ট কিছু থাকে। কিন্তু

মরুভূমি শুধু ডেকে নেয়। একবার তার নেশায় মজে গেলে ফেরা যায় না কিছুতেই।

হেনরীর পায়ের আওয়াজ। পাশে এসে বসল। 'নতুন কমান্ডিং অফিসারকে দেখেছ?' প্রশ্ন তার।

'না।'

'দেখে নিও। কড়া ইস্ত্রি দেওয়া মাল। কপালে খারাবী আছে আমাদের।'

বিরক্ত হলো ইয়াসীন। তার ভাবনায় ছেদ পড়েছে। সহ্য করতে পারে না সে হেনরীকে। লোকটার কথাবার্তা, চালচলনে একটা খারাপ মতলবের গন্ধ।

'মরুভূমির কিছু গোপনীয়তা থাকে,' বলল হেনরী। 'আর তা দেখার জন্যে পাঁয়তারা করে চলে মানুষ। জুলিয়ানের কথাই ধরো। কিছু একটা খুঁজতে এসেছিল সে এদিকে। আমার মনে হয় খোঁজার মত কিছু সত্যিই আছে এখানে। তুমি আর আমি যদি লেগে পড়ি, তবে পেতেও পারি তা। শক্ত মানুষ আমরা। জুলিয়ানের মত ভুয়া তো নই।'

'ভুয়া!'

'আরে ইয়ার—আর্মিতে কোনও কিছু গোপন থাকে না সে তো জানো। দশমুখে কথা ছড়াতে ছড়াতে বেরিয়ে আসে আসল সত্য। জুলিয়ান অফিসার ছিল ঠিকই, তবে অন্য কোথাও। এখানে এসেছিল ভেজাল কাগজপত্র নিয়ে। আর্মি অফিসারের পরিচয়ে, টহলদলের সহায়তা নিয়ে খুঁজতে এসেছিল কিছু।'

'নাকি মরতে এসেছিল?'

'হ্যাহ্।' অসভ্যের মত হাসল হেনরী। 'কথাটা বিশ্বাস করো তুমি? জন্মস্থানের মত প্রতিটা মানুষের মৃত্যুর স্থানও কি ঠিক করা থাকে আগে থেকে?'

'না। ওটা কথার কথা। মরুভূমিতে মানুষ সাধারণত অসতর্কতার কারণে মারা যায়। তাই আমি কখনও অসতর্ক থাকি না, হেনরী।'

'তাই নাকি?' বিদ্রূপ করে বলল হেনরী। 'জুলিয়ানের মত অপঘাতে মরতে চাও না বুঝি? জুলিয়ান কি খুঁজতে এসে মারা পড়ল সেটাও বোধহয় জানাতে চাও না আর কাউকে। ঠিক আছে, সতর্কই থেকো, ইয়াসীন। তবে তোমার পিছু আমি ছাড়ছি না সহজে।' কথাগুলো বলে আর বসল না হেনরী।

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ইয়াসীনের। আসলে ঠিক কী খুঁজতে এসেছিল জুলিয়ান জানে না সে। জানার ইচ্ছেও নেই। জুলিয়ানের ম্যাপটা রেখে দিয়েছে স্রেফ কৌতূহল বশে। ভাল করেনি।

শুধু ছাড়পত্রের অপেক্ষায় বসে আছে ও। বসেই আছে। কারণ পুরোনোদের বদলে নতুন সৈন্যদের দিয়ে ডিউটির অভ্যাস করানো হচ্ছে। গত কদিন খুব বেশি

দর্শন মেলেনি মেজর সাইকের। অফিসে কাগজপত্রে ডুবে আছে সে।

খুব একটা উৎসাহ পাচ্ছে না মেজর সাইক। সব সাদামাটা দৈনন্দিন রুটিন রিপোর্টে ঠাসা কাগজপত্র। কোথাও যুদ্ধের সংবাদ নেই। কেবল মাঝেমধ্যে সুযোগমত গুলি করে পালিয়ে গেছে ইন্ডিয়ানরা। কিংবা হয়তো ঘোড়া চুরি করে নিয়ে গেছে বা অন্য কোন ভাবে অপদস্থ করে গেছে। বড়সড় লড়াইয়ের কথা লেখা নেই কোথাও।

এখানে রোমাঞ্চকর কোনও কিছু আশা করা বৃথা। শুধু আড়ালে ওত পেতে থাকা শত্রুর জন্যে অপেক্ষা করে যেতে হবে। তারপর সামান্য অসতর্ক হলেই বিরস বদনে গুণতে হবে দু'একটা লোকসান। হয়তো এতটা সহ্য করতে না পেরে দুএকজন সৈনিক পালিয়ে যাবে মাঝেমাঝে। মরুভূমিতে আর্মি ডিউটির চিরাচরিত একঘেয়ে নিয়ম।

অবসর বিনোদনের কোনও ব্যবস্থা নেই। নিকটতম শহর স্যানবার্নারডিনো বা লস্‌এঞ্জেলেস-এ পৌঁছানো প্রচুর কষ্ট ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সময় কাটানোর সার্বক্ষণিক সঙ্গী গ্রীষ্মের চাঁদি ফাটানো রোদ, আর শীতের হাড় কাঁপানো হাওয়া।

ক্যাপ্টেন রিচার্ডের রিপোর্ট লেখার স্টাইলটা ভাল লাগল সাইকের। কোথাও শব্দের বাহুল্য নেই। এখানে ওখানে সংক্ষিপ্ত পাদটীকা। ইন্ডিয়ানদের রণকৌশল, কুসংস্কার, খাদ্যাভ্যাস, বিবাহ, মৃতসৎকার–ইত্যাদি নানান বিষয়ের অবতারণা সেখানে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মোযেভদের সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠছে সাইক!

একটা অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রিচার্ডের। শত্রুর প্রতিটা খুঁটিনাটিতে আগ্রহ ছিল। জেনারেল সিকার্টও পছন্দ করত শত্রু সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে। এ ব্যাপারটায় সাইক অবশ্য বেশি আগ্রহ বোধ করে না। তার মতে–শত্রুর ব্যক্তিগত জীবন জেনে যুদ্ধে খুব লাভ করা যায় না।

ইয়াসীনের রিপোর্টটা আগ্রহের সাথে পড়ল সাইক। লোকটা যে অফিসার ছিল তা এই এক রিপোর্টেই বোঝা যায়। বেছে বেছে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সর্বত্র এবং সেগুলো বোনা হয়েছে দক্ষতার সাথে। ফলে–পুরো ঘটনাই যেন ছবির মত পরিষ্কার ফুটে ওঠে চোখের সামনে। সেই সাথে রয়েছে বিশেষ ব্যাপারগুলোর প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ। যুদ্ধে মোযেভরা কী পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল, আশেপাশের ওয়াটারহোলগুলোর অবস্থান ও অবস্থা কেমন ছিল, ঠিক কোন জায়গায় কীভাবে গুলি খেয়েছিল জুলিয়ান এবং অঞ্চলটার কী কী বৈশিষ্ট্য ছিল, এসব ব্যাপারে যুদ্ধে প্রয়োজনীয় কোনও কিছুই চোখ এড়ায়নি তার।

জুলিয়ানের ব্যাপারটা দুর্বোধ্য। অচিরেই হেডকোয়ার্টার থেকে ব্যাপারটা সম্পর্কে আরও জানতে চাওয়া হবে নির্ঘাত। জুলিয়ানের পুরো ঠিকানা, তার

বদলীর কাগজপত্র, সৈন্যদের টহলে নেতৃত্ব দেবার বৈধতা ও তার মৃত্যু সব ব্যাপারে নানান প্রশ্ন আসবে। কোনও তদন্ত টিম আসাও বিচিত্র নয়।

জুলিয়ানের ফাইলটা নিল সাইক। হেডকোয়ার্টার থেকে পাঠানো নিয়োগপত্র সহ সবকিছুই আছে তাতে। ক্যাপ্টেন রিচার্ডের সন্দেহ জাগানোর মত কিছু নেই।

জুলিয়ানের সংক্ষিপ্ত মিলিটারি রেকর্ড আছে ফাইলে। ভার্জিনিয়া মিলিটারি একাডেমি হতে কমিশন পেয়েছিল সে। তথ্যটা যাচাই করার কথা ভাবল সাইক।

এর আগে পুবের একটা সেনানিবাসে দায়িত্ব পালন করেছিল জুলিয়ান। সেখানেও খোঁজ খবর করা যায়।

ক্যাপ্টেন রিচার্ড এবং ইয়াসীন–দুজনার রিপোর্টেই বলা হয়েছে, অফিসার হিসাবে যোগ্যতার কমতি ছিল না জুলিয়ানের। অফিসার সে ছিল ঠিকই–তবে হয়তো তার এখানে বদলীর কাগজগুলো ঠিক ছিল না।

কোথাও ক্যু করে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল কোনও সুযোগের অপেক্ষায়?

কীসের সুযোগ নিতে সে এই কষ্টকর টহলডিউটি বেছে নিয়েছিল বলা কঠিন। তবে খুব অল্পসময়ে কাজ উদ্ধারের আশা নিয়ে এসেছিল সে। কারণ আর্মিতে এ ধরনের একটা জাল পরিচয় বেশিদিন গোপন রাখা যেত না। এবং সবাই জানত, অল্পদিন পরই মেজর আব্রাহাম সাইক আসবে চার্জ নিতে।

হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল সাইক। জুলিয়ানও কি জানত তার আগমন সংবাদ? সেজন্যেই সময়টা বেছে নেয়নি তো সে? পকেটে ম্যাচ হাতড়াতে শুরু করল সে।

তারপর পরিচিত কে হতে পারে? একটা জাল পরিচয় মেনে নেবে সাইক, এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর্মিতে কজন আছে তার? নাকি তেমন কোনও কারণ ছিল যা দিয়ে সাইককে মানিয়ে নিতে পারত জুলিয়ান? ব্যাপারটা খুব সতর্কতার সাথে ভাবতে বসল সাইক।

সেনাবাহিনীতে বেশি বন্ধু নেই তার। বাইরেও নেই। বন্ধুত্ব মানে সহঅবস্থান, আর একজনকে নিজের কাছাকাছি ভাবা। চিরকালই উপরতালার মানুষ সাইক। কাছাকাছি হবার মত খুব কম মানুষ পাওয়া যায় অত উপরে। আর্মিতে অবশ্য কিছু নিচুতালার মানুষ বন্ধু ছিল তার। তবে সেটা স্বার্থসিদ্ধির বন্ধুত্ব। পদোন্নতির সাথে সাথে বন্ধুত্বে বন্ধ্যাত্ব এসেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

'ইয়াসীন?' বাইরে মেজরের গলা।

'ইয়েস, সার।' কোয়ার্টার হতে বেরিয়ে এসে স্যালুট করল ইয়াসীন।

'তোমাকে এখানে পাব আশা করিনি, সার্জেন্ট।'

'ইয়েস, সার।'

'ইয়াসীন, শীঘ্রিই আমি জুলিয়ানের ব্যাপারে একটা তদন্ত করতে যাচ্ছি

তোমার রিপোর্টটা দেখা হয়েছে আমার। ওর সাথে আর কিছু যোগ করতে চাও?'

'নো, সার।'

'জুলিয়ান কোনও অতি কৌতূহলী প্রশ্ন করেছিল তোমাকে? কোনও নির্দিষ্ট জায়গা বা পাহাড়ের অবস্থান জানতে চেয়েছিল কখনও? বা অন্য এমন কিছু যাতে এখানে তার আসার উদ্দেশ্য আঁচ করা যায়?'

'নো, সার।'

নিজের কলমটা দিয়ে কয়েকবার চিবুকে টোকা দিল সাইক। 'তুমি শিওর যে জুলিয়ানের নিয়োগপত্র জাল এবং এখানে অন্য কোনও কারণে এসেছিল সে। কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ কিন্তু নেই তোমার ধারণার স্বপক্ষে।'

'আরও একটা ব্যাপার আমার ধারণাকে জোরাল করে, সার। সেটা আমি আমার রিপোর্ট পেশ করার পরে জানতে পারি। লস এঞ্জেলস হতে এখানে আসার সময় তার বদলির কাগজ-পত্রের সরকারী ইনভেলপটা অন্য একজন পকেট থেকে বের করে তার হাতে দিয়েছিল। কোনও আর্মি অফিসার তার অফিশিয়াল কাগজপত্র একজন সিভিলিয়ানের কাছে রাখতে দেয় না। এবং সেই নির্দিষ্ট ইনভেলপটাই পরে জুলিয়ান জমা দিয়েছিল ক্যাপ্টেন রিচার্ডের কাছে। এটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।'

ভাবনা আর একটু বাড়ল সাইকের। ইয়াসীনই বাড়িয়ে দিল। লোকটাকে মনে মনে ঘৃণা করে সাইক। তবে সে যে সুযোগ্য ও বুদ্ধিমান তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আবার অফিসে ফিরে ম্যাপ নিয়ে বসল সাইক। দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক উত্তরে টহল নিয়ে গিয়েছিল জুলিয়ান। তবু আশা পূরণ হয়নি তার!

আশা পূর্ণ হবে না ইয়াসীনেরও। পকেট থেকে তার ছাড় পত্রখানা বের করে ফাইলে রাখল সাইক। আপাতত ওটা ওখানেই থাকবে। এত সহজে তার নাগালের বাইরে যেতে পারবে না ওই বুদ্ধিমান অপসৃষ্টিটা।

নতুন সৈন্যদের পাহারা দেখল ইয়াসীন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ঘোড়ার খোঁয়াড় দেখতে গেল। এগুলো এখন দায়িত্ব নয় তার। তবু পুরোনো অভ্যাস। তা ছাড়া মেজর সাইকের আনা বিরাট একটা কালো ঘোড়া বশ করছে সে।

ক্যাপ্টেন ম্যালেটের সাথে দেখা সেখানে। 'খারাপ নয় আগের ঘোড়াগুলো।' মন্তব্য করল ক্যাপ্টেন। 'তবে কিছুটা রোগা। শুনলাম ভাল কয়েকটা ঘোড়া চুরি করে নিয়ে গেছে ইন্ডিয়ানরা?'

'ঘোড়ার মাংস প্রিয় ওদের। তা ছাড়া বুলেটের বিনিময়ে বিক্রিও করে। [illegible] ভাল ঘোড়া পোষার প্রয়োজন পড়ে ওদের।'

'বুলেট পায় কীভাবে?'

'পেগলেগ স্মিথ ও জিম বেকওয়ার্থের মত কিছু কুখ্যাত ঘোড়াচোরের সাথে লেনদেন আছে ইন্ডিয়ানদের। বুলেটের বিনিময়ে ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে ঘোড়াগুলো বাগায় ওরা। তারপর নেভাডা, অ্যারিজোনা কিংবা আরও দূরের কোনও হাটে বেচে দেয় চড়া দামে।'

অনেক ব্যাপারে তার কাছে প্রশ্ন রাখল ক্যাপ্টেন ম্যালেট। খোলামেলা কৌতূহল প্রসূত প্রশ্ন সব। ক্যাপ্টেনকে ভাল লাগল ইয়াসীনের। ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা দীর্ঘকায় ভালমানুষ অফিসার। সেই কারণেই হয়তো পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও ক্যাপ্টেনের সিঁড়িটা টপকাতে পারেনি!

'তোমাকে প্রয়োজন আমাদের, সার্জেন্ট ইয়াসীন। কিন্তু বিদায় নেবার সময় এসেছে তোমার। মরুভূমিতে অভিজ্ঞতা আছে এমন মানুষ হারানো বিরাট লোকসান। বিশেষ করে তোমার মত একজনকে।'

কথাগুলো এড়িয়ে গেল ইয়াসীন। বিদায়ের মুহূর্তে এসমস্ত সংলাপ বড় বেদনাদায়ক। দিগন্তে তাকাল সে। দূরে একটা সচল বিন্দু। ক্রমেই বৃহত্তর হতে লাগল সেটা। একটা স্টেজ আসছে ধুলো উড়িয়ে। স্টেজ থামার জন্য নির্ধারিত স্থানের দিকে এগোল ইয়াসীন।

স্টেজ কোচটা থামার ঠিক আগের মুহূর্তে লাফিয়ে নেমে গেল দুজন। ঘাড় খাটো, চিতানো বুকের লোকটা নেমেই দ্রুত এগিয়ে গেল নিকটতম ছাপরাটার ছায়ায়। অন্য লোকটার ভিতরে কোনও তাড়াহুড়ো নেই। তীক্ষ্ণ অথচ অলস চোখে একবারেই সে দেখে নিল সব। ও ধরনের দৃষ্টিতে কিছুই এড়িয়ে যায় না, অভিজ্ঞতা হতে জানে ইয়াসীন। কালো চোখ এবং কালো চুলের ধূসর একজন লোক। মনে রাখতে হবে কথাটা।

'সী–ন!' মরীচিকার মত সেই কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ চমকে দিল ত্রিভুবন!

স্টেজ কোচ হতে বেলিন্দাকে নেমে আসতে দেখল ইয়াসীন!

আট

'হায়, পোড়া কপাল!'

আনন্দ আর উত্তেজনায় এলোমেলো হয়ে গেল বেলিন্দা। 'সীন তুমি?' পিছনে ফিরল সে। 'আন্টি–দেখে যাও কী আবিষ্কার করেছি আমি।'

বেলিন্দার খালা, মিসেস মার্থা ম্যাকডোনাল্ড এসে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। মায়ের কথা মনে করার চেষ্টা করছে ইয়াসীন। মনে নেই!

'আচ্ছা ছন্নছাড়া ছেলে তুই, ইয়াসীন। এখানে আছিস, একটা চিঠিও তো লিখতে পারিস? নাকি ভুলে গেছিস এই বুড়ীকে।'

'ভুলিনি, খালা। শুধু সময় পাই না।'

'চুপ, আসলে ফাঁকিবাজ কোথাকার। কিন্তু তুই এখানে কেন, ইয়াসীন! যতদূর জানি–মেজর আব্রাহাম সাইক এখানকার কমান্ডিং অফিসার। তার সাথে তো তোর থাকার কথা নয়?'

'তার সাথে নেই আমি। সে সবেমাত্র এসেছে আর আমি এই যাচ্ছি বলে। মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে আমার।'

'ওহ্ ফাইন!' উৎসাহের সাথে বলল বেলিন্দা। 'এই নরকের চাকুরিতে আবার নিশ্চয়ই ফিরে আসছ না?'

বেলিন্দার চোখে চোখ রাখল ইয়াসীন। 'তা ছাড়া উপায় কী বল? ঘরে বেঁধে রাখার মত কেউ তো নেই আমার।'

'বেঁধে রাখার মত কেউ না থাকলেই তো মানুষ বেছে নেয় বুনো পশ্চিম।' চোখ নামাল বেলিন্দা। 'নতুন বাঁধনের সন্ধান খুঁজে ফেরে।'

'আমাদের সাথে থাকতে আসবি, বাবা?' এবারে কথা বলেন মার্থাখালা। 'তোর খালু একটা ভেড়ার খামার খুলেছে নেভাডায়। বুড়ো মানুষ। পেরে ওঠে না একা। তোর মত শক্ত সমর্থ জোয়ান ছেলে যদি থাকত আমাদের!'

মেজর সাইক এসে দাঁড়াল পাশে। 'এখানে দাঁড়িয়ে গল্প করা নিশ্চয়ই তোমার ডিউটি নয়, সার্জেন্ট।' ইয়াসীনের উদ্দেশে উষ্মা প্রকাশ করল সে।

'অবশ্যই নয়, সার।'

ঘুরে কোয়ার্টারের দিকে রওনা হলো ইয়াসীন। মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠছে। মেজর সাইকের অহেতুক ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য নয়। বেলিন্দার জন্য। ভুলে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তটায় আবার দেখা হয়ে গেল ওর সাথে। নেভাডায় যাচ্ছে ওরা। যে কোনও জায়গায় যেতে পারে। সে সব শুনে ইয়াসীনের কী লাভ?

ম্যাকডোনাল্ড পরিবারকে বহুদিন ধরে চেনে ইয়াসীন। অন্য ঘটনার মধ্য দিয়ে। একবার অ্যাপাচি ইন্ডিয়ানদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছিলেন জন ম্যাকডোনাল্ড। সেই থেকে ওদের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে গেছে সে। মায়ার বাঁধনে।

জন [illegible] তা হলে এখন নেভাডায়! সব ছেড়েছুড়ে ভেড়ার খামার খুলেছেন? জীবনে অ[illegible]ক কিছু করলেন জন ম্যাকডোনাল্ড। তবু স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারলেন

না কোথাও।

কিছু মানুষ আছে যারা স্থির হতে পারে না কোনওদিন। বারবার অচেনা দিগন্তে ছুটে যায় তারা। আর একটু এগিয়ে গেলেই বিশ্রামের নিশ্চিন্ত মরূদ্যান মিলবে এই আশায়। অথচ পূরণ হবার মত আশা সেটা নয়। আশাই নয়। নেশা! অবিরাম অনিকেত গতির উল্লাস। জন খালুকে ভাল লাগে আমার–ভাবল ইয়াসীন।

তবে তার সাথে দুস্তর ব্যবধান জন ম্যাকডোনাল্ডের। চালচুলোহীন ভবঘুরে কোনও সৈনিক নন তিনি। ব্যাংকে বিস্তর অর্থ আছে। আগে একটা বিশাল র‍্যাঞ্চ ছিল, বর্তমানে সেটা ভেড়ার খামারে রূপান্তরিত। আর আছে মিসেস মার্থা ম্যাকডোনাল্ড। ভাগ্য বটে।

অথচ তেমন আহামরি কিছু নয় মিসেস ম্যাকডোনাল্ড। ছিলেনও না কোনও কালে। এই বুনো পশ্চিমে রূপ মানুষের কোন্ কাজটায় লাগে! প্রয়োজন তো গুণ। প্রয়োজন টিকে থাকার সাহস। কোলের বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে স্বামীর রাইফেল রিলোড করতে জানাই এখানে আসল প্রয়োজন।

মিসেস মার্থা অবশ্য এতসব প্রয়োজন মিটাতে পারেননি। কোলে দুধের বাচ্চা ছিল না। তবে সে-ভাবেই গড়ে তুলেছেন বেলিন্দাকে। স্বামীর রাইফেল রিলোড করাও হয়নি। কারণ সে-রকম সময়ে নিজে আর একটা রাইফেল তুলে নিয়েছেন হাতে। সর্বোপরি–এই বুনোপশ্চিমে অপ্রয়োজনীয় কমনীয়তা ছিল তার।

আর ছিল স্বামী জন ম্যাকডোনাল্ডের মতই অবিরাম গতির উল্লাস। এখনও আছে। জনের পাশে, যে কোনও দিগন্তে হারিয়ে যেতে সদা প্রস্তুত তিনি। শুধু সহধর্মিণী নন, সহযোদ্ধা। এই বিপদসংকুল জীবনযাত্রায়–সহযাত্রী।

সৌভাগ্যবান জন ম্যাকডোনাল্ড। ওরকম একটা বউ আছে বলেই বুড়ো বয়সে নতুন ভেড়ার খামার করতে পেরেছেন তিনি।

ওরকম একটা বউ থাকলে আমিও পারতাম! আত্মমগ্ন অস্পষ্ট হাসিতে প্রকাশ পেল ইয়াসীনের ভাবনা। বেলিন্দার কথা মনে হলো।

নামজাদা রাষ্ট্রদূতের একমাত্র মেয়ে। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছে। বাবা গুরুত্বপূর্ণ মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশদেশান্তর। অবশেষে তাকে মানুষ করার ভার পড়ল খালার উপর।

মিসেস মার্থা ম্যাকডোলাল্ডের কুমারী সংস্করণ হিসাবে বড় হয়ে উঠল বেলিন্দা। বিত্ত ও প্রতিপত্তির শীর্ষে পৌঁছোনো কোনও কুমার জন ম্যাকডোনাল্ডের জন্য!

নাহ্। মানায় না। চালচুলোহীন এক ভেতো ভারতীয়র হাতে নিছক বেমানান এই দুষ্প্রাপ্য ক্যাকটাস ফুল। মেজর সাইককে বরং মানায়। অস্তাচলে তাকাল

ইয়াসীন। দিগন্তের ওপাশে এখনও রোদ। কিন্তু সেই রোদে কোনওদিনই গড়ে উঠবে না ইয়াসীনের স্বপ্নের খামার!

দ্রুত শেষ হলো সংক্ষিপ্ত সাঁঝ। এরপর একটানা রাত। এবং আগামী প্রত্যুষে বেলিন্দার প্রস্থান। এই মরুভূমি পাড়ি দিতে নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে ওদের। হবারই কথা। পশ্চিমের অশান্ত আগুনে তাতানো অনেক ইস্পাতকঠিন মানুষও মোযেভে এসে এলিয়ে যায়।

তার উপরে আছে ইন্ডিয়ান আক্রমণের ভয়। এখান থেকে লাসভেগাস অবধি পথের যে কোনও জায়গায় আক্রমণ করতে পারে তারা। এমনকী খোদ লাসভেগাসও আশঙ্কামুক্ত নয়।

খুব বেশি বয়স নয় শহরটার। আঠারোশো সাতান্ন সালে মরমন ইন্ডিয়ানরা ভেগাস স্প্রিং ছেড়ে চলে যায়। গ্যাস নামের এক বিত্তবান র‍্যাঞ্চার কিনে নেয় ওখানকার জলসত্তা।

প্রথমে গড়ে ওঠে ফোর্টবেকার সেনানিবাস। তারপর তাকে ঘিরে গোড়াপত্তন হয় লাসভেগাস শহরের। ফোর্টে সৈন্যসংখা কম হওয়াতে ইন্ডিয়ানদের দৌরাত্ম্য কখনও কমেনি ওখানে।

বেলিন্দাদের নিরাপদে লাসভেগাসে পৌঁছে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে ইয়াসীনের। কিন্তু উপায় নেই। সরকার বেতনভুক সৈনিক সে। মেয়াদ যদিও শেষ হয়েছে, তবু ছাড়পত্র এখনও মেলেনি। আর বিনা ছাড়পত্রে সে যদি যায়–পরিণতি কী হবে সহজেই অনুমেয়। বিশেষ করে কমান্ডিং অফিসার যখন মেজর সাইক।

রাইফেল পরিষ্কার করতে বসে পায়ের শব্দ পেল ইয়াসীন। সামনের বালিতে একজোড়া বুট। অন্ধকারেও চকচকে। পা বেয়ে উঠতে শুরু করল তার দৃষ্টি। চওড়া কাঁধ। রুক্ষ চিবুক। অন্ধকারেও চকচকে একজোড়া চোখ।

'ইয়াসীন তোমার নাম, তাই না?'

'তাই।'

'লেফটেন্যান্ট জুলিয়ানের সাথে ছিলে তুমি তাই না?'

'তাই।'

'মৃত্যুর আগে কিছু বলেছিল সে? বিশেষ কিছু?' পকেট থেকে একটা স্বর্ণঈগল বের করল লোকটা।

রাইফেলে মনোযোগ দিল ইয়াসীন। 'তার মৃত্যুর ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিয়েছি আমি অফিসারকে। সে-ই ভাল বলতে পারবে এ সম্পর্কে।'

ঠক করে রাইফেলের উপর পড়ল মুদ্রাটা। 'জুলিয়ানের জিনিসপত্র কোথায়?'

লোকটার স্পর্ধায় বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল ইয়াসীন। 'পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে

তার আত্মীয়স্বজনের কাছে।' কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে বলল। পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। খপ্ করে তার হাত চেপে ধরল লোকটা।

'হাত সরাও!' কঠিন স্বরে বলল ইয়াসীন। 'নইলে ভেঙে দেব।'

হাত ছেড়ে পিস্তল বের করল লোকটা। 'মুখ সামলে কথা বল। নইলে খুন করে ফেলব।'

হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে, শরীর ঢিলে করে দাঁড়াল ইয়াসীন। সামান্য তুলল চিবুক। চোখের কোণে করুণা। 'এখনও সময় আছে, খোকা। ভাল হয়ে যাও। নইলে প্যান্ট নষ্ট হয়ে যাবে পরে।'

'সাবধান!' পিস্তল দোলাল লোকটা। 'লী ফাউলার দাঁড়িয়ে আছে তোমার সামনে।' সাপের ছোবলের মত উচ্চারিত হলো নামটা।

এক পায়ে ভর দিয়ে আরও একটু আয়েশী ভঙ্গিতে দাঁড়াল ইয়াসীন। 'লী ফাউলার? মানে যে জুয়েলের নামে কতগুলো বেহদ্দ মাতালকে গুলি করেছিল অন্যায় ভাবে?' চিবুক সামান্য কাত করল সে। ভ্রূতে বিদ্রূপের কুঞ্চন। 'তুমি তা হলে সেই জোচ্চোর কাপুরুষ!'

এতটা আশা করেনি ফাউলার। মুখের উপর আজ পর্যন্ত কেউ তাকে জোচ্চার কাপুরুষ বলার সাহস পায়নি। বিস্ময়ে থমকে গেল সে। সামলে নিয়ে ট্রিগার টেপার আগেই ইয়াসীনের ঘুসিটা লাগল তার চোয়ালে।

মাটি ছেড়ে আঙুল চারেক উঠে গেল চকচকে বুট জোড়া। চওড়া কাঁধে বালি ছুঁয়ে চিৎ হয়ে পড়ল ফাউলার। হাতের পিস্তল ছিটকে পড়েছে দশ হাত দূরে।

'ইয়াসীন!' ঘটনাটা দেখতে পেয়ে ছুটে এল সাইক। 'এসব হচ্ছে কী এখানে?'

'লোকটা তালকানা, সার।' অ্যাটেনশন হয়ে বলল সে। 'চলতে জানে না মরুভূমিতে, তাই হোঁচট খেয়ে পড়েছে।'

এগিয়ে গিয়ে পিস্তলটা তুলল সাইক। 'আই সী! তোমার বন্ধুগুলোও তা হলে বিধাতার অপসৃষ্টি এক একটা।'

'আমার না, সার, জুলিয়ানের বন্ধু। অন্তত ও তাই বলছিল।'

উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে ফাউলার। প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হলো তার। আবার পড়ে গিয়ে মাথা ঝাঁকি দিল সে কয়েকবার। তারপর টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল।

'কাল সকালের স্টেজ কোচটায় এখান থেকে দূর হয়ে যাবে তুমি,' ফাউলারের উদ্দেশে বলল সাইক। 'তার আগ পর্যন্ত বেরোতে পারবে না কোয়ার্টার হতে।'

'বললেই হলো?' খেঁকিয়ে উঠল ফাউলার। 'ফৌজের সিপাই পেয়েছ নাকি

আমাকে?'

'উইলী!' অন্ধকারে ঢেউ তুলল সাইকের স্বরযন্ত্র। 'চত্বরে পাহারা দেবে তুমি। ইন্ডিয়ানরা আসতে পারে রাতে। কারও চলাফেরার সামান্য আভাস পেলেই ফায়ার ওপেন করবে। বুঝেছ?'

'বুঝেছি, সার।' গ্যালারির উৎফুল্ল দর্শকের মত বলল উইলী। 'লোকটাকে কোয়ার্টারে পৌঁছে দেব, সার?'

'ইয়েস।'

ফাউলার চলে যেতেই কাছে এগিয়ে এল মেজর। 'ওই লোকটাকে কতটুকু চেনো, সার্জেন্ট?'

'খুব বেশি না, সার। শুনেছি পাক্কা জুয়াড়ী ওই ফাউলার। বাজে লোকজনের সাথে মেলামেশা করে। এ পর্যন্ত গোটাতিনেক খুন করেছে গানডুয়েলের ছুতোয়। কোনওটাই সমানে সমান লড়াই ছিল না।'

'আই সী। তুমি বললে–হোঁচট খেয়ে পড়েছে ফাউলার?'

'রাত হয়ে এসেছে, সার। অহেতুক নাড়াচাড়া করছিল পিস্তলটা। এমন সময় হোঁচট খেল যেন কীসের সাথে। তারপরেই দেখি পড়ে আছে বালিতে।'

'ঠিক আছে যাও তুমি।'

'একটা কথা বলতে পারি, সার?' গেল না ইয়াসীন।

'ইয়েস।'

'চেহারার যে বর্ণনা আমি পেয়েছিলাম, তাতে মনে হয় ফাউলারই সেই লোক। লস অ্যাঞ্জেলস-এ যে বদলীর কাগজপত্র পকেট থেকে বের করে দিয়েছিল জুলিয়ানের হাতে।' কথাগুলো বলে আর দাঁড়াল না ইয়াসীন।

নয়

কারও হাতের স্পর্শ!

মুহূর্তে সম্পূর্ণ জেগে উঠল ইয়াসীন।

'সার্জেন্ট! আমি কিড। টহলে বেরোচ্ছে লেফটেন্যান্ট সাইমন। তোমাকে সাথে যেতে বলেছে।'

বিছানা ছেড়ে দ্রুত ড্রেস পরল ইয়াসীন। অন্ধকার হাতড়ে গুছিয়ে নিল সরঞ্জাম। খোঁয়াড়ে আগেই রেডি করা হয়েছে কালো ঘোড়াটা। অন্যদের সাথে

নীরবে ঘোড়ায় চড়ল সে। মোরগ বোলের মত লাল হয়ে উঠছে পুব আকাশ।

পাশে এগিয়ে এল কেউ। মোকাটো! সে-ও আছে তা হলে দলে।

'শুভযাত্রা,' ইয়াসীনের উদ্দেশে বলল মোকাটো। 'ওদের পথ চিনিয়ে দিতে হবে। তোমাকে আর আমাকে।'

বারোজন সিপাহী আছে টহলদলে। আর রয়েছে লেফটেন্যান্ট সাইমন, কর্পোরাল উইলিয়াম, মোকাটো আর সে নিজে। 'ভেগাস স্প্রিং-এর রুট ধরে মাইল দশেক এগোব আমরা।' তাকে লক্ষ করে বলল লেফটেন্যান্ট। 'তারপর পুবে মোড় নিয়ে সোজা গিয়ে উঠব ফোর্ট মোযেভে যাবার পথে।'

সকালটা উত্তপ্ত হতে সময় নিল না। পাহাড়ের শীতল ছায়া ছোট হতে লাগল ক্রমশ। কোনও ট্র্যাকের চিহ্ন নেই। নেই ইন্ডিয়ানদের চলাফেরার অন্য কোনও চিহ্ন। নির্দিষ্ট ট্রেইল ধরে চলে না মোযেভরা।

চারদিক সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করছে টহলদলটি। 'শত্রুর সন্ধানে বেরোইনি আমরা,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'টহলের মূল উদ্দেশ্য ইন্ডিয়ানদেরকে একটু পেশী প্রদর্শন করা।'

একজাগায় দেখা গেল পুড়ে যাওয়া কতগুলো ওয়াগনের কঙ্কাল। 'ইন্ডিয়ান আক্রমণের পরিণতি।' জানাল ইয়াসীন। 'বছর কয়েক আগে ওয়াগনের একটা কাফেলা যাচ্ছিল এপথে। পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ করে ওরা।'

'ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ?' জানতে চাইল সাইমন।

'একজন যাত্রী নিহত আর তিনজন আহত হয়। ছয়টা মাল বোঝাই ওয়াগন পুড়ে যায় আগুনে। লুট হয় বাকিগুলো। ঘোড়াগুলো ছিনিয়ে নেয় ইন্ডিয়ানরা।'

'বিনিময়ে?'

'ইন্ডিয়ানরা বিনিময়ে বিশ্বাসী নয়, সার। ক্ষতি স্বীকার করতে মোটেই রাজি নয় ওরা। কারণ লোকবল সীমিত ওদের। এদিকে পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে লোভী সাদা চামড়ার দল।'

'আমরা কি আক্রান্ত হতে পারি?'

'সে সম্ভাবনা খুব কম। এরকম একটা সশস্ত্র বাহিনীকে ঘায়েল করতে হলে প্রচুর লোকবল প্রয়োজন। অত লোক একসাথে করা সহজে সম্ভব নয়। তবে আমাদের বিশ্রামের সময় ঘোড়াগুলো ভাগিয়ে নেবার মতলব আঁটতে পারে ওরা।'

বিশ্রামের সময় মোকাটো এসে বসল পাশে। 'আমার মনে হয় আশেপাশেই আছে ইন্ডিয়ানরা। সকালে যে স্টেজকোচটা ক্যাম্প থেকে রওনা দেবে সেটা আক্রমণ করতে পারে ওরা।'

'কথাগুলো লেফটেন্যান্টকে জানানো উচিত।' মন্তব্য করল ইয়াসীন।

পুবে মোড় নিয়ে কিছুদূর যাবার পর দেখা গেল প্রথম ইন্ডিয়ান ট্রেইল। চারজন ইন্ডিয়ান মধ্যম গতিতে হেঁটে গিয়েছে উত্তর-পশ্চিম দিকে। দ্বিতীয় ইন্ডিয়ান ট্রেইলটা দেখা গেল আরও ছয় মাইল এগিয়ে। এবারে ছয়জনের পায়ের ছাপ। সবাই প্রায় দৌড়ে যাচ্ছে উত্তর-পশ্চিম দিকে।

ঘোড়া থেকে নেমে পায়ের ছাপগুলো ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখল লেফটেন্যান্ট সাইমন। 'কতক্ষণ আগে গেছে ওরা?' মোকাটোকে জিজ্ঞাসা করল সে।

'ঘণ্টা দুয়েক। এতক্ষণে স্টেজকোচের রাস্তাটার উপরে পৌঁছে যাবার কথা।'

ম্যাপটা বের করল সাইমন। 'স্টেজের সাথে পাহারাদার থাকবে নিশ্চয়ই,' আনমনে বলল সে।

নিবিষ্টচিত্ত সাইমনকে দেখছে ইয়াসীন। আত্মবিশ্বাসে কমতি নেই লেফটেন্যান্টের। সহজে সিদ্ধান্ত পাল্টাবে না সে। তবে যদি প্রয়োজন বোধ করে, নতুন সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধান্বিত হবে না একটুও।

মনে মনে পানির বোতলটা মাপল ইয়াসীন। মরুভূমিতে ওটাই আসলে সব সিদ্ধান্তের চাবিকাঠি। এবং ইন্ডিয়ানরা ভালভাবে জানে কথাটা।

অস্ত্রশস্ত্রে কমতি নেই টহলদলের। প্রত্যেক সৈনিকের সাথে রয়েছে সাত গুলির পয়েন্ট ফাইভ সিক্স, পয়েন্ট ফাইভ জিরো কারবাইন। একটা কার্ট্রিজ কেসে পোরা আছে দশটিউব করে বাড়তি কার্ট্রিজ। এ ছাড়া প্রত্যেকের কোমরে ঝুলছে পয়েন্ট ফোর ফাইভ ক্যালিবারের ভয়ালদর্শন কোল্ট রিভলভার। বাঁটটা সামান্য বেরিয়ে আছে খাপ হতে। যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে টেনে আনা যায় দ্রুত।

অপ্রয়োজনীয় বোঝা কমাবার জন্য তরবারিগুলো খুলে রাখা হয়েছে ক্যাম্পে। ইন্ডিয়ানদের বর্শার মোকাবিলায় খুব কাজে আসে না ওগুলো।

ক্যাম্পকেডিতে বেশ আগে এসেছে ইয়াসীন। পশ্চিমের ভিন্ন একটা ইনফ্যানট্রি ইউনিট থেকে পাঠানো হয়েছিল তাকে। তাই তার অস্ত্রগুলো একটু ভিন্ন। কোমরে তারও আছে কোল্ট তবে সাত গুলির কারবাইনের পরিবর্তে রয়েছে ষোলো গুলির পয়েন্ট ফোর ফোর হেনরী রাইফেল। বুলেটগুলো দুশো ষোলো গ্রেইনের। পিছনে পঁচিশ গ্রেইনের পাউডার চার্জ। এ ছাড়া নিয়ম বহির্ভূত আরও একটা অস্ত্র আছে ইয়াসীনের কাছে। জামার ভিতরে কোমরে লুকানো একটা পিস্তল। শেষ মুহূর্তে ব্যবহৃত হবার অপেক্ষায়। আজ হয়তো সব কিছুই কাজে লাগাতে হবে—মনে হলো তার।

উত্তপ্ত বালিতে কেঁপে কেঁপে যায় বাতাস। কেঁপে যাচ্ছে আদিগন্ত দৃশ্যমান

সবকিছু। প্রাণহীন প্রান্তরের একমাত্র ব্যতিক্রম একটা শকুন। আকাশের অনন্ত নীলে অলস চক্রে বিলি কাটছে সেটা।

দুপুরের পরে একটা গিরিখাতের কাছে পৌঁছাল ওরা। পশ্চিমে এগুলোকে বলে ক্যানিয়ন। থামতে আদেশ দিল লেফটেন্যান্ট। ছায়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিশ্রাম নিতে বসল সবাই।

'সবকিছু কেমন কাঁপা কাঁপা, অস্পষ্ট। তোমার অভিজ্ঞ চোখেও কি এরকম দেখা যায়, ইয়াসীন?' লেফটেন্যান্টের কণ্ঠে কৌতূহল।

'ইয়েস, সার।'

'এবং সব জায়গায় একই দৃশ্য?'

'সামনে কিছু বালিয়াড়ি আছে। আর কয়েকটা মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ।'

'শুনলাম,' চকিত দৃষ্টি লেফটেন্যান্টের, 'অফিসার ছিলে তুমি।'

'অন্য আর্মিতে, সার।'

'এর আগের সেনানিবাসে আমার ফার্স্ট সার্জেন্ট ছিল তোমার মত। অন্য এক আর্মিতে কর্নেল ছিল সে।'

'ওরকম হয় অনেক সময়।'

'মরুযুদ্ধে কতদিনের অভিজ্ঞতা তোমার?'

'তা-হবে একযুগ।' সত্যটা উপলব্ধি করে নিজেই বিস্মিত হলো ইয়াসীন। 'তবে এবারে সময় শেষ আমার। ছাড়পত্র এলেই বিদায় নেব।'

'আবার নতুন ভাবে ফিরে আসার জন্য?'

'না, অফিসার। আর ফিরব না। অন্যের জন্য অনেক লড়েছি। এবারে নিজস্ব যুদ্ধটা শুরু করতে হবে।'

'না ফিরলে ভালই করবে, সার্জেন্ট। মরুভূমিতে মানুষের কোন্ স্বপ্নটা সার্থক হয় বলো?'

'এখান থেকে দূ-র দক্ষিণে।' অস্পষ্ট সপ্নীল কণ্ঠে বলতে লাগল ইয়াসীন। 'কলোরাডো মরুভূমি সম্পর্কে একটা গল্প আছে। মুক্তা বোঝাই একটা জাহাজ হারিয়ে যাবার গল্প। মরুভূমি ওখানে সী লেভেল এর নীচে। বন্যার সময় পথ ভুল করে মরুভূমিতে ঢুকে পড়ে জাহাজটা। পানি দ্রুত সরে যাওয়াতে বেরোতে পারেনি আর।

'আরও জানা যায়, অ্যাজটেকদের আদি বাসস্থান ছিল ওটা। পরে ওজায়গা ছেড়ে মেক্সিকোতে চলে যায় তারা।'

'ঐতিহাসিক কোনও প্রমাণ আছে এসবের?'

'নির্দিষ্ট কিছু নেই তবে প্রাচীন কয়েকটা স্প্যানিশ দলিলপত্রে কিছু কিছু

ঘটনার উল্লেখ আছে। ওরাই প্রথম এসেছিল এ অঞ্চলে।'

'ফাদার গ্যারেটের লেখা রিলাসিওনে আছে একদল স্প্যানিশ নাবিকের কথা। পথ ভুলে তারা চলে এসেছিল গালফ অভ ক্যালিফোর্নিয়াতে। সেখানে কিছু এশিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ হয় তাদের। সেখানকার ইন্ডিয়ানদের সাথেও তাদের সাক্ষাৎ এবং পণ্যের বিনিময় ঘটে। পরে প্রায় পনেরোশো আটত্রিশ সাল পর্যন্ত ওই বাণিজ্য সম্পর্ক অটুট ছিল বলে ধারণা করা হয়।'

উঠে দাঁড়াল লেফটেন্যান্ট। ইয়াসীনও উঠল। 'মরুভূমি অবশ্য যত আজগুবী ঘটনার ডিম পাড়ে।' বলল ও। 'বিশেষ করে এধরনের অল্পবয়স্ক মরু।'

'অল্পবয়স্ক, তুমি কীভাবে জানো, সার্জেন্ট?'

'খুঁড়ে দেখুন অফিসার। অল্প কিছুটা খুঁড়লেই উঠে আসবে কালো মাটির স্তর। ইতিহাসের কথা বলবে তা। জীবনের কোলাহল সমৃদ্ধ বনস্থলীর ইতিহাস। মানুষের জ্ঞান তো এক খণ্ড হিমশৈলের মত। আট ভাগের সাতভাগই যার অদৃশ্য!'

'ও কে, সার্জেন্ট। ঘোড়ায় উঠতে বলো সবাইকে। আমরা আবার শুরু করব।'

পথে কোনও ইন্ডিয়ানকে দেখা গেল না। কেবলমাত্র কম্পমান হিটওয়েভ ছাড়া সবকিছুই নিথর। ভেগাস স্প্রিং-এর সাথে দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

আবারও দেখা গেল ট্র্যাক। চারজন ইন্ডিয়ান...উত্তর পশ্চিমে যাচ্ছে।

'কী ব্যাপার?' মোকাটোকে জিজ্ঞাসা করল লেফটেন্যান্ট সাইমন।

'ওরা জেনে গেছে স্টেজটা আসার খবর। খুব সম্ভব হামলা চালাবে ওটার উপর।'

হাত উঁচিয়ে দলটাকে দাঁড় করাল লেফটেন্যান্ট। 'তাই মনে হচ্ছে, মোকাটো?'

'বেশ কিছু ইন্ডিয়ান যাচ্ছে ওদিকে। এ পর্যন্ত প্রায় পনেরো জনের কথা জেনেছি আমরা। হয়তো অন্যান্য জায়গা থেকে আরও ইন্ডিয়ান চলেছে ওদিকে। অকারণে নিশ্চয়ই ওদিকে যাচ্ছে না ওরা।'

'ইয়াসীন, তোমার মতামত?'

'মোকাটোর সাথে একমত আমি। অকারণে কিছুই করে না ইন্ডিয়ানরা। এ পর্যন্ত তিনটে দলের পায়ের ছাপ পেয়েছি আমরা। সবাই উত্তর পশ্চিমে চলেছে। আর একটাই গন্তব্য আছে ওদিকে। ভেগাস স্প্রিং, অর্থাৎ লাসভেগাসে যাবার রাস্তা।'

করণীয় সম্পর্কে ভাবছে সাইমন। তার এই টহলের উদ্দেশ্য যুদ্ধ নয়। মোযেভদের একটু ভয় দেখানো মাত্র যাতে সরকারী রুটে চলাচলরত

স্টেজগুলোর উপরে হামলা করতে সাহস না পায়। তবে টহলের সময়ও যদি ইন্ডিয়ানরা কাফেলা চলাচলের সরকারী রুটগুলোতে বিপত্তি সৃষ্টি করে, তবে তা প্রতিহত করার নির্দেশ রয়েছে।

ভোগাস স্প্রিং-এর রুট ধরে এগিয়েছিল সাইমন। পরে পুবে মোড় নিয়ে চলেছে ফোর্টমোযেভের রুটের দিকে। অথচ ইন্ডিয়ানদের কয়েকটা দল যাচ্ছে ভেগাস স্প্রিং রুটের দিকে। এবং মোকাটো ও সার্জেন্টের মতে বিপত্তি সৃষ্টি করতে।

নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিহত করতে হবে ওদের। তার জন্যে প্রয়োজন হলে ফিরে যেতে হবে ভেগাস স্প্রিং রুটে। প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতে হবে মোযেভদের সাথে। যদিও টহলের উদ্দেশ্য যুদ্ধ নয়।

'ঠিক কোথায় হামলাটা চালাতে পারে ওরা?' জিজ্ঞাসা করল লেফটেন্যান্ট।

মোকাটোর দিকে তাকাল ইয়াসীন। 'বিটার স্প্রিং?'

'বিটার স্প্রিং।' জানাল মোকাটো। 'ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াতে সেখানে থামবে স্টেজ।'

'বিটার স্প্রিং।' আদেশ দিল লেফটেন্যান্ট সাইমন। ঘুরে উত্তর পশ্চিমে রওনা হলো টহল দল।

সমুদ্র সমতলের তুলনায় বেশ উঁচু মোযেভ মরুভূমি। গড় উচ্চতা দুই হতে পাঁচ হাজার ফুট। ব্যতিক্রম কেবল ডেথ ভ্যালি। সাড়ে পাঁচশো বর্গমাইলের এই বিশেষ জায়গাটা সীলেভেলের চেয়ে গড়ে প্রায় দুইশো ফুট নিচু।

গ্রীষ্মের গড় তাপমাত্রা একশো চৌত্রিশ ডিগ্রী। কোনও ঢাল বা ক্যানিয়নের কাছে তা আরও পঞ্চাশ ডিগ্রী বেশি হতে পারে। শীতকালে ব্যাপারটা অবশ্য অন্যরকম। সারাদিন হাড়কাঁপানো হাওয়া বয়। রাতে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছে নেমে যায়। কখনও বা হালকা ভাবে পড়ে তুষার। দীর্ঘস্থায়ী হয় না তুষারপাত। তবে মোযেভ মরুভূতিতে শীতকালের মত নির্মম শাস্তি আর কিছু নেই।

উদ্ভিদ একেবারে অনুপস্থিত নয় এ মরুতে। তবে উদ্বাস্তুর মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাদের অবস্থান। তাও কয়েক ধরনের ক্যাকটাস, যোশুয়ার ঝাড় ও গ্রীজউডে সীমাবদ্ধ। প্রত্যেকেই নিজস্ব নিয়মে শিকড় ও শাখা বিস্তার করেছে। মরুভূমিতে টিকে থাকতে হলে প্রত্যেকেরই স্বউদ্ভাবিত পদ্ধতির প্রয়োজন হয়।

গ্রীজউডের ঝোপগুলো একটা নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে একটানা জন্মায়। অন্য বৃক্ষের সহঅবস্থান সেখানে বিরল। ও ধরনের একটা এলাকা উঁচু থেকে চমৎকার দেখায়। ধু-ধু বালির মধ্যে সুদৃশ্য একটা আঙ্গুর বাগানের মত।

বিগত বরফযুগে কিন্তু মোযেভ মরুভূমির রূপ ছিল অন্যরকম। আকাশে তখন

চরে বেড়াত জলবতী মেঘ। ভূমিতে বিচরণ করত নানা জাতের প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী। ম্যামথ, তিনক্ষুরো ঘোড়া, উট এবং আরও অনেক কিছু।

তখনও ছিল মানুষ। তবে অস্ত্রে বস্ত্রে সুরক্ষিত নয়। শীত মানাত তারা কোনও জন্তুর চামড়ায়, শিকার করত পাথরের হাতিয়ার দিয়ে।

ভূমি বরাবরই প্রায় সমতল। মাঝে মাঝে তার অখণ্ডতা বিঘ্নিত হয়েছে পাহাড়ের সারি, পাথুরে আল কিংবা কোনও ঢালের কারণে।

অধিকাংশ পাহাড় আগ্নেয়শিলায় গড়া। অতীত অগ্ন্যুৎপাতের সাক্ষী হয়ে আছে এখানে ওখানে মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। ক্ষতবিক্ষত বাঁধের আকারে বহুদূর চলে গেছে জমাটবাঁধা লাভা স্রোত। ওগুলো অতিক্রম করা দুরূহ ব্যাপার। তবে মোযেভরা পারে, কারণ খাঁজ কাটা জায়গাগুলোর খবর জানা আছে তাদের।

হ্রদগুলো অনেক আগে থেকে শুকনো। তার তলায় শূলের মত উঁচু হয়ে আছে সারি সারি তীক্ষ্ণ সাদা ফলা। পানি শুকিয়ে গেলে লবণ ও ক্ষার জমে ওরকম আকৃতি নিয়েছে। প্লায়া বলা হয় শুকনো হ্রদগুলোকে। অবিরাম মরীচিকা দেখা যায় ওগুলোতে।

বাতাসের ঘনত্বে ভিন্নতার কারণে মরীচিকার সৃষ্টি হয়। বাতাসের ঘনত্ব অনুযায়ী বেঁকে যায় সূর্যরশ্মি। ফলে পাহাড়গুলো অনেক কাছে মনে হয়, আর প্লায়াগুলোকে মনে হয় টলটলে জল পরিপূর্ণ হ্রদ।

ছোটবড় ঘূর্ণি তৈরি হয় উষ্ণতার তারতম্যের ফলে। তপ্তবালির সংস্পর্শে হালকা হয়ে যায় নীচের উষ্ণ বাতাস। উঠে যায় উপরে। এবং ওঠার সময় শুষে নেয় আলগা বালি। সাধারণত ছোট হয় ঘূর্ণিবায়ুগুলো। তবে বড়ও আছে। কোনও প্রখর মধ্যাহ্নে মরুভূমিতে দেখা যায় এধরনের একাধিক ঘূর্ণি। নিঃশব্দে প্রেত-নৃত্যে মত্ত।

দূরে একটা বিশাল ঘূর্ণি। অশুভ নৃত্যভঙ্গিমায় ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে। ওটার দিকে আবারও তাকাল ইয়াসীন। চোখ জ্বালা করছে তার। কপাল বেয়ে ঘাম নামছে চোখের কোণে। কিন্তু চিবুকে পৌঁছানোর আগেই পরিণত হচ্ছে লবণে। রাগী সূর্যটাকে সম্মান জানানোর ভঙ্গিতে সামনের দিকে হেঁট হয়ে আছে তার মাথা। রোদ এড়ানোর বিফল প্রচেষ্টা।

ঘূর্ণিবায়ুটা অস্বস্তিতে ভোগাচ্ছে তাকে। যথেষ্ট বালি পাক খাচ্ছে ওটায়। ফলে ওপাশের সবকিছু অস্পষ্ট। ওর আড়ালে যদি কাছে এগিয়ে আসে ইন্ডিয়ানরা, বোঝা যাবে না সহজে।

মগজ থেকে মরুভূমির অবসাদ জোর করে তাড়াল ইয়াসীন। উত্তাপ আর তৃষ্ণায় কমবেশি দিশেহারা হয়ে পড়েছে দলের সবাই। মন্থর ঘোড়ার পিঠে নুয়ে

থাকে পরাজিতের মত। এ মুহূর্তে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

কারণ সামনেই কোথাও আছে ইন্ডিয়ানরা। কতজন বলা মুশকিল। বিশ, পঞ্চাশ, ষাট–যে কোনও সংখ্যায় থাকতে পারে। স্টেজটা আক্রমণ করতে যাচ্ছে ওরা। আর ইয়াসীনরা চলেছে তাদের বাধা দিতে।

অর্থাৎ আরও একটা মরুযুদ্ধ। কত যুদ্ধ যে করল সে মরুভূমিতে! পাঞ্জাবে লড়েছে বৃটিশদের পক্ষে, আফগানিস্তানে দোস্ত মোহম্মদের পক্ষে–আবার সাহারায় লড়েছে তুরেগদের বিপক্ষে। প্রতিটা যুদ্ধই ছিল রক্ত আর রৌদ্রের প্রখর নির্মমতা। প্রতিটা যুদ্ধই তীক্ষ্ণধার তরবারির মত শাণিত করেছে তাকে। যুদ্ধ মানুষকে ক্রমাগত শাণিয়ে দেয়!

যুদ্ধে যুদ্ধে গড়ে ওঠে মোযেভ ইন্ডিয়ান সৈনিক। অতীতে যুদ্ধ ছিল সমগোত্রীয় ইন্ডিয়ানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বর্তমানে যুদ্ধ করতে হয় সাদাচামড়াদের সাথে। অদ্ভুত ওই সাদাচামড়ার মানুষগুলো। দলে দলে আসে তারা। একটাকে মারলে পরিবর্তে দশটা এসে হাজির হয়। বীরত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশে নয়। বেহিসেবী লাভের রণোন্মত্ত আগ্রাসন প্রতিষ্ঠা করতে।

খুব হীন আর স্বার্থপর হয় সভ্য মানুষ। প্রকৃতিদত্ত প্রতিটি জিনিসেই সবার সমান অধিকার, এই ইন্ডিয়ান নীতি মানে না তারা। ওয়াটার হোলগুলোর চারপাশে বেড়া তুলে তার ব্যক্তি মালিকানা দাবি করে। অবাধে চরে বেড়ানো ঘোড়া আর গরুগুলো ধরে নিয়ে বিক্রি করে দেয়। ভাল কোনও জমি দেখলে সেখানে গড়ে তোলে নিজস্ব খামার।

এই জীবনযাত্রা পছন্দ নয় ইন্ডিয়ানদের। সমষ্টিকে বঞ্চিত করে ব্যক্তির সমৃদ্ধি ঘৃণা করে ওরা। ঘৃণা করে সভ্যতার স্বার্থান্বেষী নিয়ম। তাই সুযোগ পেলে সাদা মানুষ মেরে ফেলে ওরা। তবু আসে সাদারা। প্রকৃতির অগাধ ঐশ্বর্য হতে ক্রমাগত বঞ্চিত করে ওদের। গড়ে তোলে অবাক সভ্যতা।

সামনে একটা জমাট লাভার প্রাকৃতিক দেয়াল। সরু ছায়া পড়েছে তার পাশে। বিশ্রামের জন্যে দলটাকে থামাল সাইমন। ছায়ার আশ্রয়ে কোনও মতে মাথা গুঁজল সবাই। মোকাটো উঠে গেল উঁচু দেয়ালটার উপর। চারদিক ভাল করে দেখে নিতে চায়।

কোনওদিকে মানুষের চিহ্ন নেই। তবু সন্দেহ দূর হলো না মোকাটোর। মরুভূমির কোনও দৃশ্যই সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত হতে পারে না সে। এবং সেজন্যেই বেঁচে আছে এতদিন!

ছোট্ট একখণ্ড লাভার উপরে বসে আছে সাইমন। এই প্রবল রোদেও জমাটবাঁধা লাভার খণ্ডটা শীতল রয়েছে দেখে বিস্মিত হলো সে। পিপাসা পেয়ে

গেল তার। পানির বোতলটা কোমর থেকে খুলে হাতে নিল।

'কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস কাছেই আছে ওরা। আমাদের আরও সাবধান হওয়া উচিত।' দেয়ালের উপর থেকে বলল মোকাটো।

'কতদূর এসেছি আমরা?' মরুভূমিতে পথ চলার হিসাব গুলিয়ে ফেলেছে অনভ্যস্ত সাইমন। ইয়াসীনকে প্রশ্ন করল সে।

'অনেকটা এগিয়েছি।' জানাল ইয়াসীন। 'খুব বেশি হলে আর পাঁচছয় মাইল বাকি।'

আরও কিছুক্ষণ বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিল সাইমন। তবে অসতর্ক হওয়া চলবে না, তাই চারজন সৈন্যকে পাহারায় দাঁড় করিয়ে রাখল সে। পালাক্রমে পনেরো মিনিট অন্তর পাহারা পাল্টানোর নির্দেশ দিল। বিশ্রামের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে অন্যরা ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে বালিতে।

গরমে চোখ জ্বলছে সাইমনের। বন্ধ করলেই চোখের পাতা পুড়ে উঠছে ছ্যাঁৎ করে। দূরে তাকানো দুষ্কর। তবু দূরে তাকিয়ে থাকতে হবে। সতর্কতার সাথে লক্ষ রাখতে হবে চারদিকে।

এই প্রবল উত্তাপে কী করে ইন্ডিয়ানদের যুদ্ধের নেশা অটুট থাকে ভেবে পেল না সাইমন। স্বেচ্ছায় মরুভূমিতে পোস্টিং নিয়ে আসাটাও মনে হলো বিকট বোকামি। আসলে সে চেয়েছিল অ্যাকশন। চেয়েছিল–ক্রোধ, ঘৃণা, হত্যা ও রক্তে জীবনের একটা ভীষণ ওলটপালট! অবশেষে অখণ্ড স্থিতি।

অথচ আশা পূরণ হয়নি তার। কীসে যে জীবনের স্থিতি!

একবার একটা মেয়েকে ঘিরে স্থির হবার কথা ভেবেছিল সাইমন। ভাবতে ভাবতে অন্যের ঘরে চলে গেল মেয়েটা। দীর্ঘকাল তার জন্যে অনুতপ্ত হতে হতে এখন মনে হয় ভালই হয়েছিল! ওভাবে স্থির হতে পারে না কোনও জন্ম যোদ্ধা।

উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল লেফটেন্যান্ট। টুপি খুলে ধুলো ঝাড়ল। কয়েকবার চোখ পিটপিট করে তাকাল দূরে। দিগন্তে একাকার হয়ে আছে মোযেভের বাতাস, রৌদ্র, বালি, আর বৈরী মানুষ!

'ওঠো সবাই,' নির্দেশ দিল সে। 'আপাতত পায়ে হেঁটে এগোব আমরা। ভবিষ্যতের জন্য জমা থাকুক ঘোড়াগুলোর শক্তি।'

সবার আগে ইয়াসীন। হাঁটতে হাঁটতে পিছনের সৈন্যদের কথা ভাবছে সে। দলের বারোজন সৈন্যের মধ্যে চারজন যথার্থ যোদ্ধা। বড় যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অভিজ্ঞতা আছে তাদের। অন্য চারজন বেশ কিছুদিন যাবৎ আছে ইন্ডিয়ান ফাইটিং আর্মিতে। কিন্তু বাকি চারজন সেনাবাহিনীতে নতুন। যুদ্ধ কিংবা মরুভূমি–কোনওটাই আগে দেখেনি ওরা। যদি মরে না যায় তবে এখানে দীর্ঘস্থায়ী

হবে না তাদের অবস্থান। শীঘ্রই পালিয়ে ঘরে ফিরবে। মোযেভের যুদ্ধে আনাড়ীদের কোনও স্থান নেই!

একে একে হয়তো সবাই ফিরে যাবে। শুধু মোকাটো ছাড়া। যুদ্ধে বিধ্বস্ত এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে গোত্রের সবাই। ফেরার মত কোনও গন্তব্য নেই তার।

ইয়াসীন নিজে কী করবে বলা মুশকিল। জন্মভূমি বৃটিশের পদানত। ফেরা না ফেরার সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে সে। ফিরে গেলে যুদ্ধ করতে হবে তাকে। না ফিরলেও!

ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর থামার নির্দেশ দিল লেফটেন্যান্ট। 'আর কতদূর?' ইয়াসীনকে জিজ্ঞাসা করল।

'এখনও দূর আছে,' বলল ইয়াসীন। 'তবে বিটার স্প্রিং যাবার সরকারী রাস্তাটা আশপাশ দিয়েই গেছে। স্টেজ সেই পথ ধরে যাবে।'

'অলরাইট, ইয়াসীন। রাস্তাটা খুঁজে দেখো তুমি,' বলল অফিসার। 'তবে সতর্ক থেকো। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে চাই।'

সাইমনের সতর্কবাণীটা শুধু ইয়াসীনের জন্যে নয়। তার নিজের নিরাপত্তার জন্যেও বলা। মোযেভ মরুভূমিতে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই তার। অথচ নেমে পড়তে হয়েছে ভয়ংকর খেলাতে। হাতে তুরুপের তাস মাত্র দুখানা। ইয়াসীন আর মোকাটো। জেতার জন্যে বড় দানে নামাতে হবে ওদের।

ঘোড়ার রেকাবে উঠে দাঁড়াল ইয়াসীন। 'দূরের ওই পাহাড় পর্যন্ত দেখে আসতে পারি আমি। যাব, সার?' অফিসারকে জিজ্ঞাসা করল।

'ইয়েস।'

জিনে নেমে বসল সে। মুখ নামিয়ে আনল কালো ঘোড়াটার কানের কাছে। 'ভয় নেই, সাগরেদ। ফিরে আসব আমরা,' ফিসফিসিয়ে বলল। পেটের কাছে গোড়ালির চেনা সংকেতে চলতে শুরু করল ঘোড়াটা।

খোলা জায়গায় এমন একাকী এগিয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। সামনের ঢালে নেমে গেল ইয়াসীন। পিছনে আড়াল হয়ে গেছে টহল দল। হয়তো এমনি একটা ঢালে প্রবাহিত হত সেই সোনার নদী!

স্টেজ কোচ চলাচলের রাস্তাটা আছে সামনে কোথাও। আসন্ন বিপদ মাথায় নিয়ে ওই পথে চলবে আজকের স্টেজ। চলেছে তার স্বপ্নের মেয়ে বেলিন্দাকে নিয়ে। আজ যেন কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে—প্রার্থনা করল ইয়াসীন।

আজকের প্রতি এই বিশেষ পক্ষপাতিত্ব কেন? নিজেকে শুধায় ইয়াসীন। বেলিন্দার জন্যে? বেলিন্দাকে সে কি ভালবাসে? উত্তরহীন এ এক জ্বালাময় জীবন-জিজ্ঞাসা তার। জীবনে কোনও নারীর প্রেম সে পায়নি। পাবে কী করে! সেরকম

সময়গুলো তো যুদ্ধে যুদ্ধেই কেটে গেল।

তবুও বুকের মধ্যে ভালবাসার সতেজ মরূদ্যান। কথাটা ভাবলেই কেবল একজনের কথা মনে আসে। আর কেউ নয়। শুধু বেলিন্দা ব্রাউন নামের একজন। জীবনে সত্যিকার ভালবাসার নারী বোধহয় চিরকাল একজনই থাকে!

সামনের পাহাড়টাকে হাতের বাঁয়ে রেখে এগোতেই ট্রেইলটা পাওয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে এ পথে আসবে স্টেজ কোচ।

এবং হঠাৎই বালির কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ওরা। এক পলকে ছয়জনকে দেখল ইয়াসীন। বাদামী দেহগুলো মাখামাখি হয়ে আছে ধূসর বালিতে। একটা তীর পিছলে গেল ঘোড়ার জিনে লেগে। অহেতুক বীরত্ব দেখানোর বোকামি না করে পড়িমরি ঘোড়া ছুটাল সে। হঠাৎ গতি বেড়ে যাওয়ায় চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল ছুঁড়ে মারা একখানা লম্বা ছোরা। এমন সময় এক তাগড়া ইন্ডিয়ান ঝুলে পড়ল তার পা ধরে। ফেলে দিতে চায় ঘোড়া থেকে। নির্দয়ের মত রাইফেলের কুঁদো চালাল ইয়াসীন। রক্তাক্ত হলো মাথাটা। পা থেকে পিছলে গেল ইন্ডিয়ানের হাত।

বাঁ দিকের পাহাড় বেশ কাছেই। দুরন্ত ক্ষুরে সেদিকে ছুটল তার ঘোড়া। তবু রক্ষে নেই। পথ আগলাতে–সামনে গজিয়ে উঠল আরও দুজন মোযেভ।

ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসে লক্ষ্যে অব্যর্থ হওয়া নৈপুণ্যের ব্যাপার। সবাই পারে না, কিন্তু ইয়াসীন পারল।

ইন্ডিয়ানটার বুকে লাগল বুলেট। অপরজন দ্রুত কাছিয়ে আসায় গুলি করার সময় মিলল না। তাকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল ইন্ডিয়ানটা। কোমরের কাছে হেঁচকা টানে জিনচ্যুত হলো ইয়াসীন। বালিতে দুটো ডিগবাজি খেয়ে উঠে দাঁড়াল সে। হাতের রাইফেল ছিটকে বেরিয়ে গেছে।

খালি হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে ইন্ডিয়ানটাও। প্রকাণ্ড পেশল শরীর তার। ইয়া–য়া...। বিকট চিৎকার করে ছুটে এল সে। ডাইনে ঝোঁক দিয়ে বাঁয়ে কাটল ইয়াসীন। দেহের সমস্ত শক্তি নিংড়ানো ঘুসিটা মারল পেটে। তাতে মোটেও কাবু হলো না ইন্ডিয়ানটা। আবার চিৎকার দিয়ে আক্রমণ করতেই তার চোয়ালের ডানে বাঁয়ে কয়েকটা জ্যাব এবং শক্ত একটা আপার কাট মারল ইয়াসীন।

বক্সিং-এর মারগুলো বুঝতে পারল না ইন্ডিয়ান। খালি হাতে লড়াইয়ে জাপটে ধরে ধস্তাধস্তি হবে ধারণা ছিল তার। আহত বিস্ময়ে মুহূর্তের জন্য থমকালো সে। তারপর লাফ দিল।

পিস্তলটা বের করতে ইয়াসীনের জন্য মুহূর্তটাই যথেষ্ট ছিল। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে ট্রিগার টিপল সে। হুড়মুড় করে বালিতে পড়ল ইন্ডিয়ানটাকে নিয়ে। আবারও গুলি করতে যাচ্ছিল। বাদামী দেহটা নড়ছে না দেখে ঢিল করল ট্রিগারের

আঙুল। মৃতদেহটা শরীরের উপর হতে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আশেপাশে আর কেউ নেই। শিস দিয়ে ঘোড়াটাকে ডেকে নিল ইয়াসীন। রাইফেল কুড়িয়ে নিল। উঠতে যাচ্ছিল ঘোড়ায়। গুলির শব্দে লাফিয়ে উঠল ঘোড়া। ওটার লাগাম ধরে দৌড় দিল ও পাহাড়ের কোলে বিক্ষিপ্ত বোল্ডারগুলোর দিকে।

দক্ষিণ দিকে গোলাগুলির আওয়াজ। সাইমনের দলও আক্রান্ত হয়েছে সম্ভবত।

দুটো বড় পাথরের চাঁইয়ের ফাঁকে ঘোড়াটাকে দাঁড় করাল ইয়াসীন। ওটার ঘাড়ের কাছে আঁচড় কেটে চেলে গেছে বুলেটটা। মারাত্মক কিছু নয়।

চুপচাপ দাঁড়া এখানে। ঘোড়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল ও। জিনে ঝোলানো কার্ট্রিজ কেস থেকে বুলেট ভরল রাইফেলে।

শেল্টারটা চমৎকার। দুজন ইন্ডিয়ানের পায়ের ছাপ বালিতে। ওই দুজনই হয়তো এখানে পজিশন নিয়েছিল প্রথমে। এবং কাছাকাছি আরও কয়েকজন এখনও আছে।

এখানে কিছুটা বিপদমুক্ত সে। দুপাশে প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই। মাথার উপরে কুঁড়েঘরের চালার মত কিছুটা নেমে এসেছে পাহাড়ের দেয়াল। অর্থাৎ পিছন বা পাশ থেকে আক্রমণের ভয় নেই।

সামনে খাঁ-খাঁ প্রান্তর। স্টেজ চলাচলের রাস্তাটা অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায় এখান থেকে। স্টেজের দেখা নেই।

অপেক্ষা করছে ইয়াসীন। আশেপাশে ওত পেতে আছে সশস্ত্র ইন্ডিয়ানরা।

দুপুরের রোদে জ্বলে যাচ্ছে সব।

দশ

স্তব্ধ, অচল একটা সময়।

প্রাণহীন আকাশ বাতাস, দগ্ধ বালু।

প্রতীক্ষারত ইয়াসীন।

পানি আছে তার। বাহন আর অস্ত্র আছে। আছে সীমাহীন ধৈর্য। অপেক্ষা করবে সে। মরুভূমিতে অপেক্ষা ছাড়া কিছুই হয় না।

নিথর বালু এখানে অপেক্ষা করে উদ্বাহু সাইমুমের, বন্ধ্যা ক্যাকটাস অপেক্ষা

করে বর্ষণবতী মেঘের, কালোত্তীর্ণ পাথর সামান্য শেওলা সঞ্চয়ের জন্যে অপেক্ষা করে চলে।

ইন্ডিয়ানরাও আছে অপেক্ষায়। বিদেশী লোকটা ঠিক কোথায় জানে ওরা। এখন শুধু সুযোগের অপেক্ষা। অনেক ক্ষতি হয়েছে ওদের। এবার তা পুষিয়ে নেবার পালা।

কিন্তু ওরা জানে না বিদেশী লোকটাও অপেক্ষায় অভ্যস্ত। অনেকগুলো বছর সে কাটিয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন মরুভূমিতে। এমনি ভাবে, শত্রুপরিবেষ্টিত অপেক্ষায়।

নিশ্চল পাথরের পাশে পাথরের মতই পড়ে আছে ইয়াসীন। শুধু চোখ দুটো সতর্কতার সাথে ঘুরছে ডাইনে বাঁয়ে। আঙুল স্থির রাইফেলের ট্রিগারে। এতক্ষণে দেখা পাবার কথা স্টেজটার। কিন্তু দেখা নেই। আসছে না বেলিন্দা!

দক্ষিণ দিকের গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না আর। সেদিক থেকেও আসছে না কেউ।

ভীষণ সূর্যে দপদপ করছে বালি। বাতাস কাঁপছে দাউদাউ আগুনের মত। মগজে মরীচিকার ঘোর। শুধু সামনের বালি আর দিগন্তের সীমারেখা পরিষ্কার। বাকি সবকিছু ঝাপসা। অনেকটা বার্ধক্যজনিত অস্পষ্ট স্মৃতির মত।

সে স্মৃতিতে জেগে ওঠে সুলাইমানী পাহাড় আর দোস্ত মোহম্মদের ধূসর চিৎকার। সেখানে অফিসার ছিল ইয়াসীন। এক হাজার অশ্বারোহী নওজোয়ান ছিল তার বাহিনীতে। একহাজার সীমান্ত শার্দূল! ঘোড়ার জিনে তাদের জন্ম। হাতের ঝলসানো তলোয়ারে রক্তের দাগ। ইংরেজের নীল রক্ত!

বোখারার একটা ভালজাতের ঘোড়া ছিল তার। বিপদে সহায় হিসেবে সঞ্চয়ে ছিল তিনটে বড় রুবি। আর ছিল মুক্তাশোভিত একখানা কোমরবন্ধ।

একটা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মারা গেল দোস্ত মোহম্মদ। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল গোটা বাহিনী। উপায়ান্তর না দেখে বাগদাদ পালিয়ে গেল ইয়াসীন। দামী কোমরবন্ধটা হারাল এক জুয়ার আড্ডায়। রাতে সরাইখানা থেকে চুরি হয়ে গেল রুবি। অগত্যা সাহারার কাফেলায় শামিল হতে হলো তাকে। কবেকার কথা সে সব!

আজ শুধু স্মৃতিই অবশিষ্ট আছে শরীরের নানাস্থানে অস্ত্রের অতীত ক্ষতচিহ্ন হয়ে। ললাটে চিন্তার অস্পষ্ট বলিরেখা হয়ে। ছোটবড় শখানেক জীবনমরণ লড়াইয়ের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা হয়ে।

কিন্তু াবে আর কতদূর? কতদিন আর এই কালবোশেখী জীবন। বিশ্রামের সময় কি নও হবে না? একখানি ঘর, একচিলতে উঠোন, সাজানো গৃহস্থালী, মধ্যরাতে নষ্ট নিদ্রা! জীবনের এইসব প্রগাঢ় প্রশান্তি কি কখনও জানা হবে না?

তারপর–বৃদ্ধবয়সে তরুণ উত্তরাধিকারদের গল্প বলা! পরিজন পরিবেষ্টিত মৃত্যুশয্যায় এই সত্য উচ্চারণ করা–যে, যতদিন বেঁচেছি বীরের মত লড়ে বেঁচেছি! তোমাদের জন্য সেই ঐতিহ্য আর মর্যাদা রেখে গেলাম!

সেই সময় কী আসবে না ইয়াসীনের জীবনে? নাকি তার আগেই মৃত্যুর অন্ধ আলিঙ্গন গ্রাস করে নেবে সব?

যে কোনও সময়েই মারা যেতে পারে মানুষ। ঠিক এখানে, এই মরুভূমির বালিতে–এই মুহূর্তে একটা বুলেট মিটিয়ে দিতে পারে তার জীবনের সমস্ত সাধ। এই সত্য অস্তিত্বে উপলব্ধি করে ইয়াসীন।

তবু পৃথিবীর কোটিকোটি মানুষের ইতিহাসে তেমন কিছু নয় সেটা। এই অনন্ত বিশ্বে লক্ষকোটি গ্রহনক্ষত্রের বিশাল আবর্তে সামান্য একজন মানুষ বাঁচল কি মরল, সেটা কোনও ঘটনাই নয়। আসল প্রশ্ন হলো–কে কীভাবে খরচ করল জীবনটা। কে উত্তর পুরুষের জন্য রেখে যেতে পারল মাথা উঁচু করে বাঁচার ঐতিহ্য আর মর্যাদা!

কপালের ঘাম মোছে ইয়াসীন। দ্বিধান্বিত দৃষ্টিতে দেখে নেয় পানির বোতলটা। এখন নয়–আরও পরে।

ইন্ডিয়ানরা কি আছে এখনও? না–বরাবরের মত মিলিয়ে গেছে মরীচিকায়!

কিছু যেন নড়ে উঠল দৃষ্টির কোণে। কিন্তু ট্রিগার টিপল না সে। টার্গেট ভালভাবে না দেখে গুলি করে না ও। এক দৃষ্টিতে তাকিয়েও আর কোনও নড়াচড়া দেখা গেল না। অগত্যা আবার স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এল সতর্ক মনটায়। মেজর সাইকের কথা মনে পড়ল।

সাইক ঘৃণা করে তাকে। কিংবা সে ঘৃণা করে সাইককে। বেলিন্দা একটা কারণ। তার চেয়েও বড় কারণ লোকটার অকারণ অহংকার। নিজেকে সবার সেরা মনে করে সাইক। এবং তা প্রমাণ করতে নিজের মেজর র‍্যাঙ্কটার যথাসাধ্য অপব্যবহার করে।

ইয়াসীনের মত একজন সামান্য ভারতীয় সিপাই এককালে তারই মত মেজর ছিল, এটা অসহ্য মনে হয় তার। এবং কোনও নির্দেশ জারি করেই ভুগতে থাকে অস্বস্তিতে। হয়তো কোথাও ভুল রয়েছে নির্দেশটায়। আর ইয়াসীন সেটা ধরতে পেরে হয়তো হাসছে মনে মনে।

ইয়াসীনের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সুযোগ খুঁজেছে সে সর্বদা। কিন্তু কোথাও মেলেনি সুযোগ। তার উপর বেলিন্দার আগমন ও আচরণ দাবিয়ে দিয়েছে তাকে। এখন আর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সুযোগ হয়তো খোঁজে না সাইক। তবে ইয়াসীনের ক্ষতি করার সুযোগ সে ছাড়বে না, যদি পায়।

শার্টে বুকের কাছে তালুর ঘাম মুছে আবার রাইফেলটা আঁকড়ে ধরল ও কোনও সুযোগ দেয়া যাবে না সাইককে। আর কয়েকদিন মাত্র আছে তার চাকুরির মেয়াদ। ছাড়পত্র পৌঁছলেই ফিরে যাবে। আর যুদ্ধ নয়, এবারে একটু শান্তি চাই। কিন্তু শান্তির ছাড়পত্র কবে পাওয়া যাবে জানা নেই।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল দেখা নেই কারও। অস্থির দৃষ্টি বৃথাই ঘুরে মরছে হিটওয়েভের আলোড়নে। কোনও সন্দেহজনক শব্দও শোনা যায় না। এতক্ষণে টহলদলটার আশা উচিত এদিকে। খুঁজে দেখা উচিত কী হয়েছে ইয়াসীনের। গুলির শব্দ নিশ্চয়ই ওরাও শুনেছে।

হঠাৎ আর একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল মনে। তাকে রেখেই কি চলে গেল ওরা? হয়তো গুলির শব্দে মনে করেছে মৃত্যু হয়েছে তার। কিংবা হয়তো ওরাও কিছুক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা করে আশা ছেড়ে দিয়েছে। চলে গেছে স্টেজ কোচটাকে খুঁজতে!

যুক্তির বিচারে সম্ভাবনাটা স্থির বিশ্বাসে পরিণত হলো।

তা হলে ইয়াসীন এখন একা! এবং ফিরে যেতে হলে একা একাই লড়তে হবে তাকে! টহলদলটাকে কতদূর ছেড়ে এসেছিল হিসাব করল সে। তিন-চার মাইলের কম নয়। এতক্ষণে হয়তো আরও দূরে সরে গেছে।

এদিকে স্টেজটারও দেখা নেই। স্টেজ চলাচলের সরকারী রাস্তাটা সামনের প্রান্তরে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু আসছে না স্টেজ। হয়তো এপর্যন্ত আসার আগেই আক্রান্ত হয়েছে সেটা। বেলিন্দার চোখ দুটো মনে পড়ল।

শেল্টার হতে সামান্য মাথা বের করল সে। আর একটু ভালভাবে দেখতে চায় চারপাশটা। রাইফেলের আওয়াজ এল সাথে সাথে। হ্যাটটা ছিটকে পড়ল বালিতে। কার্নিশে একটা ছিদ্র! দ্রুত হ্যাটটা কুড়িয়ে নিয়ে আড়ালে সরে গেল ইয়াসীন। মুখ দিয়ে অনর্গল গালিগালাজ বেরোচ্ছে। হারামাজাদা ইন্ডিয়ানগুলো কতক্ষণে বিদেয় হবে কে জানে!

সূর্য ডুবতে এখনও আরও ঘণ্টা দুয়েক বাকি। আঁধারের আড়াল ছাড়া বেরোনো যাবে না এখান থেকে। হয়তো সেই অপেক্ষায় আছে ইন্ডিয়ানরাও। দিনের আলোয় ইয়াসীনের রাইফেলের সামনে আর আসতে চায় না তারা!

রাত্রির প্রতীক্ষায় আছে ইয়াসীন। তার ঠিক পিছনে আরও সুরক্ষিত জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কালো ঘোড়াটা।

ক্লান্ত মন একটু নিশ্চিন্ত বিশ্রাম চায়। চোখ দুটোয় তন্দ্রা জড়িয়ে আসে। ঢুলুনি হতে হঠাৎ সজাগ হয়ে, সামনের ধু-ধু প্রান্তরটা দেখে নেয় সে। না কোনও শব্দ, না কেউ। কিছুই নেই কোথাও। এই অপেক্ষা ছাড়া পৃথিবীর কোথাও আর

কিছু নেই বোধহয়।

অবশেষে সূর্য গেল পাটে। বাতাস শীতল হয়ে আসছে। চার দিকে হিমের মত নামছে আঁধার। আকাশে একটি একাকী তারা। পিটপিট করে দেখছে তাকে। হয়তো নীরবে জিজ্ঞাসা করছে–ইয়াসীন? এবারে কোন্‌দিকে যাবে তুমি? বিটার স্প্রিং ক্যাম্পকেডি, না একটু ঘুরে মার্ল স্প্রিং? কোনদিকে যাওয়া উচিত?

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে উঠে দাঁড়াল সে। টুপিতে পানি ঢেলে খাওয়াল ঘোড়াটাকে। নিজে খেল একঢোক। এবারে রওনা হওয়া যায়। ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ ছাড়া ইন্ডিয়ানরা কিছুই পাবে না টার্গেট হিসেবে। বেরোতে হলে সেটুকু ঝুঁকি নিতে হবে।

নিঃশব্দে ঘোড়ায় চড়ল ইয়াসীন। দ্রুত কদমে এগোল পঞ্চাশ গজ। তবু গুলির আওয়াজ নেই। কখন যেন চলে গেছে ইন্ডিয়ানরা। কিন্তু কোন্‌দিকে গেছে? কোথায়?

ক্যাম্পকেডির দিকে মাইল দুয়েক এগোল ও। কোনও ট্র্যাক নেই। হয়তো ওদিকে ফিরে যায়নি কেউ। অন্ধকারে ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না কিছু।

মরুভূমিতে একটা চক্কর দিয়ে ফিরে এল ও টহলদলটাকে যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানে। কেউ নেই। ফিরে গেল শুকনো হ্রদটার কিনারে। সেখানেও নেই কেউ। শুধু নক্ষত্রের মৃত আলোয় সাদা দাঁত বের করে হাসছে হ্রদের শুকনো মেঝে!

মাঝে মাঝে থেমে কোনও সচল শব্দ শোনার চেষ্টা করল সে। কোথাও তেমন কোনও শব্দ নেই। কেবল রিরি বয়ে যাচ্ছে অশরীরী বাতাস। ভয়ে গা ছমছম করে উঠল ওর। কোথায় গেল সবাই! লেফটেন্যান্ট সাইমনের টহল দল? বেলিন্দার স্টেজ? প্রতিহিংসায় ছুটে আসা ক্রুদ্ধ মোযেভ ইন্ডিয়ান? কে কোথায়!

শুধু থমথমে রাত উপস্থিত। আর মরুভূমির অজস্র বালুকণার সাথে পাল্লা দিয়ে আকাশের অসংখ্য তারা। দূর উত্তরে নির্বাক পাহাড়ের সারি। ওল্ড ড্যাড রেঞ্জ।

একটা গ্রীজউডের ঝাড় ঘিরে স্তূপাকারে জমে উঠেছে বালির ঢিবি। তার গোড়ায় ঘোড়া থামাল ইয়াসীন। বিশ্রাম দরকার। মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেছে ভয় আর ভাবনা। সেগুলোকে আলাদা করা দরকার।

এরকম একটা রাতে স্টেজের চাকার আওয়াজ অনেক দূর হতে শোনা যায়। গুলির শব্দ শোনা যায় আরও অনেক দূরের। কিন্তু এত ঘুরেও কোনও কিছুর সন্ধান মেলেনি। চোখে পড়েনি কোনও চিহ্ন।

সেক্ষেত্রে দুটো সম্ভাবনা থাকে। হয়তো বিপদ আঁচ করে ক্যাম্পে ফেরত

গেছে স্টেজ। নয় ঘুরে চলে গেছে মার্ল স্প্রিং-এর রুটে। কয়েকজন সৈন্য থাকে সেখানে। অন্তত থাকার কথা।

ওল্ড ড্যাড রেঞ্জে আগে কখনও যায়নি ইয়াসীন। ওদিকে যায় না কেউ সচরাচর। তবু অচেনা পাহাড়টার দিকেই এগোল সে। এতে বিটার স্প্রিং-এর রুট বাঁয়ে সরে যাবে, নিকটবর্তী হবে মার্ল স্প্রিং-এর রুট। যদি স্টেজটা ঘুরে গিয়ে থাকে মার্ল স্প্রিং-এর দিকে তবে তার ট্র্যাক পাওয়া যেতে পারে ওদিকে। কিংবা হয়তো পাওয়া যাবে হারিয়ে যাওয়া টহল দলটা।

এভাবে রাতের অন্ধকারে কাউকে খুঁজতে বেরোনো ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। শত্রুমিত্র চেনা যায় না সহসা। সেমসাইড হয়ে মারা পড়তে পারে সে। অথবা সম্মুখীন হতে পারে কোনও অযাচিত শত্রুর।

তবু দিনের অসহ্য রোদে খোলামেলা এগিয়ে চলার চেয়ে এ অনেক ভাল। সবচেয়ে বড় কথা খুঁজে বের করতে হবে স্টেজটাকে। রাতারাতি পাখা গজিয়ে শূন্যে উড়াল দিতে পারে না সেটা।

কিংবা হাওয়া হয়ে যেতে পারে না লেফটেন্যান্ট সাইমনের টহল দল। অত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওই সাইজের একটা দল এত অল্প সময়ে মারা পড়েছে—ভাবা যায় না।

আছে ওরা। কাছেপিঠেই কোথাও পাওয়া যাবে তার চিহ্ন। শুধু খুঁজে নিতে হবে।

ক্রমশ পাথর হয়ে উঠছে জমি। পাহাড়ের সারি এগিয়ে আসছে কাছে। কালো দৈত্যের মত বিকট হাঁ করে আছে ক্যানিয়নগুলো। শ্মশানের অন্ধকার তাতে। আর এগোতে মন চায় না। আর এগোতে চাইছে না ঘোড়াটাও। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে ওটা। বিস্ফারিত চোখের সাদা জমি দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। ধনুকের ছিলার মত টানটান হয়ে আছে প্রতিটি পেশী।

তার চেয়েও বেশি টান হয়ে আছে ইয়াসীনের স্নায়ু। তবু এগিয়ে গেল সে। অজানা পাহাড়গুলোর কোলে।

এগারো

মরুভূমিরও আছে নিজস্ব জীবনযাত্রা। আছে নিজস্ব ভাষা। মরুরাত্রির আছে একান্ত সংগোপন সংলাপ। আপাত নির্জনতায় বোঝা যায় না সে সব। আপাত নৈঃশব্দে

যায় না শোনা। তার জন্য প্রয়োজন অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা।

মরুভূমিকে বুঝতে হলে পর্যাপ্ত সময় দিতে হয় তাকে। ধীরে ধীরে তীক্ষ্ণ আর অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সমস্ত ইন্দ্রিয়। তখনই কেবল শ্রাবণের অতীত সব শব্দ শোনা যায়,, অন্তরালের রহস্য উন্মোচিত হয় দৃষ্টির সম্মুখে। সময়-অনুশীলন সাপেক্ষ মরুঅভিজ্ঞতা দেয় মানুষকে।

পৃথিবীর মরুভূমিগুলোকে জীবনের বেশ অনেকটা সময় দিয়েছে ইয়াসীন। প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সময়। তাই মরুভূমির ভাষা সে বুঝতে পারে অনায়াসে। হয়তো এত স্পষ্ট ভাবে আর কোনও ভূমির ভাষাই বুঝবে না সে।

বাতাস এখানে স্বকীয় সঙ্গীতে প্রবাহিত। স্থানান্তরে পাল্টে যায় তার সুর। পাহাড়ে একরকম, খোলা প্রান্তরে আর একরকম, আবার যোশুয়ার ঝোপে তা সম্পূর্ণ আলাদা।

ছোটবড় প্রাণীগুলো নিঃশব্দে চলে ফেরে। তবু অভ্যস্ত কানে পৌঁছে যায় তাদের পায়ের আওয়াজ।

টুপ করে পাহাড়ের গা থেকে খসে পড়ে ক্ষুদ্র পাথরের টুকরো। বাতাসে ক্ষয়ে, রোদে পুড়ে হিমে ভিজে আনমনে খসে পড়ে পাথর খণ্ড। ক্ষণিক জল তরঙ্গের মত সামান্য গড়িয়ে থেমে যায় সে শব্দ। অথচ মানুষের পায়ের চাপে পাথর খসে পড়ার শব্দটা অন্যরকম। কর্কশ এবং জোরালো। অভ্যস্ত কান ঠিকই আলাদা ভাবে চিনে নেয় শব্দদুটো।

পাহাড়েরও আছে নিজস্ব কথা। তবে বড্ড অস্পষ্ট আর প্রলম্বিত সে স্বর। শতাব্দীর ওপার থেকে হয়তো ভেসে আসে এক একটা ধস নামার মেঘল আওয়াজ। ভেসে আসে ফেটে যাবার, ক্ষয়ে যাবার কিংবা দ্বিখণ্ডিত হবার অনন্ত বিলম্বিত শব্দ।

সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো মরুভূমির এই বেঁচে থাকা। কখনও মৃত নয় মরুভূমি। যুগযুগান্তরের অসীম প্রতীক্ষায় শুধু শুয়ে থাকে সে। তার সাথে প্রতীক্ষার পাল্লা দিয়ে চলে অন্তর্গত সবকিছু।

বীজ এখানে ভূমিষ্ঠ হয়েই অঙ্কুরিত হয় না। আকাশের প্রতীক্ষায় থাকে। আকাশ প্রতীক্ষায় থাকে মেঘের। মেঘ থাকে ক্রমশ বর্ষণসম্ভবা হবার জলজ প্রতীক্ষায়। অবশেষে হয়তো দু'এক পশলা বৃষ্টি নামে কোনও এক বিষণ্ন বিকেলে।

তবু অঙ্কুরিত হয় না বীজ। আর একটা বর্ষণের অপেক্ষায় ঘুমিয়ে থাকে আরও কিছুকাল।

তারপর-অঙ্কুরিত হয়েই পত্রেপুষ্পে সুশোভিত বৃক্ষ হয়ে ওঠে না তা। পর্যাপ্ত সময় নেয়। কালোত্তীর্ণ প্রতীক্ষায় নিজস্ব নিয়ম গড়ে ওঠে তার। ধীরে ধীরে বেড়ে

উঠে পরিপূর্ণ বৃক্ষের রূপ নেয়।

কিছু ক্যাকটাস আছে দেখতে ফানেলের মত। এই আকৃতির ফলে অতিরিক্ত রোদ লাগে না তাতে। কাঁটাগুলো ফিল্টার হয়ে শুষে নেয় বাড়তি তাপ। অধিকাংশ ক্যাকটাসের পাতায় মোমের মত একটা হালকা আস্তরণ থাকে। ফলে বাষ্পীভূত হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না ভিতরের পানি। মরুভূমিতে মানিয়ে নেবার প্রয়োজনে প্রত্যেকেরই এমন ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হয়।

ইয়াসীনও তার ব্যতিক্রম নয়। মরুভূমিতে মানিয়ে নেবার জন্যে তাকেও বিশেষত্ব অর্জন করতে হয়েছে। নদীমাতৃক শ্যামল একটা দেশে জন্ম তার। অথচ দিনে দিনে মরুভূমির সাথে নিবিড় বন্ধনে জড়িয়ে গেছে সে। তাকে বুঝতে শিখেছে, ভালবাসতে শিখেছে। তার সাথে প্রতীক্ষায় একাত্ম হতে শিখেছে।

কয়েকটা পাথরের পাশে বসে আছে সে। একফালি চাঁদটার করুণ জ্যোৎস্নায় মিশে আছে পাথরের সাথে। কোন্‌টা পাথর আর কোন্‌টা তার শরীর কেউই চিনতে পারবে না। বসে বসে মরুরাত্রির একান্ত সংলাপ শুনছে সে। মাথার উপর অক্লান্ত ডানায় উড়ছে একটা নিশাচর বাদুড়। শিকার খুঁজছে নিঃশব্দে।

এরকম একটা রাতে অনেক ধরনের শব্দ ভেসে আসে। প্রতিটা শব্দ আলাদাভাবে চিনতে পারে ইয়াসীন। একসময় একটা অচেনা শব্দ শুনল সে। অস্পষ্ট শব্দটা মিলিয়ে গেল সাথে সাথে। বেশ কিছুক্ষণ পর আবার শোনা গেল। ওধরনের বিজাতীয় শব্দ মরুভূমির নিজস্ব হতে পারে না। সচল একটা আওয়াজ!

ঘোড়াটাও শুনতে পেয়েছে আওয়াজটা। কান দুটো খাড়া করে তাকিয়ে আছে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে। ওদিক থেকেই আসছে আওয়াজ।

ঘোড়াটার লাগাম ধরে সেদিকে রওনা হলো ইয়াসীন। ঘোড়ায় চড়েনি সে। কারণ আকাশের পটভূমিতে অনেক দূর থেকে দেখা যেত তাকে। শত্রুর সহজ টার্গেটে পরিণত হত তার দেহ।

রাইফেলটা আটকানো আছে ঘোড়ার জিনে। কিন্তু এখন ওটার প্রয়োজন হবে না। রাতের যুদ্ধ হয় শর্ট রেঞ্জে। সেজন্যে পিস্তলই বেশি উপযোগী। বাঁ হাত দিয়ে শার্টের দুটো বোতাম খুলে দিল ইয়াসীন। ডান হাতটা ভাঁজ হয়ে আছে সামান্য। নিমেষে কোমরের পিস্তল টেনে নিতে প্রস্তুত।

দেখেশুনে আলগা বালির উপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিচ্ছে সে ঘোড়াটাকে। শব্দ এড়িয়ে যাচ্ছে।

প্রায় দুশো পা এগিয়ে থামল ইয়াসীন। শোনা যাচ্ছে না শব্দটা...আরও কিছুদূর এগোল...থামল। আবার শোনা যাচ্ছে আওয়াজ। আগের চেয়ে অনেক জোরাল।

চিনে ফেলল সে শব্দটা। একটা ওয়্যাগন আসছে। হয়তো স্টেজটা! বেলিন্দা আছে স্টেজে...অথবা ছিল! চাকার আওয়াজটা পরিচিত কিনা শুনতে চেষ্টা করল ও।

ওয়্যাগনের চাকার আওয়াজ একাধিক শর্তের উপর নির্ভরশীল। চাকার বেড় কত, বিয়ারিং-এ তেল দেয়া কিনা, কতখানি ভার টানছে সেটা, কিংবা কত দ্রুত ঘুরছে চাকা—এসবই ভাবতে হয়। এইমাত্র ঘর্ষণের মত একটা শব্দ এল। সম্ভবত শক্ত হাতে ব্রেক চেপেছে ড্রাইভার। অর্থাৎ কোনও ঢাল বেয়ে নামছে ওটা।

কিছুক্ষণের মধ্যে চাকার সাথে যোগ হলো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। এদিকেই আসছে ওয়্যাগনটা। এমন সময় একটা ঢাল বেয়ে উঠে আসতে দেখা গেল ঘোড়াগুলোকে।

অবস্থাটা বিপজ্জনক। স্টেজকে অনুসরণরত কোনও ইন্ডিয়ানের চোখে পড়ে যেতে পারে সে। কিংবা কোনও আরোহী আচমকা দেখে ফেলতে পারে তাকে। যে কোনও ক্ষেত্রে গুলিবিদ্ধ হবার সম্ভাবনা সমূহ। ঘোড়াটার নাকে বাম হাতের তালু ঠেকিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল ইয়াসীন।

ঢাল বেয়ে উঠে এসেছে স্টেজ। ড্রাইভারের পাশে বসে আছে রাইফেলধারী একজন। ইয়াসীনকে ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে গেল স্টেজটা। সামনে একটা চড়াই। ব্রেক চাপল ড্রাইভার। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে চায় হয়তো।

ঘোড়ার নাক থেকে হাত সরিয়ে নিল ও। সামান্য শিস্ বাজাল। সাথে সাথে চিঁহি ডাকল ঘোড়াটা।

ঝট্ করে তার দিকে ঘুরল রাইফেলধারী। 'কে ওখানে?' ওপাশ হতে জানতে চাইল ড্রাইভার।

'ফৌজী টহল।' পরিষ্কার উচ্চারণে জবাব দিল ইয়াসীন।

'আস্তে আস্তে এখানে আসো তা হলে। হাত যেন খালি থাকে।'

'সীন নাকি!' বেলিন্দার গলা শোনা গেল!

ঘোড়াটাকে নিয়ে এগোল ও। 'মনে হচ্ছে পথ হারিয়ে ফেলেছ তোমরা। কী ঘটেছিল?' হালকা গলায় জিজ্ঞাসা করল।

ড্রাইভার টনি রস, আগে থেকেই পরিচিত। পাশের লোকটা অপরিচিত।

'ইন্ডিয়ান,' বলল রস। 'আমাদের আক্রমণ করতে আসছিল। ওদের ধোঁকা দিতে রাস্তা ছেড়ে একটা পাহাড়ের আড়ালে চলে যাই আমরা। উদ্দেশ্য ছিল, ওদের এড়িয়ে আবার রাস্তায় উঠব। অথচ উল্টো ধোঁকায় পড়ে গেছি এখন।'

'ঘাবড়াও মাত!' অভয় দিল ইয়াসীন। 'সামনেই কোথাও আছে টহলদলের বাকি অংশ। ওল্ড ড্যাড রেঞ্জ এর কোল ঘেঁষে সোজা এগিয়ে যাও। পুবে বেরিয়ে

যাবার জন্য হয়তো কোনও গিরিপথ পেয়ে যাবে।'

'কিন্তু কতদূর যেতে হবে আর? ঘোড়াগুলোর বিশ্রাম দরকার। তা ছাড়া পুবে গেলে ভেগাস ট্রেইল হতে আরও সরে যাব তো?'

'এমনিতেই ভেগাস ট্রেইল থেকে অনেক সরে এসেছ তোমরা। ওই পথে ফিরে গেলে আবার ইন্ডিয়ানদের খপ্পরে পড়তে পারো। হয়তো এখনও ওরা আসছে ধাওয়া করে। সামনের কথা ভাবা উচিত তোমাদের। যেখানে পানি আর বিশ্রামের অবকাশ মিলবে।'

'এ পথটা চিনি না আমি।' জানাল রস।

'এটা কোনও পথ নয়। তবে এগিয়ে গেলে সম্ভবত মার্ল স্প্রিং-এর রুট পাওয়া যাবে। আমাকে অনুসরণ করো। সামনে কী আছে না আছে দেখছি, আমি।'

ঘোড়ায় চড়ে স্টেজটাকে ছাড়িয়ে দ্রুত সামনে এগোল ইয়াসীন। মাইলদুয়েক গিয়েও পুবে বেরিয়ে যাবার জন্য কোনও গিরিপথ দেখা গেল না। একটানা শুধু পাহাড়ের সারি। দেয়ালের মত খাড়া উঠে গেছে দুই থেকে তিন হাজার ফুট উঁচুতে। কোনও আকস্মিক ভূ-আন্দোলনে তৈরি হতে পারে এমন পাহাড়।

কোনও ট্র্যাক নেই কোথাও। এক জায়গায় পাহাড়ী দেয়াল সামান্য ভাঁজ খেয়ে গেছে। তার ওপাশে আবার একটানা এগিয়েছে সামনে। ফলে দেয়ালের গায়ে তৈরি হয়েছে থার্ড ব্র্যাকেটের মত একটা জায়গা। সেখানে ঘোড়া থামাল ইয়াসীন। রাতে আগুন জ্বালানোর জন্য আদর্শ স্থান হবে ব্র্যাকেটটা।

তাকে অনুসরণ করে এসে পড়ল স্টেজ। অভিজ্ঞ ড্রাইভার রস। এমন নতুন পথেও চমৎকার গতিতে এসেছে।

হয়তো পিছনে ইন্ডিয়ানরাও আসছে দ্রুত। আসবেই। আজ রাতে না হোক কাল ভোরে ওয়্যাগনের ট্র্যাক খুঁজে বের করবে তারা। তারপর একটানা ম্যারাথন দৌড়ে পৌঁছে যাবে। হয়তো আরও সামনে সুবিধামত জায়গায় ওত পেতে থাকবে।

স্টেজ হতে সবার আগে নামল লী ফাউলার। এগিয়ে এল ইয়াসীনের কাছে। 'তুমিই তা হলে? ভাল: পুরোনো হিসাবটা মিটিয়ে নেয়া যাবে,' বলল সে।

'খবরদার, এখানে কোনও গোলমাল করা চলবে না।' পিছন থেকে হুঁশিয়ারি দিল রস। 'এমনিতেই যথেষ্ট বিপদের মধ্যে আছি আমরা।'

ব্র্যাকেটটার ভিতরের দিকে আগুন জ্বালাল ইয়াসীন। 'একটু গরম হয়ে নেয়া যাক। কফি আছে?' জিজ্ঞাসা করল।

রসের পাশে বসা সেই রাইফেলধারী নিয়ে এল খাবারের ঝুড়ি। কফির আয়োজন করতে যাচ্ছিল। মার্থাখালা সরিয়ে দিলেন তাকে। 'একদিনে অনেক

করেছ, বাছা। ওটা আমাকে করতে দাও।'

বেলিন্দা এগিয়ে এল। আগুনে হাত সেঁকছে।

হাতে একখানা বিস্কুট নিয়ে ইয়াসীনের পাশে এসে বসল রস। 'ঠিক কোথায় আছি আমরা—একটু বুঝিয়ে দেবে?' কণ্ঠে অনুরোধ।

কাঠির আঁচড়ে ধুলোর মানচিত্র আঁকল ইয়াসীন। একটা রেখার উপর আঙুল রাখল। 'এটা ওল্ড ড্যাড রেঞ্জ। এর ওপাশে এখানে মার্ল স্প্রিং। কয়েকজন সৈন্যের একটা ফাঁড়ি। ওখানে পৌঁছাতে পারলে পানি পাব আমরা। কিছু খাবারও পাওয়া যেতে পারে। এতক্ষণে টহলদের অন্যেরা হয়তো আমাকে বা তোমাদের খুঁজতে পৌঁছে গেছে সেখানে।'

'মার্ল স্প্রিং-এর কথা শুনেছি আমি।' চিন্তিত ভাবে বলল রস। 'তবে যাইনি কখনও। তোমার কি মনে হয়, ইন্ডিয়ানদের এড়িয়ে পৌঁছাতে পারব ওখানে?'

'জানি না। তবে চেষ্টা করতে হবে।'

'তুমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কী করে?'

'ইন্ডিয়ানরা ঘিরে ফেলেছিল আমাকে।'

'ওরা তোমাদের সাথেও লড়েছে তা হলে?'

'লড়াই ঠিক নয়। টহলে বেরিয়ে ডজনখানেক বা তারও বেশি ইন্ডিয়ানের ট্র্যাক দেখতে পাই আমরা। স্টেজটা আক্রান্ত হতে পারে ভেবে নিজেদের পথ ছেড়ে তোমাদের রুটে এগোতে থাকি। এমন সময় আমাকে বাগে পেয়ে ঘিরে ফেলে ওরা।' সংক্ষেপে ঘটনাটা জানাল ইয়াসীন।

'ডজন খানেক বা তারও বেশি? সে তো অনেক ইন্ডিয়ান!' রসের গলায় স্পষ্ট উদ্বেগ।

ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছে ইয়াসীন। ঘোড়াটার কাছে গেল সে। জিন তুলে নিয়ে গ্যালেটা ঘাস ডলে দিল ওটার পিঠে। পাথুরে দেয়ালের ধাতব খুঁটা পুঁতে ঘোড়াটা বাঁধল। তৃষ্ণায় শুকিয়ে আছে গলা। ভোরের আগে পানি খাবে না—সিদ্ধান্ত নিল সে। কফির গন্ধ আসছে। আগুনের দিকে এগোল পায়ে পায়ে।

'ধন্যবাদ, খালা। চমৎকার হয়েছে।' দুই হাতে ধরা কফির মগে চুমুক দিয়ে বলল ইয়াসীন।

বেলিন্দা পাশে এসে বসল। 'কবে নাগাদ ছাড়পত্রটা আশা করছ, সীন?'

'যে কোনও দিন।'

'তারপর?'

কিছুক্ষণ ভাবল ও। 'বলতে পারব না ঠিক,' আনমনে বলল। 'যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই জানি না আমি।'

'কথাটা ঠিক হলো না, সীন! অনেক কিছুই ভাল জানা আছে তোমার,' বলল বেলিন্দা। 'ভাল নেতৃত্ব দিতে জানো। দীর্ঘদিন সেনাবাহিনীতে আছ তাই আইনও জানো ভাল। ভবিষ্যতে অনেক কিছু করতে পারো তুমি ইচ্ছে করলেই।' তার হাতে বিলি কাটছে বেলিন্দার অন্তরঙ্গ আঙুল।

কথাগুলোয় কেমন যেন একটা প্রেরণা আছে। ভাল লাগল ইয়াসীনের। কল্পনায় একটা ভবিষ্যৎ গড়তে যাচ্ছিল। রসের সতর্ক বাণীতে ধসে পড়ল তা।

'সার্জেন্ট, কেউ আসছে এদিকে!'

বারো

নিমেষে হুঁশিয়ার আর প্রস্তুত হয়ে গেল সবাই। কেউ নেই আগুনের পাশে। থমথম করছে রাত। আকাশে নিঃশব্দ তারার জোনাকি। তিনদিক থেকে পাহাড় উঁকি দিয়ে দেখছে নির্জন আগুনটাকে। অকস্মাৎ দম আটকানো নীরবতা নেমেছে সর্বত্র।

অন্ধকারে একটা পাথরের পাশে বসে আছে ইয়াসীন। তার কাছে গুটিগুটি এগিয়ে এল রস। 'শব্দটা অস্পষ্ট। তবে শুনেছি আমি তাতে সন্দেহ নেই,' বলল সে। 'ওই দিক থেকে এল মনে হয়।' আঙুল তুলে কিছুদূরের ঝোপগুলো দেখাল।

মরুভূমিতে আনাড়ী নয় রস। কোনও সন্দেহজনক শব্দ সে শুনেছে—এ নিয়ে বাজি ধরা যায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দূরের ঝোপগুলোর দিকে তাকাল ইয়াসীন। 'দেখে আসছি আমি ওদিকটা। তুমি নজর রেখো ফাউলার আর পার্টনারের দিকে।'

একটু ঘুরে ঝোপগুলোর মধ্যে এল ও। ক্যাকটাসের ঝোপ সব। কোনটারই উচ্চতা কোমরের বেশি নয়। কোনও শব্দ নেই। কেউ নেই ঝোপের আড়ালে।

পিছনের ক্যাম্পফায়ারটা লক্ষ করল ও। এখান থেকে পঞ্চাশ ফুট মাত্র দূরত্ব অথচ একটা লাল আভা ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। লুকিয়ে আগুন জ্বালানোর জন্য জায়গাটা সত্যি চমৎকার। সহজে খুঁজে বের করতে পারবে না কেউ।

অথচ একটা শব্দ শুনেছে রস!

ঝোপগুলো পেরিয়ে ওপাশের খোলা মরুভূমিতে হেঁটে গেল ও। কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। একখণ্ড পাথরের পাশে অনড় বসে রইল উৎকর্ণ হয়ে।

হয়তো খোলা মরুভূমি নয়, পাহাড়ের ওদিক থেকে এসেছে শব্দটা। কোনও পাহাড়ী ছাগল বা হরিণ চলতে গিয়ে ঝরিয়ে দিয়েছে আলগা পাথর। ইন্ডিয়ানরাও আসতে পারে ওই দুর্গম পথে। কিছুই অসাধ্য নয় ওদের।

অনেকক্ষণ পর শব্দটা পেল ইয়াসীন। মরুভূমির দিক থেকেই আসছে। খুব ক্ষীণ একটা আওয়াজ। আর শোনা যাচ্ছে না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল ও। পাছে নিঃশ্বাসের শব্দে বিফল হয় তার অপেক্ষা!

আবারও ভেসে এল আওয়াজ। মরুভূমির বালিতে ঘষে যাচ্ছে কিছু।

মানুষের অস্পষ্ট গোঙানি!

উঠে, দ্রুত সেদিকে গেল ইয়াসীন।

একজন মানুষ পড়ে আছে বালিতে। মরা জ্যোৎস্নায় দেখা যায় না ভাল। আশেপাশে নেই কেউ। একজন আহত ইন্ডিয়ান নয় তো! আরও একটু এগোল সে। এবং চিনতে পারল। মোকাটো!

দৌড়ে তার কাছে গেল ইয়াসীন। দ্রুত কাঁধে তুলে নিল নিস্পন্দ দেহটা। ফিরে এল আগুনের পাশে।

'পানি!' উদ্বেগ আকুল কণ্ঠে মার্থা খালাকে বলল ও। 'পানি প্রথমে।' মোকাটোর নিঃসাড় দেহটা শুইয়ে দিল আগুনের পাশে।

কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই দেহে। কিছুটা আশ্বস্ত হলো ও। তবে আঁতকে উঠল জুতো জোড়ার চেহারা দেখে। ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে!

'আহাম্মক বটে। নইলে অমন জুতো নিয়ে মরুভূমিতে বেরোয় কেউ?' আহাম্মকের মত মন্তব্য করল ফাউলার।

'ঘণ্টাকয়েক আগেও নতুন ছিল জুতোজোড়া।' বিরক্তিভরে বলল ইয়াসীন। 'জমাটবাঁধা লাভার জমিতে হাঁটলে ওই অবস্থা হয় জুতোর।'

লাভা পেরিয়ে কতদূর এসেছে মোকাটো!

মার্থা খালা আঙুল পানিতে ভিজিয়ে মোকাটোর ঠোঁট মুছে দিলেন। সামান্য হাঁ হলো তার মুখ। ফোঁটায় ফোঁটায় পানি মুখে ঢেলে দিলেন মার্থা খালা।

কিছুক্ষণ পর জুলজুল করে তাকাল ইন্ডিয়ান। আরও পানির জন্য মাথা তুলল। নিজের কোলের উপর মাথাটা তুলে তাকে আরও তিন ঢোক পানি খাওয়াল খালা।

এতক্ষণে ঘোর কেটে যাচ্ছে মোকাটোর। শক্তি ফিরছে দেহে। ব্রেন সচল হচ্ছে আবার। কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া ভঙ্গিতে উঠল সে। চারদিক দেখল ভয়ে ভয়ে।

'মোকাটো!' কোমল স্বরে ডাকল ইয়াসীন। তাকে চিনতে পেরে আশ্বস্ত হলো ইন্ডিয়ান। চোখে চমকে গেল খুশির ঝিলিক। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল।

'আমি জানতাম তুমি বেঁচে আছ।' ওকে লক্ষ করে এই প্রথম কথা বলল ইন্ডিয়ান। হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।

সে হাত ধরে মোকাটোকে তুলে বসাল ইয়াসীন। গরম কফির মগ নিয়ে এলেন মার্থা খালা।

'লেফটেন্যান্ট সাইমন কোথায়?' জিজ্ঞাসা করল ইয়াসীন।

'নেই।' গরম কফিতে চুমুক দিয়ে বলল মোকাটো।

'মারা গেছে?'

'জানি না। সম্ভবত মরেনি।' মার্থা খালা এবং অন্যান্য সবার দিকে তাকাল মোকাটো। তুমি এগিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরই আক্রান্ত হই আমরা। পজিশন নিয়ে পাল্টা গুলি চালাই। বেশ কিছুক্ষণ পর পজিশন ছেড়ে সামান্য মাথা তুলতেই মারা পড়ে আমাদের একজন। দু'দুটো তীর এসে বিঁধেছিল তার গলায়।

'উত্তর দিক থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পাই আমরা...সম্ভবত তুমি।'

'আমাকে ঘিরে ফেলেছিল একদল ইন্ডিয়ান,' বলল ইয়াসীন।

তোমার জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল আমার। তুমি ফিরে আসছ না দেখে বিকেলের দিকে তোমাকে খুঁজে দেখার জন্যে অফিসারের কাছে অনুমতি চাই আমি। কিন্তু আমাকে ঝুঁকি নিতে নিষেধ করে সে। বলে–তুমি হয়তো মারা পড়েছ। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষার পর আবার অনুমতি চাই আমি এবং তার জবাবের আগেই পজিশন ছেড়ে উঠে চলে যাই উত্তরে। ওদিকেই তো গিয়েছিলে তুমি।' কফির মগে চুমুক দিল মোকাটো।

অবাক হয়ে ভাবছে ইয়াসীন। রেড ইন্ডিয়ান এই সৈনিক সত্যিই ভালবাসে তাকে! অতীতেও অনেকবার খেয়াল করে দেখেছে সে।

তবে অফিসারের আদেশ অমান্য করা উচিত হয়নি তার। বলতে যাচ্ছিল কথাটা। থেমে গেল মোকাটোর কথার তোড়ে।

'তোমার শেল্টার ঠিকই খুঁজে পাই আমি। কিন্তু তোমাকে পেলাম না। এক জায়গায় বালি লাল হয়ে আছে রক্তে। অথচ কোনও মৃতদেহ নেই। অগত্যা অফিসারের কাছে ফিরে যাই আমি। গিয়ে দেখি কেউ নেই!

'চারপাশে অনেক খুঁজেছি তাদের। কিন্তু পাইনি। অন্ধকারে খুঁজতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত স্টেজটার ট্র্যাক দেখতে পাই আমি। এবং ইন্ডিয়ানদের পায়ের ছাপ। তাই লাভার জমিতে নেমে যাই। ওর ভিতরে সহজে নামে না কেউ। তবে লুকিয়ে এগোনোর জন্য যথেষ্ট আড়াল পাওয়া যায়।

'দুটো লাভাস্রোতের মাঝখানের ঢালে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে মোযেভদের মত পায়ে হেঁটে এগোই। কারণ স্টেজটার কাছাকাছি হবার জন্যে দুটো উঁচু লাভার দেয়াল টপকাতে হয় আমাকে। একটা বিস্তীর্ণ লাভার জমি পায়ে হেঁটে পার হতে হয়।

'রাত হয়ে গেলেও দু'বার ইন্ডিয়ানদের দেখতে পাই আমি। একবার বারোজন আর একবার আটজনের একটা দল। ওদের অতিক্রম করে স্টেজের কাছে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। তাই শর্টকাট খুঁজতে থাকি। একটা ছোট্ট পাহাড়ের পশ্চিম ঢাল ধরে স্টেজের ট্র্যাকটা ঘুরে গেছে দেখে পাহাড়টার পুব ঢাল দিয়ে সরাসরি এগোই আমি। তারপর লাভার ভিতরে পথ হারিয়ে ফেলি।'

'ইন্ডিয়ানদের কী হলো?' প্রশ্ন করল রস।

'ঠিক জানি না। তবে তারা আছে।'

'মার্ল স্প্রিং-এ যাচ্ছি আমরা,' মোকাটোকে বলল ইয়াসীন।

'তা হলে দেরি কেন, এক্ষুণি রওনা হওয়া যায় না?'

'না, মোকাটো। ঘোড়াগুলো হাঁপিয়ে গেছে। ভোররাত পর্যন্ত বিশ্রাম দিতে হবে ওদের,' বলল ইয়াসীন।

আগুনটা আর উসকে দেওয়া হলো না। যে যার মত কম্বল বিছিয়ে শোবার আয়োজন করতে লাগল। রাতের প্রথম প্রহরে পাহারায় থাকবে ফাউলার। তারপর রসের সঙ্গী, টমাসের দায়িত্ব। মোকাটো এল ইয়াসীনের সাথে ঘুমাতে।

আকাশের তারা দেখছে ইয়াসীন। 'অফিসারের কথা শোনা উচিত ছিল তোমার,' পাশে শোয়া মোকাটোকে বলল ও।

'অফিসার? মানে ইউরোপিয়ান? যারা জোর করে কেড়ে নিয়েছে আমার মাটি আর এই আকাশ?' ঘৃণাভরে বলল মোকাটো। 'ফৌজী চাকুরিটা তো দায় ঠেকে করছি। তাও ছেড়ে দিতাম এতদিনে। শুধু তোমার জন্য রয়ে গেছি। তুমি চলে গেলে আমিও চলে যাব, ইয়াসীন।'

'আমাকে খুব ভালবাস বুঝি?'

'তুমিও যে আর এক হতভাগা ইন্ডিয়ান!'

মৃদু হাসল ইয়াসীন। 'তোমাতে আমাতে কী দুস্তর ব্যবধান, তা যদি জানতে!'

'খুব আর ব্যবধান কোথায়? আমি রেড ইন্ডিয়ান তুমি গ্রীন ইন্ডিয়ান। দুজনেই হারিয়েছি দেশ। দুজনেরই বুকের মাঝে দুঃখটা এক!'

কী অবাক মিল! এভাবে কখনও ভেবে দেখেনি ইয়াসীন। দেশের কথা মনে পড়ল। স্বপ্নে সেখানে ফিরে গেল ও।

টমাস ডেকে তুলল তাকে। 'উঠে পড়ো, সার্জ। সময় বয়ে যাচ্ছে।'

ঝটপট উঠে পড়ল ইয়াসীন। দ্রুত হাতে ঘোড়ায় জিন আঁটল। নিভে যাওয়া কয়লার উপরে তখনও গরম কফির কেতলি। বরফের মত ঠাণ্ডা হাত দিয়ে কফি ঢালল মগে। 'সবাইকে ডাকো।' টমাসকে নির্দেশ দিল।

এধরনের খোলা ক্যাম্পে অভ্যস্ত বেলিন্দা আর মার্থা খালা। মেয়েলী

মন্থরতায় অহেতুক সময় নষ্ট করল না ওরা। মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেল সবাই। অন্ধকারে যাত্রা শুরু হলো।

ঘোড়ায় চড়ে আগে আগে যাচ্ছে ইয়াসীন। মাইল ছয়েক এগোনোর পর একটা গিরিপথ পাওয়া গেল। ঘোড়া থামাল সে। মাটিতে নেমে ঝুঁকে ট্র্যাক দেখতে চেষ্টা করল। দেখা যায় না কিছু। গিরিপথ ধরে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল ও। ম্যাচ জ্বালাল। একাধিক চাকার দাগ ধুলোয়। ওয়াগন চলাচল করে এপথে। তা হলে এপথ দিয়েই পুবে বেরিয়ে যাওয়া যাবে। ফিরে গিয়ে স্টেজের অপেক্ষা করতে লাগল সে।

ওকে অনুসরণ করে অন্ধকার গিরিপথে প্রবেশ করল স্টেজ। দুপাশে পাহাড়ের সারি। বামদিকের পাহাড়গুলো খাড়া উঠে গেছে কয়েকশো ফুট। ডানের পাহাড়শ্রেণী অত খাড়া নয়।

বেশ আগে এগিয়ে চলেছে ইয়াসীন। চাকার আওয়াজ ছাড়া অন্য কোনও সন্দেহজনক আওয়াজ শোনার উদ্দেশে। কিন্তু কোথাও তেমন কোনও শব্দ নেই।

সামনে খাড়া দেয়ালের মত পথ আগলে আছে উঁচু পাহাড়। এখান হতে রাস্তা প্রায় নব্বই ডিগ্রী কোণে মোড় নিয়েছে ডানে। তারপর সোজা দক্ষিণ-পুবে গিয়ে মিশেছে খোলা মরুভূমিতে।

মোড়ের উপর স্টেজটার জন্য দাঁড়িয়ে রইল ইয়াসীন। দক্ষ হাতে রস চালিয়ে আনছে সেটা।

'একটু বিশ্রাম?' রসকে জিজ্ঞাসা করল ও।

'মন্দ হয় না!' উত্তর এল।

দাঁড়াল স্টেজ। ঘোড়াগুলো পাথুরে রাস্তায় পা ঠুকে ঠুকে দম নিতে লাগল। মার্ল স্প্রিং-এর দূরত্ব অনুমান করার চেষ্টা করছে ইয়াসীন। এখনও হয়তো কয়েক ঘণ্টার পথ।

ভোরের আলো ফুটছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের চিহ্ন দেখতে পাবে ইন্ডিয়ানরা। তারপর?

এ পর্যন্ত প্রায় আটমাইল পথ এসেছে ওরা। ওদের অনুসরণ করে আটমাইল দৌড়ে আসতে ইন্ডিয়ানরা সময় নেবে পৌনে একঘণ্টা। চলন্ত স্টেজটা ধরতে সময় নেবে আরও ঘণ্টাখানেক। আর যদি সমকোণী গিরিপথ ধরে না এসে পাহাড় ডিঙিয়ে অতিভুজ বরাবর সোজা পুবে এগোয়, তা হলে অনেক কম সময়ে স্টেজের নাগাল পাবে ওরা। পাহাড়গুলো অতিক্রম করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু প্রয়োজনে নরকও অতিক্রম করতে পারে মোযেভরা।

'মার্ল স্প্রিং আর কতদূর?' প্রশ্ন করল রস।

এখান থেকে দূরত্বটা সঠিক জানে না ইয়াসীন। 'হবে সতেরো আঠারো মাইল,' অনুমানে বলল সে।

'অর্থাৎ, হামলা হবেই। ঠিক আছে, লড়ব আমরা।' চাবুক হাঁকাল রস। আবার চলতে শুরু করল স্টেজ।

স্টেজের প্রায় চারশো গজ আগে চলেছে ইয়াসীন। দুদিকের পাহাড়গুলো সতর্কতার সাথে লক্ষ করে এগোচ্ছে সে। ক্রমশ উঁচুতে উঠছে পথ। সামনে গিরিপথ বেশ প্রশস্ত। তারপর আবার খুব সংকীর্ণ হয়ে ওপাশের মরুভূমিতে মিশেছে।

প্রশস্ত জায়গায় এসে শেষ হয়ে গেল চড়াই। গিরিপথ এখানে প্রায় তিনশো গজ চওড়া। মাঝ বরাবর এসে ঘোড়া থামাল ও। তাকাল দুপাশের পাহাড়সারির দিকে। চলন্ত টার্গেট মাত্র কয়েকগজ দূর থেকেই মিস হয়। সে তুলনায় দেড়শো গজ অনেক দূর। ওই পাহাড় থেকে স্থির টার্গেটও মিস করতে পারে ইন্ডিয়ানরা। ঘোড়া থেকে নেমে বিশ্রাম নিতে বসল ইয়াসীন।

রোদ পড়েছে গিরিপথে। শীতল ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে সকাল। পিছনে অশ্বক্ষুরের প্রতিধ্বনি, স্টেজের সচল শব্দ। সামনে ক্রমশ-সংকীর্ণ গিরিপথ।

বাঁ দিকের উঁচু পাহাড়টা বেশি চেপে এসেছে। চিরুনির দাঁতের মত দেখতে তার চূড়া, ঝুলে আছে পথের উপর। আরও সামনের পাহাড়গুলো পথের উপর এত নুয়ে পড়েছে যে পথটা প্রায়-অন্ধকার সুড়ঙ্গের আকার ধারণ করেছে। দূরে–ওপাশের খোলামুখে একঝলক রৌদ্রকরোজ্জ্বল মরুভূমি।

মার্ল স্প্রিং-এর ট্র্যাক ওপাশের খোলামুখে পৌঁছে চট করে বাঁয়ে মোড় নিয়েছে। তারপর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলে গেছে উত্তরে।

ইন্ডিয়ানরা যদি শর্টকাটে আগেই এসে থাকে, তবে দুজায়গায় পজিশন নিতে পারে। বাঁ দিকের ওই চিরুনি চূড়ায়, কিংবা ওপাশের খোলামুখে, পথ যেখানে বাঁয়ে মোড় নিয়েছে। সুড়ঙ্গের মত সংকীর্ণ পথটুকু অ্যামবুশের জন্যে সবচেয়ে উপযোগী। তবে পর্যাপ্ত আলো আর কভারের অভাবে ওখানে হামলা করার ঝুঁকি ওরা নেবে না।

স্টেজ এসে থামল ইয়াসীনের পাশে। রস আর টমাস নামছে। পিছনের দরজা দিয়ে মোকাটো নেমে এল। চোখের ইশারায় মাইলখানেক দূরের চিরুনির মত চূড়াটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওখানে?'

পিছনে ফেলে আসা পথের দিকে টমাসের শঙ্কিত দৃষ্টি। 'আমাদের ধাওয়া করেও আসতে পারে,' বলল সে।

'কিংবা সামনে এগিয়ে খোলামুখের ওখানে পজিশন নিতে পারে,' যোগ করল ইয়াসীন।

'এই অল্প সময়ে পাহাড় ডিঙিয়ে অত সামনে ওরা পৌঁছায়নি হয়তো,' সন্দেহ প্রকাশ করল রস।

'তোমার "হয়তো" শব্দটা মোযেভরা বোঝে না,' বলল মোকাটো।

'ট্র্যাকটা কি এই গিরিপথের মোহনায় বাঁয়ে মোড় নিয়েছে?' ইয়াসীনকে জিজ্ঞাসা করল রস।

'হ্যাঁ। এবং ওখানে মোড় নিয়েই ওদের বুলেটের তোড়ে ভেসে যেতে পারি আমরা।'

'তা হলে?'

'সেরকম সম্ভাবনা দেখা দিলে,' চিন্তিত স্বরে বলল ইয়াসীন, 'বাঁয়ে মোড় নেব না আমরা। সোজা বেরিয়ে যাব খোলা মরুভূমিতে। পরে বাঁয়ে ঘুরে, আরও উত্তরে কোথাও মার্ল স্প্রিং-এর ট্র্যাকে উঠব।'

ঘোড়ায় চড়ল ইয়াসীন। স্টেজের জানালার কাছে এগিয়ে গেল। বেলিন্দা বসে আছে ভিতরে। 'ভয় করছে?' জিজ্ঞাসা করল তাকে।

তার চোখে চেয়ে পরম নিশ্চিন্তে স্মিত হাসল বেলিন্দা। জবাব দিল না।

ওপাশে বসে আছে সেই কালো চোখ আর কালো চুলো লোকটা। তার পাশে ফাউলার। 'ইন্ডিয়ান?' জানতে চাইল সে।

'ওখানে বসে দেখা যাবে না,' বলল ইয়াসীন। 'মাইলখানেক সামনে থাকতে পারে। সেই পিস্তলটার ব্যবহার জানা থাকলে বের কোরো তখন।'

পিস্তলটা বের করল ফাউলার। 'ঠিক আছে দেখে নিও, জানি কিনা,' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল।

রওনা হলো স্টেজ। এবারে সেটার সামান্য আগে চলল ইয়াসীন। ঘোড়ার জিনে আটকানো রাইফেল টেনে দেখল, ঠিকমত বেরিয়ে আসে কি না। কোমরে ঝোলানো কোল্টের বাঁটটা সামান্য বের করে রাখল খাপের বাইরে।

কাছে এগিয়ে আসছে চিরুনির মত চূড়াটা।

তেরো

গিরিপথটার দিক ঘেঁষে এগোচ্ছে ওরা। ঘোড়াদুটোকে হাঁটিয়ে নিচ্ছে রস।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা লম্বা দৌড় শুরু হবে।

কপালের ঘাম মুছল ইয়াসীন। তার ঘোড়াটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে বিপদের আশঙ্কায়। কীভাবে যেন আগেই বিপদ বুঝতে পারে অবোলা প্রাণীগুলো। ওটার কানের কাছে ফিসফিস করে কথা বলল সে। 'ভয় নেই, সাগরেদ। আমি জানি, তুমি পারবে।'

কাছে চলে এসেছে বাঁদিকের চিরুনি-চূড়া। ওটা পার হলে সংকীর্ণ পথের শুরু। সম্ভবত ওই চূড়ায় লুকিয়ে আছে ওরা। এখনও গুলি শুরু করেনি। হয়তো আরও কাছ থেকে শত্রুকে ঘায়েল করতে চায়। নাকি নেই ওখানে?

উরুর কাছে ট্রাউজারে ঘেমে যাওয়া হাতের তালু মুছল ইয়াসীন। হ্যাটটা আর একটু টেনে দেওয়ার জন্য মাথা উঁচু করেছিল। সরাসরি ইন্ডিয়ানটার চোখে চোখ পড়ল তার। উপর থেকে সোজা তাকিয়ে আছে।

গোড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পেটে আঘাত করল ও। 'বাঁ ঘেঁষে দৌড়াও,' পিছনে ফিরে বলল রসকে। কথা শেষ হবার আগেই পাথরে লেগে বিঙঙ্ শব্দে ঘুরে গেল প্রথম বুলেট। ছুটতে শুরু করেছে ঘোড়াগুলো। মুহুর্মুহু গুলির বিকট ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে চমকে উঠল নির্জন গিরিপথ।

বাঁ ঘেঁষে দৌড়াচ্ছে ঘোড়াগুলো। এতে ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল পেতে অসুবিধা হবে উপরের ইন্ডিয়ানদের। তবু ফায়ার করে চলল তারা। ইয়াসীনের ডানদিকে পথের ধুলো লাফিয়ে উঠল গুলিতে। সামনে চলকে উঠল পাথরের টুকরো। একটা ঘোড়া তারস্বরে চিঁহি ডাকল। চকিতে পিছনে তাকাল ও। না, ভয় পেয়েছে কেবল।

সংকীর্ণ সুড়ঙ্গের মত পথে ঢোকার মুখে ব্যাপারটা টের পেল ইয়াসীন। আতঙ্কের শিহরণ নেমে গেল তার মেরুদণ্ড বেয়ে। আরও বেশি ফায়ার আসা উচিত ছিল ওদের কাছ থেকে। আসেনি, কারণ বড় দলটা এখনও সামনে ওত পেতে আছে। গিরিপথের মোহনায়!

একটা দমকা বাতাসের মত খোলা মরুভূমিতে বেরিয়ে গেল ঘোড়াগুলো। গুলি এবং ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ পেয়ে প্রস্তুত ছিল ইন্ডিয়ানরা। ওদের ধারণা ছিল বেরিয়েই ট্র্যাক ধরে বাঁয়ে মোড় নেবে স্টেজ। সেই অনুযায়ী আক্রমণ সাজিয়েছে ওরা। অথচ দ্রুতগতিতে খোলা মরুভূমিতে বেরিয়ে গেল স্টেজ। হতাশ হয়ে ওটাকে নাগালের বাইরে চলে যেতে দেখল মোযেভদের দল। দুজন রাইফেল তুলে আন্দাজে ফায়ার করল। বড্ড চতুর স্টেজের সাথের ওই ঘোড়সওয়ারটা!

প্রাণপণ ছুটছে ঘোড়াগুলো। ছোটবড় বোল্ডার নিমেষে ডাইনে-বাঁয়ে কাটিয়ে ছুটে চলেছে স্টেজ। ভিতরে আসন আঁকড়ে ধরে ঝাঁকি সামলাচ্ছে আরোহীরা।

হঠাৎ চারদিক আলোকিত হয়ে উঠেছে দেখে পিস্তল হাতে জানালায় মুখ বাড়াল ফাউলার। সামনে খাঁ-খাঁ মরুভূমি। কোথাও ইন্ডিয়ান নেই!

মাইলখানেক এসে ঘোড়া থামাল ইয়াসীন। ধাওয়া করে কেউ আসছে না। পিছনে পাহাড়টার কাছেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। পাথর আর পাথরের মত শক্ত ইন্ডিয়ানদের বাদামী দেহ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

স্টেজটা পাশে এসে থামল। 'তোমার প্ল্যান চমৎকার কাজ দিয়েছে। আর একটু হলে ওদের ফাঁদে আটকাতাম আমরা,' বলল রস।

'আবার ফাঁদ পাতবে ওরা,' বলল ইয়াসীন। 'এতক্ষণে হয়তো রওনা হয়েছে মার্ল স্প্রিং-এর দিকে।'

চারপাশে বিক্ষিপ্ত বোল্ডার আর ক্যাকটাসের ঝোপ। হাতের ডাইনে অর্থাৎ দক্ষিণে কেলসো পাহাড়। বাঁয়ে ঘুরল ওরা। সামনে কোথাও মার্ল স্প্রিং-এর ট্র্যাকে উঠবে।

স্টেজের কয়েকগজ সামনে মন্থরগতিতে চলেছে ইয়াসীন। মোযেভদের কথা ভাবছে সে। আপন হাতের তালুর মত এই মরুভূমিকে চেনে ওরা। জন্মাবধি দেখছে। শৈশবে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলেছে এখানে, বড় হয়ে নেমেছে জীবনমরণের ভয়ঙ্কর খেলায়। জিতবার জন্যে।

'আমরা মার্ল স্প্রিং যাচ্ছি এটা এখন ওদের কাছে পরিষ্কার,' মাথা ঘুরিয়ে রসকে বলল ইয়াসীন।

'যদি ফৌজী ছোকরাদের আগেই কান ধরে বের করে দিয়ে থাকে ওরা?' প্রশ্ন করল রসের পাশে বসা টমাস।

'তা হলে,' নির্বিকার ভাবে বলল সে, 'ওদেরও কান ধরে বের করে দেব আমরা।'

তেষ্টা পেয়েছে। সূর্য মাথার উপর প্রায়। সামনে সামান্য চড়াই। মরুভূমির চেহারা পাল্টে যাচ্ছে দ্রুত। বিক্ষিপ্ত লাভার টুকরো সবদিকে। আর যোশুয়ার মলিন ঝোপ। আরও এগিয়ে কয়েক সারি সিন্ডার কোণ। এলাকাটা আগ্নেয়গিরি সমৃদ্ধ। এককালে জীবন্ত ছিল এগুলো। বড়বড় জ্বালামুখ দিয়ে সবেগে উৎক্ষিপ্ত হত তখন লাভা। ছোট্ট গর্তগুলো দিয়ে উপচে উঠত তরল লাভা। সিন্ডার কোণগুলোর সৃষ্টি হয় সেই উপচানো লাভা জমাট বেঁধে। আকৃতিতে এক একটা বিশাল চুলোর মত ওগুলো।

বন্ধুর পাথুরে জমির উপর দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে চলেছে স্টেজ। চলতি পথে পাশ কাটাচ্ছে ছোটবড় লাভার বোল্ডার আর সিন্ডার কোণ। একসময় সামনে দেখা গেল মার্ল স্প্রিং-এর রুট। সমতল পথে উঠে এল ওরা।

কয়েক মাইল পর আর একটা গিরিপথ। মার্ল পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে গেছে। এখানে ইন্ডিয়ানদের আগেই আসা গেছে হিসাব মত। তবু সংকীর্ণ পথটা পেরোতে ভয় আর শঙ্কায় বারবার চমকে উঠল ওরা। অবশেষে ওপাশে পৌঁছে মোড় নিল ডাইনে। সামনে মার্ল স্প্রিং।

বছরখানেক আগে তৈরি করা হয় মার্ল স্প্রিং-এর সৈনিক ফাঁড়ি। চতুর্দশ পদাতিক বাহিনীর লেফটেন্যান্ট ফস্টার তখন ছিল ক্যাম্পকেডির কমান্ডে। পুবের সিডার ক্যানিয়ন থেকে সিডার গাছ কাটিয়ে আনায় সে। সারিসারি গাছের কাণ্ড পুঁতে বেড়া বানায় সৈন্যরা। চারপাশে চারটে পাথুরে কেবিন ওঠায়। মাঝখানে তৈরি করে ঘোড়ার খোঁয়াড়।

কেবিনগুলো দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে বারো ফুট আর উচ্চতায় আট ফুট। চাল ছাওয়া হয়েছে সিডারের ডালপাতা দিয়ে। পানির উৎস পিছনের পাহাড় থেকে নেমে আসা সরু একটা ঝরণা। বেড়াঘেরা ফাঁড়ির ভিতরে এসে ছোট্ট একটা বালির গামলায় তলিয়ে গেছে সেটা।

গেটের ভিতরে একফালি নীল ইউনিফর্ম দেখতে পেল ইয়াসীন। একজন সৈনিক বাইরে এল গেট খুলে। সার্জেন্ট ম্যাকহার্ডি!

'আরে, এ যে দেখছি নবাব ইয়াসীন বেগ! এসো, এসো। তা কী এনেছ সাথে?' পিছনে এগিয়ে আসা স্টেজটার দিকে ইশারা করল ম্যাকহার্ডি। 'পেয়াদা? কিন্তু খাজনার উপায় কী? আমাদের ধানপান যে ফুরোবার পথে! আর ক'টা দিন সবুর করেও রসুনের ওয়্যাগন আসছে না। চলো, ভিতরে চলো।'

বেশ নাটুকে কায়দায় কথা বলে ম্যাকহার্ডি। অনেকদিন ছিল ভারতে। সেখানেই ইয়াসীনের সাথে প্রথম পরিচয়।

স্টেজটা ভিতরে ঢুকলে বন্ধ হলো গেট। রস নামল ড্রাইভারের আসন থেকে। অন্যরাও নামছে।

'ভেগাস স্প্রিং যাচ্ছিল ওটা। ইন্ডিয়ানরা তাড়িয়ে এনেছে এদিকে,' ম্যাকহার্ডিকে বলল ও।

'আমাদেরও জ্বালিয়ে মারছে ব্যাটারা,' জানাল ম্যাকহার্ডি। 'একটা ঘোড়া চুরি করে নিয়ে গেছে কয়েকদিন আগে। আর একটা ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছে একজন সৈনিক। সে-ও হয়তো পড়েছে ওদের খপ্পরে।' স্টেজ থেকে মেয়েদের নামতে দেখে ওদিকে এগোল সে।

টমাস এল ইয়াসীনের কাছে। কৃতজ্ঞতা জানাল, 'ধন্যবাদ। তোমার জন্যে বেঁচে গেলাম এ যাত্রা।'

বেলিন্দা আর মিসেস ম্যাকডোনাল্ডকে সাদর সম্ভাষণ জানাল ম্যাকহার্ডি।

'এখানে খুব কষ্ট পাবেন আপানারা। তবে যত্নে ত্রুটি থাকবে না আমাদের।'

'ধন্যবাদ, সার্জেন্ট,' উত্তর দিল বেলিন্দা। 'খুব বেশি যত্ন প্রয়োজন হবে না আমাদের। এখানে আপনি যেটুকু করবেন–বাইরের মরুভুমিতে একটা খোলা ক্যাম্পের তুলনায় তা ঢের ভাল হবে।'

বেলিন্দাকে একনজর দেখল ম্যাকহার্ডি। 'মনে হচ্ছে পশ্চিমে অভ্যস্ত আপনারা। ভাল। পুবের ভদ্রমহিলারা খুব বেশি আরামপ্রিয় হয়। ওদেরে কেউ কালেভদ্রে এখানে এলে খুব বিব্রত বোধ করি আমরা।'

'ঘোড়াগুলোর জন্য পানি দরকার, সার্জেন্ট।' জানাল রস।

'ওখানে।' আঙুল তুলে দেখাল ম্যাকহার্ডি। 'গামলাটায় খুব ধীরে পানি জমে। তবে একঢোক খেতে পারবে সবাই। কাল ভোরে হয়তো আরও এক ঢোক।'

ফাঁড়িটা খুঁটিয়ে দেখছে ইয়াসীন। যথেষ্ট মজবুত আর উঁচু বেড়া। তবে পিছনের ওই পাহাড়টা একটু বেশি কাছে। কোনও স্নাইপার সুযোগ নিতে পারে ওখান থেকে।

'কতজন আছ তোমরা?' ম্যাকহার্ডিকে প্রশ্ন করল ও।

'থাকার কথা আটজনের। তবে আছি মাত্র চারজন। তার মধ্যে একজন সৈনিক রানার। সরকারী ডাক নিয়ে যাচ্ছিল ফোর্ট মোযেভে। পথে ইন্ডিয়ানদের দেখে এগোয়নি আর।'

'ভালই করেছে। একটা মেইল ব্যাগের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি।'

'কিন্তু তোমার ব্যাপার কী? মেজর সাইককে নিয়ে যা শুনলাম, সত্যি নাকি?'

'কী শুনেছ জানি না। তবে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে আমার। ছাড়পত্র পেলেই চলে যাব।'

'আর এক মরুভূমিতে?' ম্যাকহার্ডির কণ্ঠে কৌতুক না বিদ্রূপ বোঝা গেল না। বেলিন্দাকে আসতে দেখে চলে গেল ম্যাকহার্ডি।

হিসাব করছে ইয়াসীন। চারজন সৈন্য, দুজন মহিলা, রস, টমাস, সঙ্গী সহ ফাউলার, মোকাটো...সে নিজে। মোট বারোজন। সাথে পর্যাপ্ত পানি ও বুলেট। চান্স নেবে না ইন্ডিয়ানরা। তবে খাবার ফুরিয়ে গেছে, তাই অপেক্ষায় থাকবে।

'আমরা কি কাল ভোরে রওনা হব?' তাকে শুধালো বেলিন্দা।

'না।'

'আক্রমণের আশঙ্কা করছ?'

'না। তবে কাছেই অপেক্ষায় থাকবে ওরা।'

'কিন্তু এভাবে আর কতদিন অপেক্ষা করবে ওরা?'

বেলিন্দা অধৈর্য হয়ে উঠছে দেখে হাসল ইয়াসীন। 'যতদিন ওদের

জীবন–যতদূর এই মরুভূমির সীমানা। হয়তো যারা আমাদের তাড়া করেছিল, তারা ফিরে গেছে। পরিবর্তে অন্য একটা দল এসেছে। প্রয়োজনে আরও একটা দল আসবে! গায়ের জোরে আমরা মালিকানা দাবি করলেও এ দেশটা আসলে তো ওদের বেলিন্দা। ওরাই মুক্ত, আমরা অবরুদ্ধ এখানে।' মেয়েটাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে সে।

বলে চলল, 'এ বছর অনেক বেশি ইন্ডিয়ান দেখছি আমি মরুভূমিতে। শুধু খুনের নেশায় ওরা খুঁজে ফিরছে না আমাদের। ওদেরও আছে পরিকল্পিত জীবনযাত্রা। আছে আবাদ, শিকার কিংবা পশুপালনের নিজস্ব নিয়ম। হয়তো পর্যাপ্ত ফসল ঘরে তুলতে পারেনি ওরা এ বছর। হয়তো ঠিক সময়ে আসেনি পলিসমৃদ্ধ কলোরাডোর প্লাবন!

'মায়ের শুকনো স্তনের ফাঁকি বুঝতে পেরে কাঁদছে ওদের অভুক্ত শিশু। চোখে মৃত্যুর কুয়াশা নিয়ে রাতের শীতে কাঁপছে বুড়ো মা-বাবা। সহ্য করতে না পেরে সশস্ত্র যুবকেরা তোলপাড় করে ফিরছে মরুভূমি।

'যদি স্টেজটা লুট করতে পারে, বাঁচার জন্যে প্রচুর ঘোড়ার মাংস আর শীতবস্ত্র পাওয়া যাবে। যে সবচেয়ে বেশি নিয়ে যেতে পারবে সে পাবে বীরের সম্মান। গোত্রের সবচেয়ে সুন্দরী রমণীটি অমাতৃষ্ণায় ভরা নদী হয়ে ধরা দেবে তার কাছে!

'বেলিন্দা!' স্বপ্নীল চোখে চোখ রেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ইয়াসীন। ইন্ডিয়ান মানেই কিছু বর্বর খুনী নয়। ওরা একটা সম্পূর্ণ সমাজ। বিজাতীয় সংস্কৃতির চাবুকে জর্জরিত এক উপদ্রুত জনপদ। অপেক্ষায় অপেক্ষায় টিকে আছে এখনও।

'নিজেদের কথাই ভেবে দেখো। সার ফ্রান্সিস ড্রেক যখন সোনা বোঝাই একটা স্প্যানিশ জাহাজ দখল করে আনল, এলিজাবেথীয় ইংল্যান্ড বীরের মর্যাদা দিল তাকে। যেন রসদ বোঝাই একটা ওয়্যাগন কিংবা একটা স্টেজ লুট করে ফিরেছে কোনও মোযেভ যোদ্ধা!'

'তোমাকে অনেক সময় আমি বুঝি না, ইয়াসীন।' বিপন্ন কণ্ঠে বলল বেলিন্দা। বুঝি না শত্রুর প্রতি তোমার এই দরদ। অথচ গুলি ফসকায় না তোমার।'

'এসব দরদের কথা নয়। উপলব্ধির কথা। একজন প্রকৃত যোদ্ধাই উপলব্ধি করতে পারে আর একজন যোদ্ধার জীবন।'

'তুমি কি মনে করো যুদ্ধই জীবনের শেষ সমাধান?'

হাল ছেড়ে দিল ও। ব্যাপারগুলো আসলেই বুঝছে না বেলিন্দা। বুঝবে না! এটা ওর বোঝার বয়স নয়, স্বপ্ন দেখার বয়স!

আনমনে পুবে তাকায় ইয়াসীন। দিগন্তে কুয়াশাময় পর্বতের হাতছানি। মাঝখানে বিস্তীর্ণ উপত্যকা। এখানে বেলিন্দা নামের সেই মেয়ে!

'কীসে যে জীবনের সমাধান,' বেলিন্দার প্রতিধ্বনি তুলে বলে ও, 'কেউ জানে না। তবে এটুকু বলা যায় সুখ আর শান্তি আচ্ছন্ন করে মানুষকে। যুদ্ধ এবং টিকে থাকার অন্যান্য প্রতিযোগিতা করে বিকশিত। যে কোনও ইতিহাস বইয়ের যে কোনও অধ্যায়ে যুদ্ধের কাহিনি পাবে তুমি, বীর যোদ্ধাদের অমর গাথা পাবে। মানব সভ্যতাটাই তাই। যুদ্ধের বীজ হতে অঙ্কুরিত এক বিশাল মহীরুহ!'

চোদ্দ

ফাঁড়ির দক্ষিণে পাহাড়ঘেরা একটুকরো ঘেসো জমি আছে। সেখানে ঘোড়াগুলোকে চরিয়ে আনতে হবে। ওয়্যাগনের সাপ্লাই আসেনি। পশুখাদ্যের মজুদ কমে গেছে। বিপজ্জনক হলেও, ঘোড়াগুলোকে মাঠে নিয়ে যেতে হবে খাওয়াতে।

গেটের কাছে একা দাঁড়িয়ে ছিল ইয়াসীন।

'কী ভাবছ?' পাশে এসে দাঁড়াল ম্যাকহার্ডি।

লেফটেন্যান্ট সাইমনের কথা জানাল তাকে ইয়াসীন। ফাউলার আর তার নীরব সঙ্গী পাওয়ার সম্পর্কে বলল। 'সোনার নদীটার কথা শুনেছ নাকি তুমি?' প্রশ্ন করল ও

'কে না শুনেছে?' বলল ম্যাকহার্ডি। 'তোমার চেয়েও পুরোনো আমি এখানে। এতদিনে অনেক কিছু শুনেছি। সোনার নদী, লোহার কপাটওয়ালা গুপ্তধনের গুহা, হারানো হীরার খনি, দক্ষিণের মরুভূমিতে আটকে পড়া জাহাজ...আরও কত কী! সে সব খুঁজতে এসে প্রতিবছর প্রচুর লোক প্রাণ হারায় এ অঞ্চলে। অথচ কোনও দিন শুনলাম না কেউ কিছু খুঁজে পেয়েছে।'

'ফাউলার হয়তো পেয়ে যেতে পারে কিছু।'

'লোকটাকে চিনি আমি। নেভাডার ওদিকে ফোর্ট চার্চিলে দেখেছি কয়েকবার। ভার্জিনিয়া সিটিতে নামকরা এক বন্দুকবাজ মারা পড়েছে ওর হাতে। বিতর্কিত ছিল গান ডুয়েলটা। কিন্তু তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেনি কেউ। খারাপ লোকজনের সাথে ওঠা বসা আছে ওর।'

উপত্যকার ওপাশের পর্বতশ্রেণী দেখছে ইয়াসীন। বারবার চোখ চলে যায় ওদিকে। পড়ন্ত বিকেলে লুকোচুরি খেলছে ওটার শিখরে শিখরে। ওখানে চলে যাব আমি–মনে ইচ্ছে জাগল ওর।

কিন্তু তাতে কি জীবনের সব সমস্যা মিটবে? ইচ্ছে হলেই কি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাওয়া যায়? স্বেচ্ছায় কি অস্বীকার করা যায় বেলিন্দার চোখের ওই স্বপ্ন!

মেয়েটাকে শেষ পর্যন্ত হয়তো এড়িয়ে যেতে পারবে না ও। বেঁধে রাখতেও কি পারবে? সে সামর্থ্য কি আছে ওর? এটা তো ভারতবর্ষ নয়। এখানে নামগোত্রহীন একজন সাধারণ সৈনিক সে। রণক্লান্ত একজন মানুষ যার অধিকাংশ সাধগুলোই সাধ্যহীন। বেলিন্দাকে দেবার মত কী আছে তার? সে-ও কি খুঁজতে বেরোবে সোনার নদীটা!

খুঁজে বের করা দরকার লেফটেন্যান্ট সাইমনকে। ক্যাম্পকেডিতে তার ফিরে যাবার সম্ভাবনা কম। হয়তো ইন্ডিয়ানদের আক্রমণে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে তার দল এই মরুভূমির কোথাও। নিশ্চিত মৃত্যুর প্রহর গুণে চলেছে তৃষ্ণার্ত মানুষগুলো।

কফির গন্ধ পেল ও। সাঁঝ নামছে। মেঘহীন আকাশে দু'একটা তারা। ম্যাকহার্ডি পাশে নেই। ওধারে বেড়ার কোলে আগুন জ্বালানো হয়েছে। কফি বানাচ্ছেন মার্থা খালা।

তাঁর কাছ থেকে ঝলসানো মাংস আর কফি নিল ও। এককোনায় অন্ধকারে রাখা স্টেজ কোচ। তার পাদানিতে গিয়ে বসল।

আগুনটা দেখতে দেখতে কফিতে চুমুক দিল ইয়াসীন। অন্ধকার রাতে আগুনের দিকে চেয়ে থাকতে চমৎকার লাগে। তবে চোখে ধাঁধা লেগে যায়। আলো থেকে আঁধারে তাকালে কিছুই দেখা যায় না তখন।

পাহাড়ের দিকে তাকাল ও। ওখানে আছে ইন্ডিয়ানরা। হয়তো ওরাও তাকিয়ে আছে এই আগুনটার দিকে!

ইন্ডিয়ানদের প্রতি কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশ বা ঘৃণা নেই ইয়াসীনের। তারা নিজেদের মত বাঁচে। হয়তো উন্নত নয় তাদের জীবনযাত্রা, তবে তা ভাবায় না ওকে। সে ধরনের ভাবনা সভ্য সমাজের সাজানো ড্রইংরুমেই মানায়। এখানে তার অবকাশ নেই। চোয়ালে ঘাম শুকানো লবণ আর খোঁচা খোঁচা দুশ্চিন্তার দাড়ি নিয়ে এখানে এখন শত্রুবেষ্টিত আঁধার রাতের বিপদ। পরের মুহূর্ত পর্যন্ত বাঁচব কি বাঁচব না—সেটাই এখানে ভাবনা।

বেড়ার ওপাশে সন্দেহজনক শব্দের অপেক্ষায় রাতের অনেকটা কাটল। শুতে যাচ্ছে সবাই। ম্যাকহার্ডি এসে দাঁড়াল। 'আমরা গত কদিন একনাগাড়ে পাহারা দিয়ে ভীষণ ক্লান্ত। তোমার লোক থাকুক পাহারায়,' বলল সে।

'ঠিক আছে, যাও।' তাকে ঘুমোতে পাঠাল ইয়াসীন। নিজেও উঠল। টমাসকে

ডেকে দাঁড় করাল পাহারায়। তারপর পাহারা দেবে পাওয়ার, ফাউলারের সেই সঙ্গী। সবশেষে ও নিজে পাহারায় থাকবে।

অন্যান্য দিনের মত ভাঙাভাঙা ঘুম হলো তার। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে হঠাৎ আশঙ্কায় জেগে ওঠা, আবার কিছু ঘুম। অনেকদিন ধরে যোদ্ধার জীবন কাটাচ্ছে ও। অনেকদিন ধরে ঘুমোচ্ছে এভাবে। একঘুমে রাত কাবার করা সেই শৈশবের দেশ অনেকদিন হলো ছেড়ে এসেছে।

রাতের শেষ প্রহরের পাহারায় ওকে সঙ্গ দিতে এল মোকাটো। দেখা না গেলেও আশেপাশে ইন্ডিয়ানরা আছে ইয়াসীনের সাথে এ ব্যাপারে সে একমত।

সূর্য উঠলে রাইফেল আর পিস্তল পরিষ্কার করতে বসল ইয়াসীন। ঘণ্টাখানেক পর বেলিন্দা এল কফি নিয়ে। 'কালরাতে ভাল ঘুমিয়েছি,' মন্তব্য করল।

'প্রয়োজন না হলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবে না কেউ।'

'প্রয়োজন হতে আর কতদিন দেরি?'

'কার প্রয়োজন, আমার?'

আবার স্বপ্ন ফিরে আসছে মেয়েটার চোখে। এবার সোনার নদীর কথা শুধায় ও। 'ফাউলার বলছিল, এদিকে কোথাও একটা সোনার নদী আছে। তুমি নাকি তার সন্ধান জানো?'

'কাকে বলছিল?'

'এখানকার এক সৈনিককে। লুইস নাম।'

'হুঁ, লুইসকে চিনি আমি। ক্যাম্পকেডিতে ছিল অনেকদিন।'

বেলা বাড়ছে। ফাউলার বেড়ার ধারে ঘুরছে অস্থির ভাবে। টমাস আর রস কাজে ব্যস্ত। বালির গামলাটায় পানি জমতে সময় লাগে। তাই এক এক করে ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াচ্ছে ওরা।

মার্থা খালা সকালে বের হননি। বেলিন্দার সাথে তাঁর কাছে গেল ইয়াসীন। কিছুক্ষণ পর ম্যাকহার্ডি এসে ঢুকল কেবিনে! শুরু হলো আড্ডা।

ঘুম আসছে ইয়াসীনের। এক পাশে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়ল সে। ওদিকে ম্যাকহার্ডি গপ্পো ছাড়ছে। আইরিশরা খুব আড্ডাবাজ হয়। বিশেষ করে সে আড্ডায় যদি ম্যাকহার্ডির মত বলিয়ে আর বেলিন্দার মত শ্রোতা আইরিশ থাকে।

ভিনদেশের গল্প বলছে ম্যাকহার্ডি।

'সেখানে ছিলাম আমি। ওর সাথে পরিচয় হয় দিল্লীতে। তার অনেক আগে থেকে ওদের দেশটা চেনা আমার। বাংলায়, একটা বিদ্রোহ দমনে যেতে হয়েছিল আমাদের সেনাদলকে।

'ওদের অঞ্চলটার নাম চিটাগাং। সেখানকার নবাব ছিলেন ওর বাবা। যদি

দেশে থাকত তবে ইয়াসীনও এতদিনে নামের আগে যোগ করতে পারত খেতাবটা। কিন্তু নামসর্বস্ব খেতাবের মোহ ধরে রাখতে পারেনি ওকে।

'চিটাগাং-এর মত সুন্দর জায়গা জীবনে খুব কম দেখেছি আমি। পাহাড় যে অত সবুজ হতে পারে জানতাম না আমি। ঠিক তার পরেই সাগরের শুরু। দিগন্তের আকাশ অবধি বিছিয়ে আছে জলের সেই নীল কার্পেট! বোঝাই ওয়্যাগনের বহরের মত তার উপর দিয়ে অবিরল গড়িয়ে আসে সজল শীতল হাওয়া! প্রাণ জুড়িয়ে যায়। ওখানকার মানুষ হয়ে ও যে কীভাবে এই নরকে পড়ে আছে–ভেবে পাই না।

'দিল্লীতে একই ব্যাটালিয়নে ছিলাম আমরা। সবেমাত্র ঘর পালিয়ে সেনাবাহিনীতে এসে জুটেছে ছোঁড়া। মাঝে মাঝে পেগ্‌লে যায়! বাড়ির জন্য মন কেমন করে–ফিরে যেতে চায়। একদিন কোয়ার্টারে ধরে এনে আয়ারল্যান্ডের গল্প শুনিয়ে দিলাম। আমরা আইরিশরাও যে দায় ঠেকে ইংলিশদের চাকর খাটছি বুঝিয়ে দিলাম। ব্যস, রয়ে গেল ও।

'ততদিনে জেনারেলের সুনজরে পড়েছে। হীরা চিনতে ভুল করে না পাকা জহুরি। ইংল্যান্ডের রয়্যাল মিলিটারি একাডেমিতে কোর্স করার সুযোগ করে দিলেন ওকে জেনারেল মিল্টন। ওদিকে কোস-এ যাবার কয়েকদিন আগে হঠাৎ আমাদের ক্যান্টনমেন্টে এসে হাজির হলেন ওর বাবা। নবাব ইব্রাহিম বেগ! এক্কায় জোড়া ইয়া বড় আরবী ঘোড়াটার মত দুলকি চাল তাঁর। পরনে ঘোড়াটার চেয়েও সাদা ইন্ডিয়ান ড্রেস। হাতে স্যান্ডাল উডের স্টিক! অনেক সাধাসাধি করেও ছেলেকে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে পারলেন না তিনি। ছোঁড়া বরাবরই একটু গোঁয়ার টাইপের। বাপের মুখের উপর বলে দিল–বৃটিশ শাসিত দেশের ওই খেতাবী নবাবীতে ফিরবে না সে। তা ছাড়া অজানাকে জানার নেশা তখন ওকে ভালমত পেয়ে বসেছে।

'শেষে চোখ মুছতে মুছতে ফিরতে হলো সেই বাঘা লোককে। আর ওই বোম্বেটেটা কিনা বোম্বেতে গিয়ে জাহাজে চাপল!'

'বোম্বেটে মানে? কৌতূহলী প্রশ্ন মার্থা খালার।

'মানে ওই ইয়ে আর কী। পণ্ডিতদের ভারতে আদর করে বোম্বেটে বলে।' মুখ ফস্‌কে বেরোনো অপবাদটা ঢাকতে গিয়ে অবলীলায় তার অপব্যাখ্যা দিল ম্যাকহার্ডি।

নিজস্ব ঘুমরীতিতে হঠাৎ জেগে উঠে ম্যাকহার্ডির উদ্ভট ব্যাখ্যাটা শুনল ইয়াসীন। গপ্পো বটে! আবার ঘুম এল তার।

'পণ্ডিত মানে তো শিক্ষক, তাই না?' এ শব্দটা ধরতে পেরে আনন্দে হাসল বেলিন্দা। 'ছেলেবেলায় বাবার সাথে ইন্ডিয়া বেড়াতে গিয়েছিলাম আমি।'

'ওটা প্রচলিত অর্থ,' বলল ম্যাকহার্ডি। 'আসলে পণ্ডিত মানে জ্ঞানী। নিজেদের ইতিহাস আর ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রচুর জানে ও। আর জানে যুদ্ধবিদ্যা। অন্য আর্মিতে অফিসার ছিল ও।'

'অন্য আর্মি?' গপ্পে জমে যাওয়া বেলিন্দার প্রশ্ন।

মার্থা খালা উঠে বাইরে গেলেন।

'মানেটা আমি আজও জানি না, মিস ব্রাউন। ও ইংল্যান্ড চলে যাবার বেশ পরের ঘটনা সেটা। সুলায়মানী পাহাড়ে বিদ্রোহীদের সাথে লড়ছিলাম আমরা। দোস্ত মোহম্মদের বাহিনীর বিরুদ্ধে। বুলেটের চেয়ে ব্লেড বেশি প্রিয় ছিল তাদের। একদিন রাতে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে আমাদের ছাউনিতে হামলা করল ওরা।

'ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠতেই দেখি মশালের আলোয় ঝিকিয়ে ওঠা তলোয়ার। মৃত্যু অবধারিত জেনে চোখ বন্ধ করে ছিলাম। কিন্তু মরলাম না। চেয়ে দেখি তরবারি উঁচিয়ে থমকে আছে একজন লোক। তারপর ঘুরে চলে গেল অন্যদিকে।

'কিন্তু এক নজরেই চিনতে পেরেছিলাম ওকে। মাথায় পাগড়ি, বুকে অফিসারের ব্যাজ। দিল্লীর সেই ইয়াসীন বেগ!

'তার কিছুদিন পরে আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণে অনেকের সাথে মারা পড়ে দোস্ত মোহম্মদ। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তার বাহিনী। অনেকে বন্দী হয়। অথচ ইয়াসীনকে ধরা যায়নি।

'যুদ্ধ শেষে বৃটিশ সেনাবাহিনী ছেড়ে দিই আমি। আয়ারল্যান্ড ফিরে যাই। সেখানেও ইংলিশদের দৌরাত্ম্য। তাই এখানে চলে আসি, এবং আবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি।'

'এখানে এসে ইয়াসীনকে জিজ্ঞাসা করেননি কীভাবে আফগানিস্তান গেল ও? আমি তো সাংহাইতে দেখেছিলাম ওকে!' অবাক হয়ে বলল বেলিন্দা।

'করেছিলাম। কিন্তু উত্তর দেয়নি।'

আবার ঘুম ভেঙে গেল ইয়াসীনের। ও উঠে বসতেই চুপ মেরে গেল ম্যাকহার্ডি।

'কী ব্যাপার ম্যাকহার্ডি, থেমে গেলে যে? গপ্পের স্টক ফুরাল নাকি তোমার?'

'জানো, কার গল্প বলছিল সার্জেন্ট?' প্রশ্ন করল বেলিন্দা।

'কার?' সপ্রশ্ন ইয়াসীন।

'বোম্বেটে একজন লোকের।' হাসতে হাসতে বলল বেলিন্দা।

হেসে উঠল ম্যাকহার্ডি। হাসছে ইয়াসীন।

একই কথায় ভিন্ন কারণে হাসছে ওরা।

পনেরো

পড়ন্ত বিকেল।

ছটফট করছে ইয়াসীনের মনটা। বেড়ার কোল ঘেঁষে হেঁটে বেড়াচ্ছে ও অস্থির পায়ে। মন বলছে, ক্যাম্পকেডিতে ফিরে যায়নি লেফটেন্যান্ট সাইমন। এদিকেও আসেনি। তা হলে গেল কোথায়!

ম্যাকহার্ডি ফিরল ফাঁড়ির অন্য সৈন্যদের নিয়ে। সেই মাঠটাতে ঘোড়াগুলো চরাতে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। খুব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তবে ফিরেছে সবাই।

'তোমার লেফটেন্যান্টের কী হলো, ইয়াসীন?' ম্যাকহার্ডিরও সেই একই প্রশ্ন। 'কোথায় সে? কোথায় হারিয়েছে বারোজন জলজ্যান্ত সৈনিক?'

'এই মরুভূমিতে গোটা একটা আর্মি হারিয়ে যেতে পারে।' হতাশ ভঙ্গিতে মন্তব্য করল ফাউলার।

'ওর চূড়ায় উঠে চারদিক একটু দেখে আসতে পারি আমি।' দক্ষিণের পাহাড়টা দেখাল ম্যাকহার্ডি।

কথাটা ইয়াসীনও ভেবেছিল। কিন্তু বিপদের পরিমাপে বাতিল হয়ে গেছে সে ভাবনা। কাছাকাছি যে কোন জায়গা থেকে পাহাড়ের চূড়াটা দেখা যায়। শত্রুর সহজ টার্গেট।

'পাহাড়টার এত কাছে ফাঁড়ি বানানো ঠিক হয়নি,' মন্তব্য করল ইয়াসীন। 'ওরা ওখান থেকে সুযোগ নেয় না তোমাদের ওপর?'

'একবার নিয়েছিল। ইন্ডিয়ানটার খুলি উড়িয়ে দিই আমরা।' ম্যাকহার্ডির কণ্ঠে তৃপ্তি। 'তারপর আর কখনও চেষ্টা করেনি।'

'তোমারও চেষ্টা করা উচিত নয়। বিশেষ করে এই মুহূর্তে।'

কিন্তু কিছু একটা করা উচিত। কেবিন থেকে সরকারী ম্যাপটা নিয়ে এল ও। দেখা যাক এটা কোন আইডিয়া দিতে পারে কিনা।

একেবারে নিখুঁত নয় ম্যাপটা। তবে যথেষ্ট ভাল। ডট্ লাইন দিয়ে পুবের সরকারী রুট দেখানো হয়েছে। বিস্তীর্ণ উপত্যকাটা পার হয়ে সেটা সিডার ক্যানিয়নে থেমেছে। তারপর হারিয়ে গেছে মিড হিল-এ। তার ওপাশে গভর্নমেন্ট হোল ও রকস্প্রিং। পুবদিকটা ক্রমেই রূপান্তরিত হয়েছে পার্বত্য অঞ্চলে। ওদিকে, অনেক পুবে রয়েছে ফোর্ট পিউট। পকেটে জুলিয়ানের ম্যাপটার কথা মনে

পড়ল ইয়াসীনের।

মানসপটে সেই ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছে ও। একই অঞ্চলের ম্যাপ তবু এটার সাথে মেলে না সেটা।

উপত্যকা এবং ওপাশের মিডহিল সে ম্যাপেও আছে। তবে সিডার ক্যানিয়নের উল্লেখ নেই। মাইল দশেক উত্তরপুবের একটা বিচ্ছিন্ন গিরিশিখর দেখানো আছে তাতে। আছে আরও উত্তরের কিংস্টোন পাহাড়। গভর্নমেন্ট হোলের দক্ষিণে একটা চেপটা চুড়ো পাহাড় ও তার পিছনের ঝর্ণাগুলো চিহ্নিত করা আছে যত্নের সাথে। অথচ রকস্প্রিং-এর রুট দেখানো হয়নি ওটায়।

ম্যাপটায় চিহ্ন ছাড়া কোন কিছু লেখা দেখেনি ইয়াসীন। চিহ্নগুলো আঁকা হয়েছে একটু ডানদিকে কাত করে। একটা বিশেষ প্যাটার্নে কলম ঘোরানোর অভ্যাস থাকলে হয় অমন। সম্ভবত কোন স্প্যানিশ এঁকেছিল ম্যাপটা। খুব পুরোনো ম্যাপ। হয়তো অনেকদিন আগে—এ অঞ্চলে এসেছিল লোকটা।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কোন ম্যাপ। যা এঁকেছে কিছুটা দিকভ্রান্ত একজন মানুষ, আরও উত্তরে কোথাও বসে। তার সাথে আনুষঙ্গিক কিছু চিহ্ন হয়তো পরে সে কারও কাছে শুনে, আন্দাজে বসিয়েছে। হয়তো একটা নির্দিষ্ট স্থানের অবস্থান চিহ্নিত করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে গোটা একটা অঞ্চল আঁকতে হয়েছে তাকে অনিচ্ছায়।

'কী দেখছ?' কাঁধের উপর দিয়ে উটের মত গলা বাড়াল ফাউলার।

কল্পনা থেকে বাস্তবের সরকারী ম্যাপে ফিরে এল ইয়াসীন। 'ম্যাপ,' ছোট্ট করে বলল।

'আমাদের বোধহয় এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত,' বলল ফাউলার।

'কোথায়?'

'অন্য যে কোন জায়গায়। এখানে এভাবে গর্তে লুকিয়ে থাকলে জীবনটাই কেটে যাবে।'

'ঘোড়াগুলোকে আরও একটু জিরোতে না দিলে অন্য কোথাও যেতে পারব না আমরা,' বলল ও।

আসলে লেফটেন্যান্টের অপেক্ষায় দেরি করছে এখানে। তাকে জানতে হবে লেফটেন্যান্ট কোথায়। একটা সামরিক টহলদলের সদস্য সে। অফিসারসহ অন্যান্যদের কী হলো তা না জেনে, ফাউলারের মত অন্য কোথাও যেতে পারে না। অথচ খাবার ফুরিয়ে এসেছে ফাঁড়ির। এখানেও থাকা যায় না আর।

ওধারে বেড়ার কাছে বসে আছে ম্যাকহার্ডি আর রস। ম্যাপ গুটিয়ে সেদিকে গেল ইয়াসীন। 'সাইমনকে খুঁজতে বেরোব আমি,' সিদ্ধান্তটা ওদের জানাল।

'কোথায়, কোন্‌দিকে?' অবাক হলো রস।

'যেখানে হারিয়েছিলাম সেখানে ফিরে গিয়ে ওদের চিহ্ন খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।'

'এখান থেকে রেরিয়ে একমাইলও তোমাকে যেতে দেবে না ওরা, তা তুমি যতবড় নবাবপুত্তুরই হও না কেন,' ফোড়ন কাটল ম্যাকহার্ডি।

'কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। আজ রাতেই।'

তার চোখেমুখে সংকল্প ফুটে উঠতে দেখল ম্যাকহার্ডি। ঘাবড়ে গিয়ে উঠে গেল সে। ইয়াসীনও উঠে দাঁড়াল। আবার শুরু হলো তার অস্থির পদচারণা।

গেটের কাছে বেলিন্দা এসে যোগ দিল ওর সাথে। 'কী ভাবছ?'

'টহলদলের কথা। হয়তো কোন ওয়াটারহোলের একশো গজের মধ্যে তৃষ্ণায় মারা যাচ্ছে ওরা। এ অঞ্চলটা অচেনা ওদের।'

'তুমি নাকি খুঁজতে বেরোবে?'

'চেষ্টা করে দেখব। এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা অর্থহীন। চেষ্টা করে দেখতেই হবে আমাকে। নইলে শান্তি পাচ্ছি না।'

'তারপর?'

তার চোখে চোখ রাখল ইয়াসীন। চোখ নামাল বেলিন্দা।

'যদি না ফিরি?' মৃদু ভাবে হাসল ও। 'স্টেজের সাথে চলে যেও তোমরা। প্রয়োজন হলে ম্যাকহার্ডিকে নিও সাথে। খুব ভাল লোক।'

'ম্যাকহার্ডি তোমার দেশের গল্প বলছিল।'

'ও গল্প বলতে ভালবাসে।'

'ফিরে যাবে না?'

'সেও এক রণাঙ্গন। আর আমার ফেরার প্রতীক্ষায় সেখানে থেমে থাকবে না কিছু। স্বাধীনতার যুদ্ধ মানুষ না জিতে ছাড়ে না। ভাতরবাসী একদিন স্বাধীন হবে...এই ইন্ডিয়ানরাও হয়তো একদিন স্বীকৃত হবে এই মাটিতে। বিশ্বের আঙিনা থেকে আমেরিকার জন্যে ওরাও গৌরব বয়ে আনবে সেদিন...'

চুপ করে আছে বেলিন্দা। কথা বলতে ভাল লাগছে না তার। বুকের মধ্যে বিরহ বৃষ্টি। ওই অবাক লোকটা কাছে না থাকার ভয়! সন্ধ্যা নামছে। ভিতরে–বাইরে–সবখানে।

অস্পষ্ট আলোয় দূরে কি কিছু নড়ল! এক দৃষ্টিতে গেটের ফাঁক দিয়ে চেয়ে আছে ইয়াসীন। মোযেভরাও কি ধৈর্য হারিয়েছে? সাঁঝ নামতেই এগিয়ে আসছে হামলা করতে? নাকি অন্য কেউ!

'রস, ম্যাকহার্ডি–জলদি এদিকে এসো!' অনুচ্চ কণ্ঠে ওদের ডাকল [illegible]

হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। রাইফেল নিয়ে ওর কাছে ফিরে এল সবাই।

'ওখানে।' গেটের সামনে একটা চওড়া চত্বর। তার পশ্চিমে টিলার মত পাহাড়গুলোকে দেখাল ইয়াসীন। 'কাউকে দেখেছি আমি। আমাদের কেউ হতে পারে। তা হলে এখানে আসার চেষ্টা করবে লোকটা। আর ইন্ডিয়ানরা ওই চত্বরে দেখে ফেলবে তাকে।'

'অলরাইট!' বলল ম্যাকহার্ডি। 'কভার ফায়ার দেবার জন্য পজিশন নিচ্ছি আমরা।' বেড়ার ফোকরে রাইফেলের নল ঢুকিয়ে পজিশন নিল ওরা। সাবধানে গেটটা সামান্য খুলল ইয়াসীন। কয়েক মিনিট কেটে গেল ঘটনাহীন। তারপর দেখা গেল লোকটাকে। একটা পাহাড়ের ওপাশ থেকে বেরিয়ে সোজা ছুটে আসছে এদিকে।

চত্বরের মাঝামাঝি চলে এসেছে লোকটা। সাঁৎ করে একটা তীর গেঁথে গেল লোকটার পায়ের কাছে বালিতে। আর একটা কাঁধ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। আরও তীর আসছে ওদিকের পাহাড় থেকে। বেড়ার এপাশ থেকে কভার ফায়ার শুরু করল এরা। বন্ধ হয়ে গেল তীর।

প্রায় পৌঁছে গেছে লোকটা। এমন সময় দূরের পাহাড়ের কোথাও গর্জে উঠল একটা রাইফেল। চমৎকার হাতের সই ইন্ডিয়ানটার। পড়ে গেল। বালিতে নিঃসাড় পড়ে আছে লোকটার দেহ। এদিকে শব্দ লক্ষ্য করে শুরু হয়েছে পাল্টা ফায়ার।

বেঁচে থাকতে পারে ভেবেই গেট পেরিয়ে সেদিকে ছুটল ইয়াসীন। দেহটা কাঁধে তুলে সে-ও প্রায় ফিরে এসেছে। আবার গর্জে উঠল দূরের সেই রাইফেল। গেটের দরজা কাঁপিয়ে দিল বুলেটটা।

ভিতরে এনে দেহটা কাত করে শোয়াল ইয়াসীন। গ্যারিককে চিনতে পারল সে। টহলদলের একজন। পিঠের বামদিকে লেগেছে গুলি। বেঁচে আছে!

'তুমি...' ওকে দেখছে গ্যারিক। 'আমরা ভেবেছিলাম...তুমি মারা গেছ।' শ্বাস নিতে নিতে বলল সে।

'লেফটেন্যান্ট কোথায়?'

'ওখানে,' হাত তুলে দেখানোর চেষ্টা ব্যর্থ হলো তার। 'এখনও বেঁচে আছে। ওরা...ওরা অনেকদূর তাড়িয়ে নিয়ে গেছে... ঘোড়াগুলো নেই...টার্নার নেই...'

'কোথায় গ্যারিক, কোন্‌দিকে?' অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করল ইয়াসীন।

'উত্তরে...দশ মাইল...' হাঁপাতে হাঁপাতে বলার চেষ্টা করল সে। বেলিন্দা একটা পানির কাপ ধরল তার ঠোঁটে। সামান্য ঝুঁকে একঢোক কোনমতে খেল সে। 'একটা উঁচু...গম্বুজ...' খুব কষ্ট হচ্ছে তবু বলতে চেষ্টা করল নিস্তেজ হয়ে আসা গ্যারিক। 'তার ওপাশে...একটা চূড়া...তার ওপাশে পাহাড়...পানি...'

আবার পানির কাপটা তার ঠোঁটে ধরল বেলিন্দা। খাওয়ার আগেই মারা গেল গ্যারিক।

মৃতদেহটা ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বেড়ার কোলে। কাল ভোরে কবর দেয়া হবে। মোকাটো চেয়ে আছে ওর দিকে। 'জায়গাটা চেনো?' জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নাড়ল ইয়াসীন, চেনে না।

'আশপাশে অনেকগুলো ওয়াটারহোল আছে।'

'এবং সবগুলো পাহারা দিচ্ছে ইন্ডিয়ানরা।'

শ্রাগ করল মোকাটো। 'সম্ভবত।'

'চূড়া থেকে ওয়াটার হোলগুলোর দূরত্ব কত?'

তার দিকে চেয়েই আছে মোকাটো। 'আমি আসি তোমার সাথে?'

'অভিসারে যাচ্ছি নাকি আমি?' ধমকে উঠল ইয়াসীন। 'একা যাচ্ছি বলেই হয়তো ওদের চোখে ধুলো দেওয়া যাবে।'

হাল ছেড়ে দিয়ে হাসল মোকাটো। 'ওদের চোখে ধুলো দেওয়া? কোন ভাবেই তা সম্ভব নয়।'

বালিতে আঙুলের আঁচড় কেটে লোকেশনটা আঁকল মোকাটো। 'এই হলো ওয়াইল্ডক্যাট চূড়া। সোজা ওটার দিকে এগোবে চড়াই ভেঙে। উঠতে উঠতে প্রথমে গম্বুজের ছাদ, তার ওপাশে ওয়াইল্ডক্যাট। ওটা পার হলে উত্তরে আর একটা পাহাড়। গ্যারিকের কথা অনুযায়ী সেটার কোলেই আছে অফিসার।'

লোকেশনটা ভালমত বুঝে নিয়ে উঠল ইয়াসীন। 'ও, কে।' মোকাটোর দিকে তাকাল। 'ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেব আমি। ঘোড়াটা রেডি রেখো।'

তাকে কেবিনে ঢুকতে দেখল বেলিন্দা। মার্থা খালার দিকে চাইল সে। 'খালা, কি করতে যাচ্ছে ও জানো?'

'না!' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস ম্যাকডোনাল্ড। তোর খালুও ওরকম। মুখ বুজে কাজ করে, বিপদে-আপদে নিজেই কাঁধে তুলে নেয় সব দায়িত্ব।'

কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে ইয়াসীন। ঘুমিয়ে পড়ল।

ষোলো

গভীর রাতে ভাঙল ঘুম।

বাইরে ঝির ঝির হাওয়া আর ফকফকে জ্যোৎস্নার মাখামাখি। নিশ্চল দাঁড়িয়ে

আছে কালো ঘোড়াটা। যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

কাছে গেল ইয়াসীন। ডান হাতে ধরা কফির মগে চুমুক দিতে দিতে দেখছে সে ঘোড়াটাকে। বাঁ হাতে গানঅয়েলের মাজা ঝকঝকে রাইফেল।

ঘোড়ার জিনসংলগ্ন পকেটে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে দুটো পানির বোতল, একটা খাবারের প্যাকেট ও টুকিটাকি কিছু জিনিস। তার পিছনে ভাঁজ করা একটা কম্বল বাঁধা।

সন্ধ্যা থেকেই খোলা রাখা হয়েছে গেট। যাতে বেরোনোর সময় ওটা খুলতে গিয়ে অহেতুক আওয়াজ না হয়। দুইজন সৈন্য পাহারায় রয়েছে সেখানে।

মোকাটো কাছে এল নিঃশব্দে। 'চমৎকার হাওয়া,' বলল সে। 'সুবিধাই হবে তোমার। হালকা শব্দগুলো আলাদা ভাবে চিনতে পারবে না ওরা।'

ম্যাকহার্ডি এল। 'খুব শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে টহলদল। আরও কিছু খাবার নিতে পারতে তুমি,' মন্তব্য করল।

'তা ঠিক,' সায় দিল ইয়াসীন। 'তবে অহেতুক বোঝা বাড়াতে চাচ্ছি না আমি। ওদের খুঁজে পেলে ফিরে আসতে সময় লাগবে না। ততক্ষণে পানির উপর টিকে থাকতে পারবে ওরা। তুমি কিন্তু ফাউলার আর ওই চুপচাপ লোকটার দিকে নজর রেখো। ওরা ঝামেলা পাকাতে পারে।'

'সে দেখা যাবেখন। এখন নিজের কথা ভাবো তো তুমি?' তাড়া লাগাল ম্যাকহার্ডি। 'এক ইন্ডিয়ান নবাব অন্য ইন্ডিয়ানদের হাতে বেঘোরে মারা পড়ুক–তা কিন্তু আমরা চাই না।'

বেলিন্দা হাত রাখল তার বাহুতে। কখন যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে কিছু বলতে যাচ্ছিল ইয়াসীন। নাহ্ এখন নয়, ফিরে এসেই বলবে–ভাবল সে। ওর হাতে কফির মগটা ধরিয়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসল। ভোর হতে এখনও অনেক বাকি।

গেট পেরিয়ে বাইরে আসতেই হঠাৎ গলা শুকিয়ে গেল ইয়াসীনের। ঘাড়ের কাছটা শিরশির করছে। এই নির্জন রাতে এভাবে একা বেরোনো মোটেও নিরাপদ নয়। হয়তো ওকে দেখে ফেলেছে ইন্ডিয়ানরা। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যাবে ও। তবু এগিয়ে যেতেই হবে। সামনে কোথাও মৃত্যুর প্রহর গুণছে অসহায় কিছু মানুষ। তাই কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয় ফেরা। ভয় তাড়াবার জন্য ঘোড়ার গতি সামান্য বাড়িয়ে দিল ও।

টিলার সারিগুলো বাঁয়ে রেখে খোলা মরুভূমিতে বেরিয়ে এল ইয়াসীন। চারপাশে ছড়ানো ছিটানো পাথর আর ছোট ছোট ঝোপ। আকাশে আধখানা চাঁদ।

পিছনে তাকাল সে। কালো পাহাড়ের পটভূমিতে আর দেখা যায় না ফাঁড়িটা।

সম্ভবত ওকে দেখতে পায়নি ইন্ডিয়ানরা। সোজা গম্বুজের দিকে চলল ও।

ক্রমেই উঁচুতে উঠতে হচ্ছে তাকে। এভাবে চড়াই বেয়ে মাইল ছয়েক ওঠার পর পৌঁছানো যাবে গম্বুজের মাথায়। প্রায় বারোশো ফুট উঁচু গম্বুজ। ওটা পার হলে পাওয়া যাবে ওয়াইল্ডক্যাট পাহাড়। তার ওপাশে আরও উত্তরে রয়েছে আর একটা পাহাড়। গ্যারিকের বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে রয়েছে লেফটেন্যান্ট সাইমনের টহলদল। ইন্ডিয়ানরা অনেক দূর তাড়া করে নিয়ে গেছে ওদের!

সরাসরি গম্বুজের মাথায় না উঠে সামান্য ঘুরে উঠছে ইয়াসীন। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মত। এর ফলে কষ্ট কম হবে ঘোড়াটার। এবং আকাশের বিপরীতে ফুটে উঠবে না তার সচল ছায়া। দূর থেকে সহজে তাকে দেখতে পাবে না ইন্ডিয়ানরা।

তবু নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না কিছুতে। মাঝে মাঝে ঘোড়া থামাচ্ছে ইয়াসীন। উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করছে কোন সন্দেহজনক শব্দ। আবার চলতে শুরু করে সতর্ক চোখ রাখছে ঘোড়ার কানে। অন্ধকারে বিপদ আঁচ করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংকেত হচ্ছে ঘোড়ার কান। সওয়ারির অনেক আগে বিপদ বুঝতে পারে ঘোড়া। সাথে সাথে খাড়া করে কান।

রাইফেলটা জিনে আটকে নিয়েছে ইয়াসীন। বামহাতে ধরে রেখেছে লাগাম। ডানহাতে পিস্তল। রাতের অ্যাকশনে রাইফেলের চেয়ে পিস্তল অনেক বেশি উপযোগী। বিশেষ করে ঘোড়ার পিঠে। হেঁটে চলেছে ঘোড়াটা।

প্রায় তিন মাইল পথ চলে এসেছে ও। আরও মাইলখানেক যাবার পর হঠাৎ বিনা সংকেতেই গতি বাড়িয়ে দিল ঘোড়াটা। সাথে সাথে সতর্ক হলো ইয়াসীন। কোন সন্দেহজনক শব্দ শোনা যায়নি। তবু ভয় পেয়েছে ঘোড়াটা বোঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

ছুটতে ছুটতে মুখ ঘুরিয়ে পিছন দিকটা দেখার চেষ্টা করল ঘোড়াটা। পিছনে তাকাল ইয়াসীন। কোথাও কিছু দেখা যায় না। কোন শব্দও নেই। কিন্তু কিছু আছে পিছনে। নিঃশব্দ, অদৃশ্য অথচ ভয়ানক কোন বিপদ।

বাতাস পড়ে গেছে। চারদিকের নিথর নীরবতার মাঝে কেবল ঘোড়ার নিঃশ্বাস আর ক্ষুরের অস্পষ্ট আওয়াজ। অকস্মাৎ পাক খেয়ে বাঁয়ে ঘুরে গেল ঘোড়াটা। সাথে সাথে সামনের বালি থেকে গর্জিয়ে উঠল একজন মানুষ। ডাইনে কোন কিছুর শব্দ। মাথা ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাল ও। ফলে কপাল ঘেঁষে বেরিয়ে গেল বাঁদিক থেকে ছোঁড়া একটা তীর। সাথে সাথে পিছন থেকে কেউ লাফিয়ে উঠে তার কোমর জাপটে ধরার চেষ্টা করল।

লাগাম ঝাঁকিয়ে ঘোড়াটাকে সংকেত দিল ও। ছুটতে শুরু করল ওটা।

জাপটে ধরা হাত তাকে ভালভাবে আঁকড়ে ধরতে পারেনি, তাই পিছলে নেমে গেল।

সোজাসুজি গম্বুজের মাথায় উঠতে চেষ্টা করছে ইয়াসীন। কিন্তু ওরা আছে সবদিকে। প্রায় ডজনখানেক ইন্ডিয়ান। গোল হয়ে ঘিরে রেখেছে তাকে। বেরোতে হলে ওদের কর্ডন ভাঙতে হবে। সামনের ইন্ডিয়ানটার দিকে সোজা ঘোড়া হাঁকাল সে। ধনুকে তীর সংযোজন করছিল লোকটা। বিপদ টের পেয়ে লাফিয়ে সরে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ঘোড়ার ক্ষুরে থেঁতলে গেল তার দেহ। এক অমানুষিক আর্তচিৎকারে চমকে উঠল রাত।

দ্রুত ছুটছে ওর ঘোড়া। পিছনে হিস্ করে উঠল কিছু। সম্ভবত তীর। কিন্তু লাগল না গায়ে। এযাত্রা ওদের কর্ডন ভেঙে বেরোনো গেছে। ঘোড়াটার ক্ষিপ্রতা আর বুদ্ধিই তাকে রক্ষা করেছে।

কিন্তু সহজে তাকে বাঁচতে দেবে না ওরা। সহজে কাউকেই নিস্তার দেয় না ইন্ডিয়ানরা। একবার ব্যর্থ হয়েছে ওদের আক্রমণ। কিন্তু তাতে একটুও উদ্যম হারাবে না। দমও হারাবে না। অবিশ্বাস্য স্ট্যামিনা ওদের। ঘোড়াটার সাথে পাল্লা দিয়ে সমানে দৌড়ে আসবে। এবং একসময় ধরে ফেলবে। কারণ এই চড়াইয়ে পিঠে সওয়ার নিয়ে বেশিক্ষণ জোরে ছুটতে পারবে না ঘোড়াটা। তার উপরে পানির অভাব। সবই জানা আছে ওদের।

দূরে গম্বুজের ওপাশে পাহাড়ের চূড়া। ফ্যাকাসে আকাশের বিপরীতে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে এখন।

সোজা গম্বুজের মাথায় আর উঠছে না ও। একটা বিশাল বৃত্ত তৈরি করে, ঘুরে উঠছে। কিন্তু এত করেও হয়তো ধোঁকা দেওয়া যাবে না ইন্ডিয়ানদের।

গতি কমাল ইয়াসীন। হেঁটে চলেছে ঘোড়াটা। বিশ্রাম প্রয়োজন ওটার। ভবিষ্যৎ বিপদ মোকাবিলার জন্য কিছু সঞ্চিত শক্তি প্রয়োজন। আধামাইল কোনাকুনি যাবার পর দিক পরিবর্তন করল ও। সোজা উঠছে গম্বুজের মাথায়।

কিছুক্ষণ চলার পর বাঁয়ে একটা ছায়া দেখা গেল। বেশ দূরে। ডানেও দেখা যাচ্ছে ওদের। সামনের পথ আটকাতে চাচ্ছে ওরা। যাতে ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে যায় ও। এতক্ষণে ওরাও বুঝে গেছে ইয়াসীনের উদ্দেশ্য। কিছুতেই টহলদলটার কাছে পৌঁছাতে দেবে না তাকে। অথচ ফিরে যাওয়া নিরাপদ নয়। পিছনে আরও ইন্ডিয়ান রয়েছে।

সামান্য থমকাল ইয়াসীন। চারদিক ভালভাবে দেখে নিল। ঘোড়াটাকে সামান্য ডাইনে ঘুরিয়ে এগিয়ে চলল আবার। এর ফলে বাঁ দিকের ইন্ডিয়ানরা একটু দূরে সরে যাবে।

কিন্তু ডানদিকের একজন ইন্ডিয়ান দ্রুত এগিয়ে আসছে কাছে। লোকটার হাতে একটা লম্বা ছোরা। দেখেও না দেখার ভান করল ইয়াসীন। মাথাটা এমন ভাবে বাঁয়ে ঘুরিয়ে রাখল যেন কিছুই দেখেনি। মনে মনে লোকটার স্টেপিং গুণছে–এক, দুই, তিন, চার...।

শেষ মুহূর্তে ডানে ঘুরল সে। এবং গুলি করল। নিখুঁত হয়েছে টাইমিং। কোপ মারার জন্য ছোরা তুলেছিল ইন্ডিয়ানটা। কিন্তু এ জনমে আর কাউকে কোপ মারা হবে না তার।

আরও ডাইনে ঘুরে ঘোড়া ছুটাল ইয়াসীন। এভাবে ডাইনের দলটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল ও। কিছুদূর দ্রুত ছুটিয়ে আবার ঘোড়ার গতি কমাল। এবং বাঁয়ে মোড় নিয়ে উঠে এল গম্বুজের মাথায়।

গম্বুজের মাথাটা কিছুটা সমতল। এখান থেকে চারদিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে ভূমি। সামনের ঢাল অত খাড়া নয়। বেশ দূরে ঢাল আটকে দাঁড়িয়ে আছে ওয়াইল্ডক্যাট পাহাড়। সোজা সেটার দিকে এগোল ইয়াসীন।

চারপাশে প্রচুর পাথর রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কভারের জন্য চমৎকার হবে পাহাড়টা। সেজন্যেই ওখানে আক্রমণ করার ঝুঁকি বোধহয় ইন্ডিয়ানরা নেবে না। তা ছাড়া গুলির শব্দ হয়েছে একটু আগে। সেটা যদি লেফটেন্যান্ট সাইমনের দল শুনে থাকে তবে তারাও এগিয়ে আসতে পারে এদিকে। তাই পাহাড়টাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবে ওরা। এবং টহলদলটাকে যে সমস্ত ইন্ডিয়ান ঘিরে আছে তারা এদের সাথে যোগ দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করবে। ফলে, টহলদল এবং ওর মাঝখানে সৃষ্টি হবে দুর্ভেদ্য এক ব্যারিকেড।

ওয়াইল্ডক্যাট পাহাড়ের কোল ঘেঁষে উত্তরপশ্চিম দিকে চলল ইয়াসীন। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছাল পাহাড়টার পশ্চিম প্রান্তে। ওপাশে আবার শুরু হয়েছে মরুভূমির ঢাল। উত্তরে আকাশ ছোঁয়া একটা পাহাড়। ওর কোলেই কোথায় আছে লেফটেন্যান্ট সাইমন। এবং মরুভূমিতে ওত পেতে আছে ইন্ডিয়ানরা।

থামল ইয়াসীন। বিশ্রাম প্রয়োজন ঘোড়াটার। সামনে লম্বা পাল্লার দৌড় রয়েছে ওটার জন্যে। ঘোড়া থেকে নামল সে।

একটা বড় পাথরখণ্ডের আড়ালে দাঁড় করাল ঘোড়াটাকে। পাশে ছোট্ট একখণ্ড পাথরের উপর বসল বিশ্রাম নিতে। কোলের উপর রাখল পিস্তল। সতর্ক দৃষ্টি অনবরত ঘুরছে ডানে বাঁয়ে।

শেষ প্রহরের শীতল রাত। আরও কিছুক্ষণ পর লাল হতে শুরু করবে পুব আকাশ।

উত্তরের পাহাড়টার দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। খোলা মরুভূমি পার হয়ে

পৌঁছাতে হবে ওখানে। ভোরের আলো ফুটবার আগেই পৌঁছানো দরকার। নইলে হয়তো কোনদিনই পৌঁছানো যাবে না ওটার কাছে। এদিকে পরিশ্রান্ত ঘোড়াটার জন্য প্রয়োজন বিশ্রাম।

বিশ্রাম প্রয়োজন তার নিজের জন্যেও। ইউনিফর্ম জ্যাকেটের ভিতর ঘামে আর বালিতে চটচটে হয়ে উঠেছে শার্ট। মুখের ভিতরে কিচ্ কিচ্ করছে বালি। বুটের মধ্যে পায়ের আঙুল পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। এখন চাই ঠাণ্ডা জলের একটা স্নান, গরম খাবার এবং আটচল্লিশ ঘণ্টার একটা লম্বা ঘুম। ঘুম আসছে!

মাথা ঝাঁকিয়ে তন্দ্রা তাড়াল সে। ঘুমের সময় নয় এটা। এখানে চোখ বুজলেই হাজির হবে মৃত্যু। এবং সেই সাথে মারা যাবে লেফটেন্যান্ট সাইমনের টহলদল।

উঠে দাঁড়াল ইয়াসীন। এদিক ওদিক পায়চারি করল কিছুক্ষণ। ওকে খুঁজতে চুপিসারে এখানেও চলে আসতে পারে কোন ইন্ডিয়ান যোদ্ধা। মরুভূমিতে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে সে। যোশুয়ার ঝোপগুলো ভাল করে খুঁটিয়ে দেখছে। নড়ে না ওগুলো—অর্থাৎ ইন্ডিয়ান নয়। তবে আছে ওরা সন্দেহ নেই।

ওদের এড়ানো যাবে না কিছুতেই। এবং টহলদলের কেউও অন্ধকারে ওকে না চিনে গুলি করে বসতে পারে। ম্যাকহার্ডির কথাগুলো মনে পড়ল। আনমনে হাসল ইয়াসীন। কার মৃত্যু যে কোথায়!

টুপির খোলে সামান্য পানি ঢেলে ঘোড়াটাকে খাওয়াল ও। ওটার কানের কাছে কথা বলল ফিসফিসিয়ে। 'এখনি সময়, সাগরেদ। তুমি যদি না পারো, মোযেভে কেউই পারবে না।' ঘোড়াটা নাক ঘষল ওর কাঁধে।

নিজেও এক ঢোক পানি খেল ইয়াসীন। বাকিটা থাক টহলদলের জন্যে। বোতল জিনের পকেটে রেখে দিল ও। ঘোড়ার পিঠে আবার শুরু হলো যাত্রা।

আকাশে তারার সংখ্যা কমে এসেছে। চলতে চলতে নিজের হার্টবিট শোনার চেষ্টা করল ইয়াসীন। শোনার চেষ্টা করছে সন্দেহজনক কোন শব্দ। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজাল ও। এতক্ষণে ওর অবস্থান বুঝে গেছে ইন্ডিয়ানরা। সামনে কোথাও ওত পেতে আছে তারা।

অপেক্ষা করছে ইন্ডিয়ানরা। কিছুতেই রেহাই দেবে না। প্রথমে ঘোড়াটা ঘায়েল করবে মাংসের জন্যে। তারপর অসহায় ঘোড়সওয়ারকে হত্যা করবে অস্ত্র আর রসদের জন্যে। এবং হত্যা করবে টহলদলের সবাইকে।

দূরে কালো পাহাড়ের অবয়ব। বাম হাতে লাগাম আর ডানহাতে পিস্তল নিয়ে সেদিকে চলেছে ঘোড়সওয়ার। ঠিক তার পিছনে একই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলেছে—কুটিল বন্ধুর মত—মৃত্যু!

সতেরো

দুই মাইল যেতে হবে ওকে।

ওই পাহাড়ের কোলে কোথাও পাওয়া যাবে লেফটেন্যান্ট সাইমনকে। এরি মধ্যে যদি আক্রান্ত হয় ও তবে টহলদলটা এগিয়ে আসতে পারে সাহায্যে। কিন্তু গ্যারিকের বর্ণনায় যদি ভুল থাকে কিংবা যদি অন্য কোথাও সরে গিয়ে থাকে টহলদল–কেউ আসবে না!

ফর্সা হয়ে আসছে পুব দিগন্ত। আকাশের শেষ তারাটাও গেছে হারিয়ে। ঘোড়ার একঘেয়ে চলার শব্দ ছাড়া অন্য কিছু কানে আসে না। চারদিক বেশ কিছুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে আবছা ভাবে। স্পষ্ট হয়ে আসছে দূরের পাহাড়টা। ওটার কোল ঘেঁষে এখনও চাপচাপ অন্ধকার।

খুব তেষ্টা পেয়েছে ইয়াসীনের। কেমন যেন ছমছমে একটা ভয়। বুকের বাঁ পাশে ছটফট করছে হৃদপিণ্ড।

ঘোড়াটাকে প্রায় একমাইল হাঁটিয়ে এনেছে সে। আর মাত্র মাইল খানেক বাকি। এবারে ছুট লাগালে কেমন হয়? খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে।

তবু আচমকা ঘোড়া ছুটাল না ইয়াসীন। চারপাশ দেখতে দেখতে মধ্যম গতিতে চালাচ্ছে সে ঘোড়াটা। এখানে ওখানে ছোট ছোট বালিয়াড়ি আর পাথর। পিছনের সেই গম্বুজ থেকে ক্রমেই ঢাল বেয়ে উতরাইয়ে নামতে হচ্ছে তাকে। শেষ পাঁচশো গজ সমতল ভূমি অতিক্রম করতে হবে।

ঘোড়াটা বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ওটাকে অভয় দান করার চেষ্টা করল সে। 'আর বেশি দূর নেই, সাগরেদ। এবারে শুরু করো দৌড়।'

ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ সজীব হয়ে উঠল মরুভূমি। এইমাত্র নিথর ঘুমিয়ে ছিল সব। অথচ এখন কী ভীষণ আলোড়ন চারপাশে।

ভোরের প্রথম আলোয় ঝিকিয়ে উঠল একটা রাইফেল...আরও একটা। দ্রুত ওদের সংখ্যা অনুমান করার চেষ্টা করল ইয়াসীন। এক, দুই, চার, সাত–দশ। সবাই চেপে আসছে কাছে।

দুজনের হাতে রাইফেল। দুজনের হাতে ছোট্ট হাতলওয়ালা কুড়াল। বাকি সবার কাছে তীরধনুক।

চারজন রয়েছে বাঁয়ে। তিনজন সামনে, বেশ দূরে। দুজন আছে ডানে।

তাদের পিছনে আরও ডানে আর একজন। মাঝখানে ফাঁকটা রাখা হয়েছে ইয়াসীনকে প্রলুব্ধ করতে।

'লাভ নেই!' ইন্ডিয়ানদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল ও বাংলায়। 'গ্রীন ইন্ডিয়ান ঘুঘু পা দেবে না রেড ইন্ডিয়ান ফাঁদে।' তবে ঘোড়া থামাল না সে। ধোঁকা দেবার জন্য সামান্য এগিয়ে গেল গ্যাপটার ভিতর। তারপর চকিতে বাঁয়ে মোড় নিয়ে ঘোড়ার পেটে গোড়ালি দিয়ে আঘাত করল।

সিগন্যাল বুঝতে পেরে বাঁয়ের চারজন ইন্ডিয়ানের দিকে তীরবেগে ছুটল ঘোড়াটা। একজন রাইফেল তুলছে। দ্রুত গুলি করল ইয়াসীন। ঝাঁকি খেয়ে হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল রাইফেলধারী। পিছনে গুলির আওয়াজ! একটা তীর এসে লাগল ঘোড়ার জিনে। কাছের একজন ইন্ডিয়ান কুড়াল চালাল তার পা তাক করে। কিন্তু ঘোড়ার গতি ঠিকমত আঁচ করতে না পারায় ফসকে গেল কোপ। এমন সময় বাঁ দিকের একজন ধনুক ফেলে লাফিয়ে উঠে তার গলা ধরে ঝুলে পড়ল। ঘোড়া থেকে ফেলে দিতে চায়! বাঁ দিকে কাত হয়ে গেল ইয়াসীন। ফলে পিছন থেকে ছুঁড়ে মারা কুড়ালখানা বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে বেরিয়ে গেল ডান কান ঘেঁষে। ঝুলে থাকা লোকটার পাঁজরে বাঁ কনুই চালাল ও। তাতে বিন্দুমাত্র কাবু হলো না ইন্ডিয়ানটা। এদিকে ভয় পেয়ে দিগ্বিদিক ছুটছে ঘোড়া।

জিন থেকে পিছনে নেমে যাচ্ছে ইয়াসীন। পড়ে যাওয়া মানে অবধারিত মৃত্যু। ডান হাতের পিস্তলটা বাঁ বগলের ফাঁকে ঢুকিয়ে ট্রিগার টিপল সে। সামান্য শিথিল হলো গলা আঁকড়ে ধরা হাত। পিস্তলের নল সামান্য ঘুরিয়ে আবার টিপল ট্রিগার। একটা গোঙানির শব্দ করে গলা ছেড়ে দিল ইন্ডিয়ান। পড়ে যাচ্ছিল সেও। কোনমতে ঘোড়ার কেশর খামচে ধরে ঝুলে রইল।

তাল সামলে নিয়ে এক ঝটকায় জিনে উঠে এল ইয়াসীন। তখনি সামনে গজিয়ে উঠল আরও দু'জন ইন্ডিয়ান। তাদের বাঁয়ে ডজ দিয়ে ডানে কাটল ও। ঘোড়া ছুটাল সোজা পাহাড়ের দিকে। পিছনে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পাহাড়ের কোলে ঠিক যে পাথরগুলো আড়ালে টহল দলটাকে দেখবে বলে আশা করেছিল ইয়াসীন, সেখান থেকে বেরিয়ে এল দুজন ইন্ডিয়ান! একজনের হাতে রাইফেল অন্যজনের কাছে তীরধনুক।

গুলি করতে পিস্তল তুলেছিল সে। রাইফেল উঠিয়েছিল ইন্ডিয়ানটাও। কিন্তু তৃতীয় একটা বুলেট ধরাশায়ী করল রাইফেলধারীকে। তাড়াহুড়োয় অপরজনের তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। দ্রুত কাছে চলে আসছে লোকটা। তাকে কাটানোর কোন চেষ্টা করল না ও। সোজা চালিয়ে দিল ঘোড়া। ভয়ার্ত চিৎকারটা শেষ হবার আগেই ধরাশায়ী হলো লোকটা।

ওপাশে আর এক সারি পাথর। একঝলক নীল ইউনিফর্ম! পুরোদমে ঘোড়া ছুটিয়ে পৌঁছে গেল সে ওপাশের পকেটমত জায়গাটায়। সূর্য উঠেছে।

ঘোড়া থেকে নামল ইয়াসীন। একনজরেই বোঝা যাচ্ছে টহলদলের করুণ অবস্থা। আসতে আরও দেরি হলে লাভ হত না এসে।

লেফটেন্যান্ট সাইমন আহত। পা মেলে পাহাড়ের পাথুরে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। ব্যথা আর ক্লান্তিতে কুঁচকে আছে তার গাল।

আহত হয়েছে আরও তিনজন। একজনের মাথায় রক্তাক্ত রুমাল বাঁধা। আর একজনের ট্রাউজারেও কাঁচা রক্ত। যারা আহত হয়নি তাদের অবস্থাও তৃষ্ণা আর পরিশ্রমের ফলে শোচনীয়।

পিছনে তাকাল ইয়াসীন।

কেউ নেই খোলা মরুভূমিতে! একটু আগে যে ছিল, তার বিন্দুমাত্র চিহ্নও নেই। শুধু একটা মৃতদেহ পড়ে আছে দূরে—বালিতে। ওটা ওখানে কীভাবে এল সে-ই যেন এক বিস্ময়।

একটা পানির বোতল বের করল সে। 'মনে হচ্ছে এতেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে সবাই,' লেফটেন্যান্টের দিকে বাড়িয়ে দিল বোতলটা।

কাঁপা হাতে বোতলটা নিল লেফটেন্যান্ট। মাত্র একঢোক পানি খেয়ে ফিরিয়ে দিল। 'বাকিটা অন্যদের জন্যে।' বিকৃত স্বরে বলল।

হাতে হাতে ঘুরতে লাগল পানির বোতল। 'অল্প অল্প করে খাও,' বলল ইয়াসীন। 'একবারে বেশি খেলে অসুবিধা হতে পারে।'

সবাই গলা ভিজিয়ে নেবার পর কী হয়েছিল জানতে চাইল ও।

'গত দু'দিন দু'রাত পানি নেই আমাদের,' একজন সৈনিক বলল। 'ঘোড়াগুলো নিয়ে গেছে ওরা। তুমি সময়মত না এলে আমাদেরও মেরে ফেলত।'

'এখান থেকে এখনি সরে যেতে হবে আমাদের,' বলল ইয়াসীন। 'নইলে আবার ওরা ফিরে আসবে, তখন আর বেরোতে পারব না।'

'চলার মত শক্তি অবশিষ্ট নেই আমাদের,' বলল লেফটেন্যান্ট।

'মাইলখানেক পুবে একটা ওয়াটারহোল আছে।' বলল ইয়াসীন। 'আরও একঢোক পানি খাব আমরা। কিছুক্ষণ পরে আরও একঢোক। ফলে ওয়াটার হোল পর্যন্ত যাবার শক্তি ফিরে পাব।'

'মেজর সাইকের কোন নির্দেশ আছে?'

'না, সার। আমার মনে হয় সে এখনও জানে না কী হয়েছে আমাদের।' মার্ল স্প্রিং-এ যাবার ঘটনা বলল ও লেফটেন্যান্টকে। মোকাটো আর গ্যারিকের কথা বলল।

আর এক রাউন্ড পানি পান করা হলো। সামান্য সজীবতা ফিরে আসছে সবার মধ্যে। কোমরের বেল্ট আঁটছে একে একে সবাই। বেঁধে নিচ্ছে জুতোর ফিতে। চলার মত শক্তি নেই, তবু এখানে আটকে পড়তে চায় না কেউ।

বালিতে একটা ম্যাপ আঁকল ইয়াসীন। 'এখানে আছি আমরা,' অফিসারকে দেখাল। 'এখানে, সেই ওয়াটারহোল। ওখান থেকে মাইল দশেক দক্ষিণ-পুবে, এই হলো কাট স্প্রিং। আমার মনে হয় আজকের ভিতরেই ও-পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব। তবে লড়তে হবে আমাদের।'

'সে-ও একটা সমস্যা, সার্জেন্ট। বুলেট ফুরিয়ে গেছে আমাদের।'

'আমার কাছে শ'খানেক রাউন্ড আছে,' বলল ইয়াসীন। 'তবে সেগুলো আপানাদের রাইফেলে ঢুকবে না। তাই আপনাদের জন্যে আলাদা কিছু বুলেট এনেছি। পঞ্চাশ ষাট রাউন্ড হবে।'

'সে তো অনেক! আমার দুজন সিপাহীর কাছে একটা বুলেটও নেই। সব মিলিয়ে ত্রিশ রাউন্ড হবে কিনা সন্দেহ।'

সোজা হয়ে বসল লেফটেন্যান্ট। 'কিড তুমি, টোবিন আর বেয়ার্ড–তোমরা সবচেয়ে ভাল শট। তাই দশ রাউন্ড করে বুলেট নেবে তোমরা।'

'উইলীও ভাল শুটার। কিছু বাড়তি বুলেট তাকেও দেয়া যেতে পারে,' প্রস্তাব দিল কিড।

'ঠিক আছে, উইলীও পাবে দশ রাউন্ড। বাকি সবাই তোমাদের প্যাক বয়ে নেবে। যাতে গোলাগুলির সময় ঝাড়া হাতপায়ে থাকতে পারো তোমরা।' ইয়াসীনের দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট সাইমন। 'তোমার ঘোড়াটা কি দুজন লোক নিতে পারবে?'

'ইয়েস, সার।'

'দুজনের জখম বেশ মারাত্মক। ঘোড়ায় চড়ে যাবে তারা। কখন শুরু করব আমরা, সার্জেন্ট?'

'এখনি সবচেয়ে ভাল সময়। সূর্য মাথার উপরে উঠে আসতে কিছু সময় নেবে। ততক্ষণে পুবের ওয়াটারহোল হয়ে কাট স্প্রিং-এ চলে যেতে পারব আমরা। সেখানে–রাইফেলে গায়ের জ্যাকেট টানিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিশ্রাম শেষে আবার যাত্রা করা যাবে।'

সবার আগে চলল ইয়াসীন। ওর পিছনে কিড আর উইলী। সবার পিছনে আসছে টোবিন আর বেয়ার্ড। লেফটেন্যান্ট সাইমন চলেছে ইয়াসীনের পাশাপাশি। পায়ে চোট লাগায় সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছে সে।

পথে কোন ইন্ডিয়ান দেখা গেল না। ওয়াটাহোলের চারপাশের বালিতে

অনেক পায়ের ছাপ। কিন্তু সেখানেও নেই কোন ইন্ডিয়ান। বোতলে পানি ভরে নিল সবাই। ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হলো। এবারের গন্তব্য কাট স্প্রিং।

এযাত্রাও ইন্ডিয়ানদের দেখা মিলল না। কাট স্প্রিং-এ নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেল দল।

এতটুকু পথ এসেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সৈন্যরা। গত দুদিনের তৃষ্ণা দুর্বল করে দিয়েছে ওদের। রাতের জন্যে এখানে বিশ্রাম নেবার সিদ্ধান্ত নিল ইয়াসীন। 'ঘোড়াটাকে খুব কাছে রাখতে হবে আমাদের।' লেফটেন্যান্টকে বলল সে। 'রাতের আঁধারে ওটা যদি চুরি করে নিয়ে যায় ওরা–বিপদে পড়ব সবাই।'

ঝলসানো দুপুরের পর দীর্ঘস্থায়ী হলো না বিকেল। রাত নামল। শীতল, পরিচ্ছন্ন এবং নীরব একটা রাত। হাওয়া নেই। আশেপাশে ছড়িয়ে আছে ছোটবড় গ্র্যানিট পাথর। ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে কভার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে ওগুলো।

ছোট্ট একটা চুলো জ্বালানো হলো কফি এবং সুপ তৈরি করার জন্যে। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিভিয়ে দেয়া হলো আগুন। ঘুমিয়ে পড়ল সবাই।

কিছুক্ষণ পর ঘুম ভেঙে গেল ইয়াসীনের। উঠে পাহারারত সৈনিক দুজনকে দেখতে গেল সে। একজন ঝিমাচ্ছে। তাকে ঘুমোতে পাঠাল। নিজেই পাহারা দেবে বাকি রাত।

একটা পাথরখণ্ডের গায়ে ঠেস দিয়ে বসল ইয়াসীন। পাশেই আর একটা পাথরখণ্ডে হেলান দিয়ে বসে আছে উইলী। 'কোন শব্দ শুনতে পেয়েছ?' জিজ্ঞাসা করল তাকে।

'না...তবে আমার মনে হয় কাছে পিঠেই আছে ওরা।'

'আছে,' বলল ইয়াসীন। অস্বস্তি তাড়াতে প্রসঙ্গ পাল্টাল ও। 'মিনেসোটায় কী করতে তুমি?'

উত্তর দিতে অনেকক্ষণ সময় নিল উইলী। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'ছেলেবেলায় কাজ করতাম একটা মিলে। তারপর নিজের চেষ্টায় একটা স্টোর গড়ে তুলেছিলাম। ভালই আয় উন্নতি হত। কিন্তু ধ্বংস হয়ে গেল সব। লিট্‌ল ক্রো একদিন পাদ্রীর ছদ্মবেশে এল শহরে। গির্জায় সকালের প্রার্থনায় সবার সাথে অংশ নিল। প্রার্থনা শেষে ফিরে গিয়ে রংচং মেখে প্রস্তুত হলো গোত্রের সবাইকে নিয়ে। বিকেলের দিকে সিউ ইন্ডিয়ানদের প্রচণ্ড আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেল আমাদের শহরটা। অধিকাংশ লোক মারা পড়ল। আমার স্টোরটা ছাই হয়ে গেল পুড়ে। আমি আর আমার স্ত্রী আশ্রয় নিয়েছিলাম গির্জার নীচে একটা গোপন

কুঠুরিতে। নইলে বাঁচতে পারতাম না।'

'তোমার স্ত্রী কি এখনও মিনেসোটায়?'

'না। ইন্ডিয়ানদের আক্রমণে ভীষণ ভয় পায় সে। আমাকে ছেড়ে তার মায়ের কাছে ফিরে যায়, পুবের একটা শহরে। অনেক সেধেছিলাম আমার সাথে থাকার জন্যে। কিছুদিনের মধ্যে আরও বড় একটা স্টোর গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুতেই আমার ওপর ভরসা রাখতে পারল না মেয়েটা। চলে গেল। কপর্দকহীন কোন মানুষের ওপর ভরসা রাখতে পারে না মেয়েরা।'

'তারপর থেকে আর্মিতেই আছ, তাই না?'

'কী করব বলো।' আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল উইলী। 'মানুষকে কিছু একটা নিয়ে বাঁচতে হয়। তবে আর বেশিদিন থাকব না আর্মিতে। সোনার নদীটা যদি খুঁজে পাই...বড় একটা স্টোর গড়ে তুলব। মেয়েটাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব কী ভুলটাই না সে করেছিল!

আনমনে হাসল ইয়াসীন। ভাবল: প্রতিটি সৈনিকেরই নিজস্ব কিছু স্বপ্ন থাকে।

উইলীর কাছ থেকে উঠে গেল ও। ঘুরে দেখতে হবে চারপাশ। যে কোন দিক থেকে হামলা চালাতে পারে ইন্ডিয়ানরা।

বারবার মনে আসছে উইলীর কথাগুলো। সে-ও তা হলে সোনার নদীটা নিয়ে স্বপ্ন দেখছে!

হঠাৎ কেমন যেন খটকা লাগল মনে। কিছু একটা যেন বারবার এড়িয়ে যাচ্ছে সে। চকিতে মনে পড়ল সেই ম্যাপটার কথা।

ঠিক এই জায়গাটার উল্লেখ আছে ম্যাপে। সব কিছু বিশদভাবে দেখানো হয়নি ম্যাপটাতে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারল ইয়াসীন, কাছেই কোথাও আছে সোনার একটা নদী। হয়তো আরও কিছুটা পুবে।

আঠারো

গুলির শব্দে জেগে উঠল বেলিন্দা। প্রথমেই ইয়াসীনের কথা মনে পড়ল তার। বিছানা ছেড়ে উঠে ঝটপট কাপড় পরতে শুরু করল সে।

ছোট্ট কেবিনটার মাঝামাঝি একটা পর্দা টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এপাশে মার্থাখালা আর তার থাকার ব্যবস্থা। ওপাশে গাদা মারা রয়েছে রসদ এবং ফাঁড়ির প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম।

মার্থাখালাও জেগে গেছেন। 'হয়তো ইয়াসীনের ফিরে আসার কথা ভাবছ তুমি,' বললেন তিনি। 'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ফেরার কথা নয় তার। অনেকদূর যেতে হবে তাকে। ওদের খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনতে আরও সময় লাগবে।'

'ঠিক সে কথা ভাবছি না আমি।' কিছুটা যেন চুপসে গেল বেলিন্দা। কিন্তু হতেও তো পারে তা। হয়তো ফিরে আসছে সীন। আর তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে ইন্ডিয়ানরা। সেক্ষেত্রে কভারের প্রয়োজন হবে ওর।

মিনিটখানেক পর আরও দুটো গুলির শব্দ শোনা গেল। বেশ কাছেই। তারপর নীরবতা। মার্থাখালা বিছানা ছাড়লেন। দরজা খুলে বাইরে এল বেলিন্দা।

একজন সৈনিক পড়ে আছে খোঁয়াড়ের পাশে। তার দেহের উপর ঝুঁকে রয়েছে রস।

'স্যামুয়েল, ম্যাডাম,' বলল রস। 'চত্বরে পাহারা দিচ্ছিল। কোন শার্পশুটিং ইন্ডিয়ান লাইনে পেয়ে মেরে দিয়েছে।'

'মারা গেছে!'

'হ্যাঁ।' শুধু তাই নয়। 'লুইস, ফাউলার আর পাওয়ার রাতের আঁধারে পালিয়েছে ফাঁড়ি ছেড়ে। চারটে ঘোড়া নিয়ে গেছে ওরা।'

'ওদের আক্রমণ করেনি ইন্ডিয়ানরা?'

উদ্বিগ্ন ম্যাকহার্ডি এসে দাঁড়াল পাশে। 'সেরকমই তো মনে হচ্ছে। আক্রমণ করলে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যেত,' চিন্তিত ভাবে বলল সে। 'কিংবা হয়তো বাগে পাওয়ার জন্যে ওদের অনুসরণ করে চলেছে ইন্ডিয়ানরা। কিন্তু এখানে খুব কমজোর হয়ে গেলাম আমরা। স্যামুয়েল মারা গেল। ফ্লেমিং জ্বরে শয্যাশায়ী, লুইস নেই। তারমানে অবশিষ্ট আছি মোকাটো আর আমি।'

ম্যাকহার্ডির দিকে চাইল রস। 'কেন আমি আছি না? আর টমাস?'

'আরে তোমরা তো সিভিলিয়ান। তোমাদের রক্ষা করতে গিয়েই তো এত দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে আমাদের।'

'ও! সিভিলিয়ান বলে গুণতিতে ধরছ না আমাদের। ঠিক আছে, শুরু হোক লড়াই। দেখবে এই সিভিলিয়ানই উল্টে জান বাঁচাচ্ছে তোমাদের।'

'আমিও রাইফেল চালাতে জানি।' ধীরে ধীরে বলল বেলিন্দা। 'মার্থাখালা আর আমি সিভিলিয়ান হলেও যথেষ্ট সাহায্য করতে পারব প্রয়োজনের সময়ে।'

ওপাশে বেড়ার কোলে আগুন জ্বালিয়েছেন মার্থাখালা। বাকিরাত জেগে কাটাতে হবে, তাই কফি তৈরি হচ্ছে।

মোকাটো রাইফেল হাতে পায়চারি করছে গেটের কাছে টমাস আর রস গেল স্যামুয়েলের লাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে।

কিছুই ভাল লাগছে না বেলিন্দার। অন্ধকারে এক কোণায় বসে রইল সে।

কফির মগ হাতে ম্যাকহার্ডি এসে বসল পাশে। 'সার্জেন্ট, সীন কবে নাগাদ ফিরবে বলতে পারেন?' জানতে চাইল বেলিন্দা।

কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল ম্যাকহার্ডি। একটা দীর্ঘশ্বাস শুনল বেলিন্দা। 'এই শ্রীহীন ফাঁড়িতে ফিরে আসাকে কি ফেরা বলে, ম্যাডাম?'

'মানে?'

'একটা ডিউটিতে গেছে ইয়াসীন। সেটা শেষ হলেই ফেরার সুযোগ পায়। অবশ্য ততদিন যদি বেঁচে থাকে।'

'তবে আপনি ভাববেন না,' তার দিকে তাকাল সার্জেন্ট। 'বেঁচে থাকবে ইয়াসীন। এবং ফিরেও যাবে একদিন। হয়তো একটা সাজানো খামার গড়ে তুলবে কোথাও। আর সেদিন মিস ব্রাউন, আপনি থাকবেন ওর পাশে।'

'এসব কী বলছেন, সার্জেন্ট!'

প্রাণ খুলে হাসল ম্যাকহার্ডি। 'আমাকে ফাঁকি দিতে পারেনি আপনার চোখ, ম্যাডাম। আপনার সীনও ফাঁকি দিতে পারেনি এই ম্যাকহার্ডিকে। ঠিক মানুষই বেছে নিয়েছেন আপনি। চমৎকার জুটি হবেন আপনারা।'

উঠে কেবিনের দিকে চলে গেল বেলিন্দা। চেষ্টা করলেও আজ রাতে আর ঘুম আসবে না তার!

পরদিন ভোর নাগাদ প্রায় দশমাইল পুবে এগিয়ে যেতে পারল ফাউলার, পাওয়ার আর লুইস। সিডার ক্যানিয়ন হাতের বাঁয়ে রেখে আরও এগিয়ে গেল ওরা। কিছুক্ষণ পর একটা ছোট্ট স্প্রিং পাওয়া গেল। এলাকাটা পাওয়ারের চেনা। বিশ্রাম নিতে ঘোড়া থেকে নামল তিনজন।

'তোমার ধারণাই ঠিক, পাওয়ার।' বলল ফাউলার। 'ওই ফাঁড়িটাই দখল করতে চায় ইন্ডিয়ানরা। সে কারণে আমাদের ধাওয়া করে আসেনি।'

'এখনও নিশ্চিত বলা যায় না।' মোযেভদের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে না পাওয়ার। কেন ওদের আক্রমণ করা হলো না সেটা ইন্ডিয়ানরাই ভাল জানে। তবে ওরা চলে আসাতে লোকবল অনেক কমে গেছে মার্ল স্প্রিং ফাঁড়ির। এখন যে-কোন সময়ে আক্রান্ত হতে পারে ফাঁড়িটা। এবং সে উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই হয়তো ওদের পিছু নেয়নি ইন্ডিয়ানরা। তা ছাড়া পুবে চলে এসেছে ওরা। সেটাও একটা কারণ হতে পারে। পুবে না এসে ওরা যদি ক্যাম্পকেডি বা সাইমনের টহলদলটার দিকে যাবার চেষ্টা করত তা হলে রেহাই পেত না। এ ব্যাপারে পাওয়ার নিশ্চিত। কারণ, ফাঁড়িটা আক্রান্ত হয়েছে—সে সংবাদ আর কেউ জানুক

তা চায় না মোযেভরা।

'তবে ইয়াসীন যদি সাইমনের দলটাকে নিয়ে ফিরে আসে,' বলল পাওয়ার, 'সেক্ষেত্রে প্ল্যান পাল্টাতে পারে মোযেভরা। আমাদের তালাশে চলে আসতে পারে এদিকে।'

'দেখাই যাক না কী হয়,' মন্তব্য করে লুইস। আর্মি থেকে পালাতে পেরে বেশ হালকা বোধ হচ্ছে তার। মার্ল স্প্রিং-এর একঘেয়ে জীবনটায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সে। বাঘা লোক ওই ম্যাকহার্ডি। ডিউটিতে ফাঁকি একদম বরদাস্ত করে না। অথচ লুইস চায় ফাঁকিটাকি দিয়ে শর্টকাটে জীবনে বড় কিছু হতে।

ফাউলারের কাছে সোনার নদীর কথা শোনা অবধি স্বস্তি পাচ্ছিল না সে। কিন্তু একা সেটাকে খুঁজে বের করার মত শক্তি বা বুদ্ধি তার নেই। তাই ফাউলার তাকে পার্টনার করে নেবার প্রস্তাব দিতেই রাজি হয়ে গেছে।

ফাউলার কীভাবে নদীটা খুঁজে বের করবে জিজ্ঞাসা করেনি লুইস। বরাবর একটু কম বোঝে সে। অত প্যাঁচঘোঁচ শুনলেও হয়তো বুঝতে পারত না। পার্টনার হিসেবে তার শুধু সোনা পেলেই হলো। রাশি রাশি সোনা!

'ম্যাপটা খুঁজে পাওয়া যায়নি জুলিয়ানের জিনিসপত্রের মধ্যে।' পাওয়ারকে বলল ফাউলার। 'হেনরী নামের এক সৈনিক খুঁজে দেখেছিল ক্যাম্পকেডিতে। তার ধারণা ইয়াসীন সরিয়েছে ম্যাপটা। আমারও তাই মনে হয়।'

'ঠিক কোন অঞ্চলের ম্যাপ?' জানতে চাইল পাওয়ার।

উত্তর দিল না ফাউলার। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছু জানাতে চায় না সে পাওয়ারকে।

না বলতে চাইলেও জেনে আমি ঠিকই নেব-মনে মনে বলে পাওয়ার। প্রথম থেকেই সে অপছন্দ করে আসছে ফাউলারকে। লোকটা তারই মত একজন আউট ল'। তবে ভীষণ নীচ আর ধূর্ত।

কোন কাজ আইনসম্মত কি বেআইনী সেটা বড় করে দেখে না পাওয়ার। তবে কাজ হাতে নিলে বিশ্বস্ততার সাথে করার চেষ্টা করে সে। এবং সঙ্গীদের কাছ থেকেও তাই আশা করে। অথচ ফাউলার বরাবরই বিশ্বাসঘাতক।

ক্যালিফোর্নিয়ায় ফাউলারের সাথে প্রথম পরিচয় হয় তার। ঘোড়া চুরি ব্যবসাতে মন্দা যাচ্ছিল। পাহ্উট ইন্ডিয়ানদের সহায়তায় বড়বড় র‍্যাঞ্চ থেকে ঘোড়া চুরি করত সে। সেগুলোকে নিয়ে বেচে দিত নেভাডায়। তারপর নেভাডা থেকে ঘোড়া চুরি করে এনে ক্যালিফোর্নিয়ায় বিক্রি করত। ইন্ডিয়ানদের সাথে ভাগবাটোয়ারা নিয়ে বনিবনা না হওয়াতে ব্যবসায় খুব লাভ হচ্ছিল না। এমন সময় পরিচয় হলো জুলিয়ান এবং ফাউলারের সাথে।

পার্টনার হিসেবে ভালই ছিল জুলিয়ান। অন্তত ফাউলারের চেয়ে অনেক ভাল। সে-ই প্রথম সোনার নদীটা খুঁজবার প্রস্তাব দেয় পাওয়ারকে। কারণ পাহ্‌উটদের সাথে খাতির আছে তার এবং এ অঞ্চলটা খুব ভাল করে চেনে সে–জানত জুলিয়ান।

আগেও অনেকে নদীটা খুঁজবার প্রস্তাব দিয়েছে পাওয়ারকে। অনেকে নদীটার অবস্থান চিহ্নিত ম্যাপও দেখিয়েছে। কিন্তু রাজি হয়নি সে। কারণ সবগুলো ম্যাপই ভুয়া ছিল।

সোনার নদী সম্পর্কে কিছু সঠিক ধারণা সে পায় পাহ্‌উট ইন্ডিয়ানদের কাছে। একবার ইন্ডিয়ানদের সাথে চুরি করা ঘোড়া নিয়ে মরুভূমি পার হচ্ছিল ও। পথে রাত কাটাবার জন্য একটা পাহাড়ের কাছে থামতে হয়। ও ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে নদীটা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিল দুই বৃদ্ধ ইন্ডিয়ান। যেখানে রাত কাটাবার জন্যে থামা হয়েছে তার কাছেই নাকি আছে সোনার নদী–বলছিল ওরা। অন্তত ওদের পূর্বপুরুষদের কাছে সেরকম বর্ণনাই নাকি ওরা শুনেছে। কিছু কিছু পাহাড় আর গুহার নাম বলেছিল সেই ইন্ডিয়ান দুজন। পরদিন সকালে পাওয়ার জিজ্ঞাসা করেছিল ওদের কাছে সোনার নদীর কথা। উত্তর পায়নি। তারপরে আর কোনদিন কারও কাছে শোনেওনি সেই রাতে শোনা পাহাড়গুলোর নাম।

অবশেষে জুলিয়ান সোনার নদী সম্পর্কে এমন কিছু বর্ণনা দিল, এমন দু'একটা পাহাড়ের নাম বলল যে অবিশ্বাস করতে পারেনি পাওয়ার। ম্যাপটা কখনও দেখায়নি জুলিয়ান। কথা ছিল–অভিযান শুরু হবার পর তাকে দেখানো হবে ম্যাপ।

অথচ মারা গেছে জুলিয়ান। আর ম্যাপটা বাগিয়ে নিয়েছে ইয়াসীন নামের সেই শক্ত লোকটা। হয়তো ফাউলারকেও ম্যাপটা কখনও দেখায়নি জুলিয়ান।

'ম্যাপটা কি ভালমত মনে আছে তোমার?' ফাউলারকে জিজ্ঞাসা করে পাওয়ার।

শ্রাগ করে ফাউলার। 'অভকোর্স। তবে আর একবার দেখতে পারলে ভাল হত।'

হুঁ। তা হলে এই ব্যাপার! নিজের উপর ভীষণ বিরক্ত হলো পাওয়ার। ফাউলারের কথামত ওভাবে হুট করে মার্ল স্প্রিং থেকে পালিয়ে আসা বোধহয় ঠিক হয়নি। ইয়াসীনের কাছ থেকে ম্যাপটা কেড়ে আনতে হত। ফাউলারের উপর ঠিক ভরসা করা যাচ্ছে না।

'ম্যাপটা দরকার,' ফাউলারকে বলল পাওয়ার।

'যদি মোযেভদের হাতে ধরা পড়ে ইয়াসীন তবে কোনদিনই সেটা পাবার সম্ভাবনা থাকবে না।'

'আর যদি ফিরে আসে মার্ল স্প্রিং-এ, তা হলে?'

'তা হলে...,' চিন্তিত ভাবে বলল ফাউলার, 'ওই স্টেজ কোচটা ফোর্ট মোযেভে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে ইয়াসীন।'

'সেক্ষেত্রে সিডার ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে যেতে হবে ওদের,' বলল পাওয়ার।

'গুড থিঙ্কিং!' পাওয়ারের প্রশংসা না করে পারল না ফাউলার।

আবার ঘোড়ায় চড়ল ওরা তিনজন।

মরুভূমি এদিকে বিস্তৃত হতে পারেনি। অঞ্চলটা ছোটবড় অনেক পাহাড় আর গাছপালায় ভরা। অনেকগুলো ঝর্ণা আর ওয়াটারহোল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পাহাড়ের আনাচেকানাচে। কেবল পাওয়ারই জানে সেগুলোর খোঁজ।

যেতে যেতে সোনার নদীটার কথা ভাবছে পাওয়ার। যদি খোঁজ পাওয়া যায় নদীটার, তা হলে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে গণ্ডগোল অবধারিত। বোকা লুইস কোন সমস্যা নয়। কিন্তু ফাউলারকে সামাল দেওয়া কঠিন হবে।

ভাল পিস্তল চালাতে জানে ফাউলার। তিনচারটে ডুয়েল নাকি জিতেছে। কিন্তু পাওয়ার যে তার চেয়েও তুখোড়–জানে না সে। তা ছাড়া থ্রোইং নাইফে পিস্তলের মতই অব্যর্থ পাওয়ার। অর্থাৎ ফাউলারকেও ঘায়েল করা সম্ভব হবে।

এখন শুধু নদীটা খুঁজে বের করা! চকচকে সোনায় থৈ থৈ ভরা সেই স্বপ্নের নদীটা!

উনিশ

টহলদল নিয়ে ওয়াইল্ডক্যাট পাহাড়ের দিকে চলেছে ইয়াসীন। ও পথে ফিরতে হবে মার্ল স্প্রিং ফাঁড়িতে।

গত দুইদিন ইন্ডিয়ানদের দেখা যায়নি। আড়াল থেকে মৃত্যু বর্ষণ করেনি কোন ঘাতক রাইফেল। সম্ভবত ইয়াসীনকে ঠেকাতে না পেরে ফিরে গেছে তারা। এমনিতেই যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে তাদের।

চলার গতি কমে গেছে সৈন্যদের। গত কয়েকদিনের পরিশ্রমে কমবেশি বিধ্বস্ত সবাই। তায় এগোতে হচ্ছে চড়াই বেয়ে। তবুও গম্বুজের মসৃণ মাথাটা

নিকটবর্তী হচ্ছে ধীরে ধীরে। ওপাশে গোধূলির আরক্ত আকাশ। রাত নামছে।

পায়ে হেঁটে চলার সবচেয়ে বড় বাধা আলগা বালি। আর বিক্ষিপ্ত পাথরের টুকরো, ছড়ানো ছিটানো কাঁটাঝোপ এবং শেষ রাতের জোরালো হাওয়ায় তৈরি ছোটছোট বালিয়াড়ি। মার্ল স্প্রিং-এ পৌঁছাতে পুরো রাতই লেগে যেতে পারে–হিসেব করে দেখল ইয়াসীন। আরও বেশি সময় লাগতে পারে যদি পথে আবার বাধা দেয় মোযেভরা।

আরও ঘণ্টাখানেক চলার পর দলটাকে থামাল ও। সবাই পানি খেল এক ঢোক। ওয়াইল্ডক্যাট কাছিয়ে এসেছে।

পাহাড়টাকে হাতের ডাইনে রেখে মার্ল স্প্রিং-এর দিকে মোড় নিল টহলদল। ওটার একদম কাছে যাবার দরকার নেই। ইন্ডিয়ানরা থাকতে পারে।

গম্বুজটা ভাবাচ্ছে ইয়াসীনকে। ভারতের কথা মনে পড়ে যায়। পাঞ্জাবের কিছু পাহাড় আছে ওরকম। জুলিয়ানের সেই ম্যাপে ওয়াইল্ডক্যাট চিহ্নিত করা আছে অথচ ওই প্রাকৃতিক গম্বুজটা দেখানো হয়নি। হয়তো ইচ্ছা করেই উহ্য রাখা হয়েছে ওটা। চারদিকের আরও কিছু জায়গা সযত্নে এড়িয়ে গেছে আঁকিয়ে। যাতে ম্যাপটা অন্য লোকের হাতে পড়লে সহজে কিছু বুঝতে না পারে। স্বচক্ষে গম্বুজটা দেখে না গেলে ইয়াসীনও ম্যাপটা ভালভাবে বুঝতে পারত না।

কিন্তু আরও কিছু তাৎপর্য থাকতে পারে পাহাড়ের মত ওই প্রাকৃতিক গম্বুজটার। এবং আচমকা ব্যাপারটা ধরতে পেরে বিস্ময়ে থমকে গেল সে। তা হলে...তা হলে–ওটার মাথায় বসেই আঁকা হয়েছিল ম্যাপটা!

'এই মরুভূমি কখনও পছন্দ হয়নি আমার,' পাশ থেকে মন্তব্য করল উইলী। 'কিন্তু এখন কি মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে এই জায়গাটার জন্যেই বুঝি আমার জন্ম হয়েছিল!'

লেফটেন্যান্ট সাইমন এগিয়ে এল। 'কাছাকাছি কোথাও পানি পাওয়া যাবে?' জিজ্ঞাসা করল।

'না, সার। মার্ল স্প্রিং-এর আগে আর পানি পড়বে না পথে।' হাঁটার গতি সামান্য বাড়িয়ে দিল ইয়াসীন।

প্রতিঘণ্টায় দশমিনিট বিশ্রাম, এভাবে চলেছে টহলদলটা। শেষের দিকে বাড়িয়ে দিতে হলো বিশ্রামের মাত্রা। তাতেও কুলাচ্ছে না দেখে দুর্ভাবনায় পড়ে গেল ইয়াসীন। অবশেষে চরম ক্লান্তিতে–স্থানকাল ভুলে সবাই বসে পড়তে যাচ্ছিল বালিতে। এমন সময় ভোরের আলো ফুটল পুব আকাশে।

দূরে দেখা যাচ্ছে মার্ল স্প্রিং ফাঁড়ি। পিছনে নুয়ে আছে সেই পাহাড়টা। কিছুটা প[illegible] সারিসারি টিলা আর পাহাড়। সব কিছু আগের মতই আছে।

‘ওই টিলাগুলোর আড়ালে কি থাকতে পারে ওরা?’ লেফটেন্যান্ট জানতে চাইল।

চোখের কোণে জমে যাওয়া লবণ মুছল ও। ‘যে-কোন জায়গায় থাকতে পারে ওরা। এমন কী ওই ফাঁড়ির ভিতরেও। কিন্তু আমাদের এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই, সার।’

নির্বিঘ্নে ফাঁড়ির গেট পর্যন্ত পৌঁছাল ওরা। কেউ দরজা খুলে একটা রাইফেলের নল তাক করল ওদের দিকে। তারপর দেখা গেল রসের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরা মুখটা। ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে চোয়ালে হাত বুলাল ইয়াসীন। শেভ করা দরকার!

দুঃসংবাদ দিয়ে শুরু করল রস। ‘গত সন্ধ্যায় টমাসকে মেরে ফেলেছে ওরা। বড় ভাল লোক ছিল!’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইয়াসীন। ‘কথাটা ওর কবরের উপর লিখে দিও। যে কোন মানুষের জন্যে ওটাই শ্রেষ্ঠ এপিটাফ।’

বেলিন্দা ছুটে এল। বোবা দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। তার কাঁধে হাত রাখল ইয়াসীন। ‘ফিরে এসেছি,’ এটুকু বলেই ভাষা হারিয়ে ফেলল সে। অথচ আরও অনেক কিছু বলার ছিল!

‘সেই কথাই তো ছিল!’ হাসতে হাসতে বলল পাশে দাঁড়ানো ম্যাকহার্ডি। তারপর চুপ মেরে গেল।

‘হয়েছে কী তোমাদের?’ ম্যাকহার্ডিকে জিজ্ঞাসা করল ইয়াসীন। ‘এমন আড়ষ্ট কেন সবাই?’

‘বলব সব। আগে বিশ্রাম দরকার তোমাদের।’ লেফটেন্যান্ট সাইমনের দিকে এগিয়ে গেল সে।

ওর হাতে কফির মগ ধরিয়ে দিয়ে ঘটনাগুলো বলে গেল বেলিন্দা। ‘খাবার ফুরিয়ে এসেছে। এখানে বোঝা হয়ে না থেকে আমাদের চলে যাওয়া উচিত,’ সব শেষে মন্তব্য করল।

ভাবছে ইয়াসীন। স্যামুয়েল আর গ্যারিক মারা গেছে। টমাসও নেই। চারটে ঘোড়া, গোলাবারুদ আর দুর্দিনের সামান্য মজুদের বেশির ভাগ খাবার নিয়ে পালিয়ে গেছে লুইস, ফাউলার আর পাওয়ার। মরতে মরতে বেঁচে ফিরেছে লেফটেন্যান্ট সাইমনের টহলদল। এদিকে মার্ল স্প্রিং-এ অবরুদ্ধ হয়ে অনাহারে মরতে বসেছে সবাই। অথচ এসবের কিছুই জানে না মেজর সাইক।

নাকি আঁচ করতে পেরেছে কিছু? ভেগাস ট্রেইল ধরে ইতিমধ্যে যদি কেউ ক্যাম্পকেডিতে গিয়ে থাকে, তবে কিছু একটা সন্দেহ জাগবে তার মনে। কারণ

ভেগাস ট্রেইল ধরে যাবার কথা ছিল স্টেজ কোচের, অথচ যায়নি। ওদিকে লেফটেন্যান্ট সাইমনও ফোর্ট মোযেভের রাস্তায় টহল দিয়ে ফেরেনি ক্যাম্পে। এ সবকিছুই বিপদ সংকেত হিসাবে নেওয়া উচিত মেজরের।

দুপুরের পর ফাঁড়ির দক্ষিণের সেই মাঠটাতে ঘোড়াগুলোকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল চারজন সৈন্যসহ মোকাটো। সন্ধ্যার আগে তাদের ফিরে আসতে দেখল ইয়াসীন। অথচ ফিরতে পারেনি টমাস। গতকাল সে-ও নাকি অমন ভাবে ঘোড়াগুলোকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল। মৃত্যু সাথে গিয়েছিল তার!

ফিরে আসার সময় মাঠের ওপাশে একটা পাহাড়ী হরিণ দেখতে পায় টমাস। মোকাটোর নিষেধ সত্ত্বেও মাঠটার ওপাশে এগিয়ে যায় সে। খাবার ফুরিয়ে গেছে ফাঁড়ির। বাকি যা ছিল তার অধিকাংশ চুরি করে নিয়ে গেছে ফাউলার। খাবারের চিন্তা করে হরিণটা মারতে গিয়েছিল টমাস।

মোযেভরাও মাঠের ওপাশ থেকে হরিণটাকে দেখে ফেলেছিল। দেখেছিল বোকা টমাসের এগিয়ে আসা। এক ঢিলে দুই পাখি মারতে অসুবিধা হয়নি তাদের। মৃতদেহটা কোনমতে ফাঁড়িতে ফিরিয়ে আনে মোকাটো।

ফ্লেমিংকে দেখতে উত্তর পাশের কেবিনে ঢুকল ইয়াসীন। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে সে। আর ঘামছে দরদর করে। তাকে কয়েকবার ডাকল ও। কিন্তু সাড়া নেই। অবস্থা সুবিধার নয় বোঝা যাচ্ছে।

রসের সাথে আলাপ করছিলেন মিসেস মার্থা ম্যাকডোনাল্ড। 'আমাদের বোধহয় চলে যাওয়া উচিত,' বললেন তিনি। 'রেশন নিঃশেষ হবার পথে। আমরা চলে গেলে মুখের সংখ্যা কমবে এখানে। সৈন্যদের কিছুটা সুবিধা হবে তাতে। আমাদের জন্যেই এতসব ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে সবাইকে।'

'আমিও তাই ভাবছি,' সায় দিল রস। 'সম্ভবত বাধা দেবার চেষ্টা করবে ইন্ডিয়ানরা। তবে একবার সিডার ক্যানিয়ন পার হতে পারলে আর আমাদের ধরতে পারবে না ওরা। ফোর্ট মোযেভে পৌঁছে অন্যপথে ভেগাস স্প্রিং-এ যাওয়া যাবে তখন।'

'তা হলে আজ রাতেই রওনা হওয়া যাক,' মনের ইচ্ছা জানালেন মিসেস ম্যাকডোনাল্ড। 'ওদিকে আমাদের পথ চেয়ে বসে আছে জন।'

সূর্য ডুবেছে বেশ কিছুক্ষণ হলো। সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হয়ে জমতে শুরু করেছে সর্বত্র। ফাঁড়ির বেড়ায় হেলান দিয়ে আকাশে তারা ফোটা দেখছিল সাইমন। ম্যাকহার্ডি এগিয়ে গেল তার কাছে।

'আমাকে ডেকেছেন, সার।'

'হ্যাঁ, সার্জেন্ট। খাবার ফুরিয়ে গেছে, তাই না?'

'এখনও সামান্য অবশিষ্ট আছে, সার।'
'একটা ঘোড়া জবাই করতে পারি আমরা।'
'এখনি তার প্রয়োজন নেই।' মরুভূমিতে এভাবে ঘোড়া হারাতে চায় না ম্যাকহার্ডি...সম্ভবত সাইমনও চায় না।

মোকাটোকে বোঝাতে চেষ্টা করছে বেলিন্দা। 'আমি এবং মার্থাখালা—দুজনেই রাইফেল চালাতে জানি। টমাসের মৃত্যুতে কিছুটা অসুবিধা হবে রসের, কিন্তু আমরা পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করব। তা ছাড়া রাতের আঁধারে ওরা না-ও দেখতে পারে আমাদের।'

'তবু এভাবে যাওয়াটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ হবে আপনাদের জন্যে,' বলল মোকাটো।

'তা হলে কি এখানেই বোঝা হয়ে থাকতে বলেন?'

সহসা উত্তর দিতে পারল না মোকাটো। 'যেতে চাচ্ছেন যান,' অবশেষে বলল সে, 'তবে অফিসারকে অনুরোধ করুন যাতে ইয়াসীন বা ম্যাকহার্ডিকে গার্ড হিসেবে আপনাদের সাথে পাঠায়।'

ঘুমানোর আয়োজন করছিল ইয়াসীন। শেষ রাতে পাহারায় থাকতে হবে তাকে। এমন সময় লেফটেন্যান্ট সাইমনের গলা শোনা গেল কেবিনের দরজায়। বেরিয়ে এল সে।

'মিসেস মার্থা ম্যাকডোনাল্ড চলে যেতে চান। অনেক বোঝালাম আমি, কিন্তু কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না। তুমি কিছু বলবে?'

কিছুক্ষণ ভাবল ইয়াসীন। 'মিসেস ম্যাকডোনাল্ডকে ভালভাবে চিনি আমি, সার। ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেন তিনি এবং অনড় থাকেন তাতে।'

'মোকাটোকে ওদের সাথে পাঠাতে চাই আমি।'

'ইয়েস, সার।'

একটু ইতস্তত করল সাইমন। 'তবে একজন যথেষ্ট নয় ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে। তুমিও যাও না কেন ওদের সাথে? ম্যাকহার্ডি আছে এখানে। আমরা সবাই মিলে সামাল দিতে পারব এদিকটা। কিডকে নিয়ে যেও সাথে।'

'কিড, সার?'

'হ্যাঁ। বউয়ের উপর রাগ করে চলে এসেছে আর্মিতে। ফোর্ট মোযেভের ওদিকটায় ঘুরে এলে হয়তো মনটন হালকা হবে বেচারার।'

'কখন রওনা হতে হবে?'

'আজ রাতেই।'

ক্যাম্পকেডির তপ্ত বিকেল। অফিসে বসে কাজ করছে মেজর সাইক। প্রচণ্ড গরমে

মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সব। শুকনো বাতাসে চোখ জ্বলছে। ঝাঁ ঝাঁ করছে কান। আবার কপালের ঘাম মুছল সে। এবং বিরক্ত হয়ে দেখল, হাতের ঘামে লেপ্টে গেছে সদ্য লেখা রিপোর্টটা।

ক্যাপ্টেন ম্যালেট এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। 'লেফটেন্যান্ট সাইমন এখনও ফেরেনি, সার।' বলল সে।

'ভেগাস স্প্রিং থেকে কোন মেইল এসেছে, ম্যালেট?'

'নো, সার।'

ডেস্কের উপর কলম নামিয়ে রাখল সাইক। গরমে তেতে আছে মেজাজ। কিছু চিন্তা করতেও ভাল লাগছে না। কাউকে বকাঝকা করতে পারলে ভাল লাগত কিছুটা। কিন্তু ম্যালেটের মত অভিজ্ঞ অফিসারকে বিনা কারণে বকা চলে না। তাকে বসতে বলল সাইক।

'ফোর্ট মোয়েভের রাস্তায় টহল দিতে বেরিয়েছিল সাইমন। হতে পারে বিশ্রাম নেবার জন্য মার্ল স্প্রিং বা রকস্প্রিং-এ থেমেছে সে।'

'হতে পারে, সার। আবার না-ও হতে পারে। হয়তো বিপদে পড়েছে–সাহায্য প্রয়োজন।'

'কিন্তু এই মরুভূমিতে কোথায় খুঁজে পাব ওদের!'

'ফোর্ট মোয়েভের রাস্তায় গিয়েছিল সাইমন। ওদিকে–রকস্প্রিং বা ফোর্টপিউট পর্যন্ত দেখে আসতে পারি আমরা। তা ছাড়া মার্ল-স্প্রিং ফাঁড়িটাও পরিদর্শন করে আসা যাবে।'

'ও, কে ম্যালেট, প্রস্তুতি নাও। কাল ভোরে সূর্য ওঠার আগেই রওনা হব আমরা। ফোর্ট পাহউট বা পিউট যাই বলো না কেন শুধু সে পর্যন্ত নয়, প্রয়োজন হলে কলোরাডোর তীর পর্যন্ত যাব আমি। ইন্ডিয়ানদের গ্রামগুলো তছনছ করে দেব।' ডেস্ক ছেড়ে উঠল সাইক।

'তার আগে আর একটা কাজ করতে হবে,' ম্যালেটকে বলল সাইক। 'সিপাহীদের পার্সোনাল ফাইলগুলো একটু দেখে দিতে হবে তোমাকে। আমি কোয়ার্টারে যাচ্ছি।'

চলে গেল মেজর। নতুন সৈন্যদের ফাইল নিয়ে বসল ম্যালেট। ক্যাম্পকেডিতে বদলি সংক্রান্ত নির্দেশাবলী লিখতে হবে তাদের ফাইলে।

ডেস্কে একটা ফাইল আলাদা করে রাখা। সব সিপাহীর ফাইল দেখার পর সেটা টেনে নিল ম্যালেট। ফাইলটা ইয়াসীনের। এখানে আসা অবধি তার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছে সে। ফাইলটা কৌতূহলী করে তুলল তাকে। খুবই যোগ্য লোক ইয়াসীন, সন্দেহ নেই। সার্ভিস রেকর্ডটা দেখা দরকার।

ফাইলটা খুলেই ভ্রূ কুঁচকে গেল ম্যালেটের। একটা ছাড়পত্র। ইয়াসীনের চাকুরীর মেয়াদ শেষ হবার ছাড়পত্র! প্রায় একমাস আগে ইস্যু করা, অথচ এখনও ফাইলবন্দী হয়ে আছে। আর ওদিকে তাকে খাটিয়ে নিচ্ছে মেজর সাইক। এটা অনুচিত...ভাবছে ম্যালেট।

পরদিন ভোরে রওনা হলো সাইক। সাথে ক্যাপ্টেন ম্যালেট, দুই ট্রুপ সৈন্য এবং পর্যাপ্ত রেশন।

মোযেভ নদীর পার ধরে কেভ ক্যানিয়ন পর্যন্ত যাবে ওরা। সেখান থেকে মার্ল স্প্রিং।

বিশ

আকাশে প্রায় পরিপূর্ণ চাঁদ আর তারার দীপালি। বেড়ার কোণে কানাকানি করছে প্রান্তরের হাওয়া। দূরে–আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের সীমারেখা। মার্ল স্প্রিং-এ আসন্ন যাত্রার প্রস্তুতি।

সদ্য পরিষ্কার করা রাইফেল হতে গানঅয়েল-এর ঝাঁঝ এসে লাগছে নাকে। কোথায় যেন একটা ঝিঁঝি ডেকে চলেছে একটানা। সে-শব্দ ছাপিয়ে ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল কিছু। স্টেজ কোচে উঠছে যাত্রীরা।

পুবের বিস্তীর্ণ উপত্যকার দিকে চেয়ে আছে ইয়াসীন। ওটা পার হয়ে সিডার ক্যানিয়নে পৌঁছাবে ওরা। তারপর মিডহিল অতিক্রম করে গভর্নমেন্ট হোল আর রকস্প্রিং। ফোর্ট মোযেভ এখনও অনেক দূরের পথ।

'তুমি কি স্টেজের ভিতরে বসবে?' রস এসে জানতে চাইল।

'না, ঘোড়া নিয়ে যাব আমি।'

'ঠিক আছে–কিড ভিতরে বসুক। আর মোকাটো বসবে আমার পাশে। টমাসের জায়গা ছিল ওটা।'

দক্ষিণ দিকের কেবিনটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল লেফটেন্যান্ট সাইমন। তার দিকে এগিয়ে গেল ও। 'গুডলাক ইয়াসীন,' বলল লেফটেন্যান্ট।

'গুডলাক, সার। আপনাদের এভাবে ছেড়ে যেতে মন টানছে না আমার। যত জলদি পারি ফিরে আসব আমি।'

'খবরদার, না!' ধমকে উঠল সাইমন। 'অনেক করেছ তুমি। চাকুরির মেয়াদ শেষ তোমার। আর ফিরতে হবে না। চলে যেও যতদূর মন চায়। আমি সামলাব

মেজর সাইককে।'

'কিড আর মোকাটো?'

'ওরা পরে ফিরলেও চলবে। আমার মনে হচ্ছে দু'এক দিনের মধ্যেই ক্যাম্পকেডি থেকে কেউ এখানে এসে যাবে।'

'বিদায়, অফিসার,' হাত তুলল ইয়াসীন।

সাইমনের 'বিদায়' কথাটা ঢেকে দিল রসের চাবুক।

চলতে শুরু করল স্টেজ।

আগুয়ান ইয়াসীনকে অনুসরণ করছে স্টেজ। চাকার সামান্য আওয়াজ ছাড়া–কোথাও কোন শব্দ নেই। তবু মুহূর্তগুলো কাটছে সন্দেহ আর শঙ্কায়।

বিস্তীর্ণ উপত্যকার ঢাল বেয়ে নামছে ওরা। এরপর ওপাশের ঢাল বেয়ে কষ্টকর আরোহণ। মাঝামাঝি পৌঁছানোর পর যদি ইন্ডিয়ানরা আক্রমণ করে–উদ্ধার পাওয়া ভীষণ কঠিন হবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর থামল ওরা।

'বিপদ কি কেটে গেছে?' জিজ্ঞাসা করল বেলিন্দা।

'ফোর্টে পৌঁছানোর আগে কাটবে না বিপদ। তবে ফাঁড়ি থেকে বেরোনোর সময় হয়তো ফাঁকি দিতে পেরেছি ওদের।'

'সেটা সম্ভব নয়,' প্রতিবাদ জানাল মোকাটো। 'আসলে স্টেজ লুটের চেয়ে ফাঁড়ি দখল করাটা বেশি লাভজনক মনে করছে ওরা। তা ছাড়া ইন্ডিয়ানরা তোমাকে চিনে গেছে ইয়াসীন। ওরাও চায়, তোমার মত একটা অপকারী জীব যেন ভালয় ভালয় বিদেয় হয়।'

আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক একনাগাড়ে এগিয়ে গেল ওরা। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়েছে কোন সন্দেহজনক শব্দ শোনার আশায়। যোশুয়ার ঝাড়ে বাতাসের গুঞ্জন ছাড়া শোনা যায়নি কিছু। দক্ষিণে বড়বড় কয়েকটা সাদা বালিয়াড়ি গিয়ে মিশেছে আকাশছোঁয়া কালো পাহাড়ে। সামনে মিডহিল পাহাড়ের স্থির ঢেউ।

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। স্টেজের পাশে পিছিয়ে এল ইয়াসীন। 'তিনমাইল উৎরাই বেয়ে চলেছি আমরা।' রসকে বলল সে। 'সামনে সিডার ক্যানিয়ন। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে পার হতে হবে ওই ক্যানিয়ন। বিপজ্জনক জায়গা।'

'আমাদের আগেই কি ওখানে পৌঁছাতে পারে ওরা?' জিজ্ঞাসা করল রস।

'নিশ্চিত বলা যায় না। তবে সিডার ক্যানিয়ন পার হলে সহজে আমাদের নাগাল পাবে না ওরা। গভর্নমেন্ট হোল-এ গিয়ে পানি খাওয়ার জন্য থামতে পারব।

আরও কিছুক্ষণ ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেওয়া হলো। ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যায়। দক্ষিণের পাহাড়ে জোছনার আলো আঁধারি, মসৃণ পাথরে চাঁদের আলো ঠিকরে এসে পড়েছে সাদা বালিয়াড়িগুলোতে। অপূর্ব!

আবার শুরু হলো যাত্রা। সিডার ক্যানিয়নে পৌঁছে পিছিয়ে এল ইয়াসীন। স্টেজের জানালায় বসে চাঁদ দেখছে বেলিন্দা। তার চিবুকে পড়েছে জোছনা। সেই সৌন্দর্য দেখার জন্য জানালাটার পাশাপাশি এগিয়ে চলল সে। সিডার গাছের বুনো গন্ধে মৌমৌ চারদিক।

সামনের পথ, দুপাশের পাহাড় চেপে আসাতে অপ্রশস্ত। সমতল পাথুরে পথে ঘোড়ার ক্ষুরের খটখট শব্দ। অকস্মাৎ যেন আকাশ ভেঙে পড়ল ইয়াসীনের মাথায়। বাজ পড়ার শব্দ! অন্ধকার হয়ে গেল সব।

মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা! চোখ খুলতেই নীল আকাশ দেখল ইয়াসীন। নিজেকে পথের উপর পড়ে থাকতে দেখে অবাক হলো সে। চারদিক জ্বলে যাচ্ছে রোদে!

ধীরে ধীরে মনে পড়ল সব। একটা গুলির শব্দ শুনেছিল সে। বুলেটটা মাথায় লাগাতে সাথে সাথে জ্ঞান হারায়। মাথায় হাত দিল ও। জখম হয়তো ততো মারাত্মক নয়। কিন্তু স্টেজটা কোথায়? কোনমতে উঠে বসল ও। একটু দূরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে কেউ। কোথাও নেই স্টেজ।

শার্টের দুটো পকেটই খোলা। পকেট হাতড়াল ইয়াসীন। ম্যাপটা নেই। অথচ পিস্তল আছে!

মাথার যন্ত্রণা উপেক্ষা করে উঠে দাঁড়াল সে। উপুড় করা দেহটা চিৎ করল। রসের লাশ। দুটো বুলেট লাংস্ কেটে বেরিয়ে গেছে। শার্টে জমাট বেঁধে আছে রক্ত।

স্টেজের চাকার দাগ ধরে এগোনোর চেষ্টা করছে ইয়াসীন। সামনে আরও মৃতদেহ দেখবার আশঙ্কা। মাথাটা ছিঁড়ে পড়তে চাইছে যন্ত্রণায়। শিরাগুলো লাফাচ্ছে দপদপ করে। গলা শুকিয়ে কাঠ। পানির বোতল ছিল জিনের পকেটে। রাইফেল আটকানো ছিল। ঘোড়াটা নেই!

স্টেজের ট্র্যাকের আশেপাশে কতগুলো ঘোড়ার ক্ষুরের ছাপ। একজোড়া বুটের ছাপ একপাশে। কেউ চলন্ত স্টেজ থেকে লাফিয়ে পড়ে–দৌড়ে গেছে ট্র্যাকের পাশে যোশুয়ার ঘন ঝোপগুলোর দিকে। পর্যাপ্ত কভার নয় ঝোপগুলো। কিন্তু অভিজ্ঞ লোকের জন্য যথেষ্ট। মোকাটো হতে পারে...।

স্টেজের ট্র্যাক অনুসরণ করে কোনমতে এগিয়ে চলল ইয়াসীন। মনে মনে একটা হিসাব করার চেষ্টা করছে। তাকে মৃত মনে করে চলে গেছে আক্রমণকারীরা। বেলিন্দা, মার্থাখালা এবং কিডসহ স্টেজ কোচটা নিয়ে গেছে।

তার ম্যাপটা নিয়ে গেছে, অথচ পিস্তল দুটো নেয়নি। হয়তো অস্ত্রের প্রয়োজন নেই তাদের।

তবে কি ইন্ডিয়ানরা নয়? ওরা হলে তো পিস্তল দুটো থাকত না! ঘোড়া ছিল তাদের সাথে। তারমানে তার ঘোড়াটাও হয়তো নিয়ে যায়নি তারা। তবে কি লুইস, পাওয়ার, ফাউলারের দল...নাকি অন্য কেউ?

কিন্তু বেলিন্দা এবং মার্থাখালাকে নিয়ে গেল কেন? অস্ত্র কিংবা ঘোড়ার প্রয়োজন নেই তাদের। অথচ মেয়ে মানুষ সাথে নিয়েছে। আর ভাবতে পারে না ইয়াসীন—কেমন বমি বমি ভাব লাগছে।

দুর্বলতায় কাঁপছে পা। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। চলতে গিয়ে কয়েকবার হোঁচট খেয়ে পড়ল ইয়াসীন। এভাবে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়। গভর্নমেন্ট হোল এখনও পাঁচ মাইলের পথ। পানি আছে সেখানে। কিন্তু এ অবস্থায় অতদূর হাঁটা যাবে না। তবু থামল না ও।

সামনে আবার শুরু হয়েছে মরুভূমি। ওটা পার হয়ে পৌঁছাতে হবে দূরের ওই পাহাড়গুলোতে। ঘোড়াটাকে খুঁজছে ইয়াসীন। কাঁটাঝোপ ঘন হয়ে জন্মেছে মরুভূমির এ অংশে। সবকিছু নিশ্চল। আশেপাশে নেই প্রিয় সাগরেদ!

রোদ এবং বালির কষ্টকর বিরোধিতা উপক্ষো করে কীভাবে যেন প্রান্তরটা পেরিয়ে এল ইয়াসীন! এদিকটায় পাহাড় আর বৃক্ষের ঘন বসত। তার ভিতরে হারিয়ে গেছে স্টেজের ট্র্যাক! একটা খোলা মাঠের মত জায়গায় এসে ডাইনে ঘুরে গেছে স্টেজের চাকার দাগ! কিন্তু দক্ষিণে কোথায় যাবে ওটা?

মাঠের অপর পারে বালিতে কিছুর ছাপ। সেদিকে গেল ইয়াসীন। আবার ফিরে এসেছে স্টেজের ট্র্যাক। পুবে চলে গেছে বরাবরের মত। সম্ভবত দক্ষিণে কোথাও যেতে চেয়েছিল ওরা। পরে মত পাল্টেছে।

আরও একটা পাহাড় পাশ কাটাল ইয়াসীন। সামনের জমিটা ঢালু। ঢালের মাথায় স্টেজটা দেখতে পেল সে। ঘোড়াগুলো নেই।

একটা যোশুয়ার ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ও। দেখে মনে হচ্ছে স্টেজটা পরিত্যক্ত। তবে থাকতেও পারে কেউ কাছাকাছি। সাবধানের মার নেই।

অনেকক্ষণ পরেও স্টেজটার কাছে কোন জনমানুষের সাড়া পাওয়া গেল না। আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ও। পিস্তল হাতে নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। ঠিক গভর্নমেন্ট হোলে পড়ে আছে ওটা।

চারদিক সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে করতে এগিয়ে গেল ও। কেউ কেউ স্টেজটায়, কিছু নেই—কাছে গিয়ে দেখা গেল। এমনকী কোন রক্তের দাগও নয়। মেয়েদের সাথে নিয়ে গেছে ওরা বোঝা যাচ্ছে। কিডকে বোধহয় খুন

করেছে।

ড্রাইভারের সীটের নীচে খাবার আর মেইলব্যাগ রাখার জায়গা। সীটটা সরাল ও। খাবারের ঝুড়িটা নেই। তবে কয়েক টুকরো মাংস আর রুটি পড়ে আছে। হয়তো মার্থাখালা ইচ্ছে করে রেখে গেছেন ওগুলো। পথ হারানো বা বিপদাপন্ন কোন মরুযাত্রীর জন্যে। ওদের কাছে ইয়াসীন এখন মৃত। ঘটনাটায় বড় রকমের চোট পাবেন মার্থাখালা। তাকে নিজের ছেলের মত ভালবাসতেন তিনি।

খাবারগুলো নিল সে। কিছু দূরে রয়েছে গভর্নমেন্ট হোলের পানির উৎস সেই ক্ষীণ ঝর্ণাটা। কয়েক আঁজলা পানি পান করল ইয়াসীন। মাথার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করল। রুমালটা কষে বাঁধল মাথায়। একটু দূরে ঘন হয়ে জন্মেছে একঝোপ ক্যাকটাস। তার আড়ালে গিয়ে বসল।

খাওয়া শেষে আর একটু পানির জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল ও। দুর্বল শরীরে হঠাৎ বসা অবস্থা থেকে দাঁড়ানোর ফলে চক্কর দিয়ে উঠল মগজ। চোখের সামনে হলুদ পর্দা। হাঁটুভেঙে পড়ে গেল সে।

জ্ঞান ফিরতেই চোখে পড়ল চাঁদ! উঠল ইয়াসীন। মাথার যন্ত্রণা আরও বেড়েছে মনে হলো। চমৎকার জোছনা ভরা রাত। ঘোড়াগুলোর পায়ের ছাপ খুঁজতে লাগল সে। অবশেষে পাওয়া গেল তাদের ট্রেইল। দক্ষিণে গেছে ওরা।

বেশ অবাক হলো ও। ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ম্যাপ অনুযায়ী উত্তরে যাবার কথা ওদের। অথচ দক্ষিণে গেছে। তবে কী ইন্ডিয়ানদের খপ্পরে পড়ল বেলিন্দা? ম্যাপটার জন্যে ভাবে না ইয়াসীন। কিন্তু বেলিন্দার জন্য ভাবনা হচ্ছে। মার্থাখালা আছেন। হয়তো কিডও আছে বন্দী অবস্থায়।

দক্ষিণে রওনা হলো ও। ঘোড়াগুলোর ট্রেইল পাথুরে জমিতে হারিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। আবার দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। হাতের বাঁয়ে সারি সারি পাহাড়। সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টার নাম ক্লীফ পাহাড়। ওটার চেপটা চূড়ায় উঠে অঞ্চলটা অনেক দূর পর্যন্ত দেখে নেয়া যায়। যদি কোন ইন্ডিয়ান উঠে থাকে ওখানে, ইয়াসীনকে দেখে ফেলবে সে। রাতে যদি না-ও দেখা যায় আগামীকাল দিনে নির্ঘাত দেখা যাবে। সামনে জমিটা ক্রমেই উঁচুতে উঠছে। প্রায় দুই মাইল দূরে অনুচ্চ টিলার সারি পুব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত। ওটা পার হয়ে আরও দক্ষিণে রয়েছে ব্ল্যাক ক্যানিয়ন। মনে মনে হিসেব করে দেখল ইয়াসীন। দক্ষিণে কেউ যেতে চাইলে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ব্ল্যাক ক্যানিয়ন অবধি তাকে যেতেই হবে। অতএব ওখানে পৌঁছে আবার খুঁজে নেওয়া যাবে–ওদের ট্রেইল।

টিলার সারি পর্যন্ত আসতে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেল সে। বিশ্রাম প্রয়োজন। একটা সিডার গাছের তলায় বিক্ষিপ্ত পাথরখণ্ডের আড়ালে শুয়ে

পড়ল ও।

জেগে উঠতে বেশ বেলা হয়ে গেল। মাথার যন্ত্রণা অনেক কমেছে। শক্তি ফিরে আসছে শরীরে। পানি প্রয়োজন।

একটা টিলার মাথায় উঠে এল ইয়াসীন। সামনে বিশাল নদীর মত একটা উপত্যকা। ভালভাবে এলাকাটা দেখে নিতে হবে।

কাউকে দেখা যাচ্ছে না বিস্তৃত উপত্যকায়। দূরে সারি সারি পাহাড়। এক জায়গায় থমকে গেল ওর দৃষ্টি। নীল আকাশে ওটা কি ধোঁয়ার অস্পষ্ট রেখা? হয়তো ধোঁয়া নয়–দৃষ্টিভ্রম। সহসা কিছু একটা নড়ে উঠল কাছে।

টিলার এপাশে জমি ক্রমশ ঢালু। প্রচুর ঝোপঝাড় আর গাছে ভর্তি। ওর ভিতরে কিছু একটা নড়ে উঠেছে। টিলার মাথায় দ্রুত শুয়ে পড়ল ইয়াসীন। পিস্তল টেনে নিয়েছে কোমর থেকে।

এমন সময় দেখা গেল কালো ঘোড়াটা। সামনে টিলার ঢাল যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে, একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। মন্থর গতিতে হেঁটে চলে যাচ্ছে পুবে। আবার হারিয়ে গেল একটা ঝোপের আড়ালে।

টিলার মাথা থেকে নামতে শুরু করল সে। তাড়াহুড়োয় পা ফস্‌কে সড়সড় করে নামল শেষ কয়েক ফুট।

ঘোড়াটাকে দেখা গেল দূরে। নিশ্চিন্তে হেঁটে যাচ্ছে। জমিতে নানা প্রাণীর চলাচলের চিহ্ন। হরিণ আর নেকড়ের পায়ের চিহ্ন চিনতে পারল ইয়াসীন। বন্যপ্রাণী চলাচলের ফলে একটা ট্রেইল তৈরি হয়েছে এদিকে। সেই ট্রেইল ধরে চলেছে তার ঘোড়া। হয়তো কোন ঝর্ণা আছে সামনে।

জোরে শিস বাজাল সে। থমকে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করল ঘোড়াটা। ওটার কাছে এসে নরম সুরে ডাকল ইয়াসীন। 'সাগরেদ!' তবু ধরতে গেলে দূরে সরে গেল ঘোড়াটা।

এখনও জিন লাগানো ওটার পিঠে। রাইফেলটাও আটকানো আছে জিনে। লাগাম আলগা হয়ে ঝুলছে মাটি অবধি। হয়তো ঘোড়ার কোন প্রয়োজন ছিল না রাতের সেই দুর্বৃত্তদের। কিংবা রাতের আঁধারে পালিয়ে গিয়েছিল কালো ঘোড়াটা।

আবার আস্তে আস্তে কাছে এসে ঘোড়াটার লাগাম ধরতে পারল ও। বাঁ হাত ছোঁয়াল ওটার নাকে। এতক্ষণে তাকে চিনতে পেরেছে ঘোড়াটা।

'ও, কে সাগরেদ।' ওটার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল ও। 'আমিও পানি খাব, চলো।'

ঘোড়ায় চাপল ইয়াসীন।

একুশ

ক্লীফ পাহাড়ের একদম কোলে পাওয়া গেল ঝর্ণাটা। খাড়া পাথুরে দেয়ালের ফাটল হতে পানি চুইয়ে এসে জমা হচ্ছে নীচের ক্ষয়ে যাওয়া জায়গাটায়। জমিতে হরিণ, বুনোকুকুর এবং নেকড়ের আনাগোনার চিহ্ন। বেজি, খরগোস, মেঠো স্কুইরেল আর কোয়েল-এর পায়ের চিহ্নও আছে। ঝর্ণাটা কেবল বন্যপ্রাণীর একচেটিয়া সম্পত্তি। মানুষের আসা যাওয়ার কোনও চিহ্ন নেই।

একটা তরুণ সিডার গাছের মাথায় কিছুক্ষণের চেষ্টায় উঠতে পারল ইয়াসীন। দক্ষিণ দিকটা ভালভাবে দেখে নিতে চায় ও।

সামনে প্রায় চার মাইল প্রশস্ত প্রান্তর। তার ওপাশে কালো ডোরাকাটা একটা লালপাহাড়। ওটার পশ্চিমে আরও অনেকগুলো পাহাড়, কিন্তু পুবদিকে একটা ক্যানিয়ন। ওটাই ব্ল্যাক ক্যানিয়ন। ক্যানিয়নটার পুবে আবার পাহাড়ের সারি।

ব্ল্যাক ক্যানিয়ন ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেলে দেখা যাবে ডানদিকে বেরিয়ে গেছে ওয়াইল্ড হর্স ক্যানিয়ন। আরও দক্ষিণে এগিয়ে ব্ল্যাক ক্যানিয়ন শেষ হয়েছে ওধারের মরুভূমিতে।

কালো ধোঁয়ার রেখা আকাশের গায়ে এখন বেশ স্পষ্ট। সম্ভবত ওয়াইল্ড হর্স ক্যানিয়নে আগুন জ্বালিয়েছে কেউ। গাছ থেকে নামল ইয়াসীন। ঘোড়ার জিনে ঝোলানো বোতল ভরে নিল পানিতে। ঘোড়াটাকে আরও কিছুক্ষণ পানি খাবার সুযোগ দিল। রাইফেল টেনে দেখল, ঠিকমত জিনের খাপ থেকে বেরিয়ে আসছে কি না। ক্লীফ পাহাড়ের খাড়া দেয়াল বাঁয়ে রেখে দক্ষিণের ডোরাকাটা পাহাড়টার দিকে চলল ও।

ক্লীফ পাহাড় হতে একটা উঁচু শৈলশিরা সোজা চলে গেছে সামনের খোলা প্রান্তরে। ক্রমেই উচ্চতা হারিয়ে মিশেছে মরুভূমির বালিতে। চারদিকে ভূমির বন্ধুরতা এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, ঘোড়ায় চড়ে দক্ষিণ দিকে যেতে চাইলে ব্ল্যাক ক্যানিয়ন ছাড়া পথ নেই।

শৈলশিরার শেষে বাঁ দিকে মাইল দুয়েক একটা খোলা প্রাঙ্গণ। সেটা পুবে গিয়ে মিশেছে লেনিফার উপত্যকায়। হাতের ডানে বড়বড় বালিয়াড়ি আর গর্ত-ওলা বন্ধুর মরুভূমি। সামনে, প্রান্তরের ওপাশে ব্ল্যাক ক্যানিয়নের খোলামুখ। ক্যানিয়নটার মুখেই দুপাশে কুতুব মিনারের মত দুটো প্রাকৃতিক স্তম্ভ। উচ্চতায়

প্রায় ছয়শো ফুট। আগাগোড়া সবুজ ঘাসলতায় মোড়া। চমৎকার দৃশ্য।

একদম হাওয়া নেই। তাই দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের কালো ধোঁয়া তর্জনী তুলেছে আকাশে। ফিকে হয়ে আসছে ধোঁয়া। হয়তো খাবার তৈরি করার জন্যে আগুন জ্বালানো হয়েছিল ওখানে। তবে সতর্কতার প্রয়োজন ছিল আগুন জ্বালানোর ব্যাপারে। কারণ দিনের বেলায় অনেক দূর থেকে দেখা যায় ধোঁয়া।

কিংবা সতর্ক হবার প্রয়োজন মনে করেনি ওরা। কারণ রস মারা গেছে, ইয়াসীন নেই। মোকাটো পালিয়ে গেলেও পায়ে হেঁটে এতদূর আসতে পারবে না। ইন্ডিয়ানরা ঘিরে আছে মার্লস্প্রিং ফাঁড়ি। তারাও আসবে না এদিকে।

কিন্তু ইন্ডিয়ান তো দু'চারজন নয়। অন্য কোনও দল দেখে ফেলতে পারে ধোঁয়া। নাকি ইন্ডিয়ানরাই জ্বালিয়েছে আগুন? মৃত্যুর প্রলোভনে ডাকছে কোনও মরু কাফেলাকে?

প্রাকৃতিক স্তম্ভের গোড়ায় এসে থামল ইয়াসীন। একটানা অনেকদূর এসেছে ঘোড়াটা। বিশ্রাম প্রয়োজন। প্রয়োজন সতর্কতার। কারণ ধোঁয়ায় আকৃষ্ট হয়ে আশেপাশের পাহাড়গুলোয় জড়ো হতে পারে ইন্ডিয়ানরা। অথবা তাকে দেখে ফেলতে পারে অন্য কেউ। যে-কোনও ক্ষেত্রে বিপদ অবধারিত।

ফাউলার কী জন্যে এদিকে এসেছে বুঝতে পারছে না ও। সে কী এমন কিছু জানে যা ইয়াসীনের অজানা! ওর জানামতে এদিকে কোনও নদী থাকার কথা নয়। কোনও বড় গুহাও নেই যার ভিতরে একটা নদী হারিয়ে যেতে পারে। তবে মোযেভের পুব অঞ্চলে অনেক বড়বড় গুহা আছে। হয়তো নদীও আছে কোথাও!

ব্ল্যাক ক্যানিয়ন ধরে এগিয়ে চলল ইয়াসীন। জিনের খাপ থেকে রাইফেল টেনে নিতে গিয়েও রেখে দিল। রাইফেলের ব্যারেলে রোদের প্রতিফলন সহজেই ধরা পড়ে শত্রুর চোখে। ফিকে হয়ে আসা ধোঁয়ার রেখাটা এখনও বেশ দূরে। মনে হয় ওয়াইল্ড হর্স ক্যানিয়নের ওমাথায় রয়েছে ওরা।

উত্তেজিত বোধ করছে ইয়াসীন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা শক্ত লড়াই শুরু হবে। তিনজন লড়িয়ে মন্দলোকের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াতে হবে তাকে। ছিনিয়ে আনতে হবে বেলিন্দা আর মার্থাখালাকে। ওয়াইল্ড হর্স ক্যানিয়নের মোড়ে এসে ডানে ঘুরল সে। ব্ল্যাক ক্যানিয়নের প্রশস্ত পথ ছেড়ে ঢুকে পড়ল সংকীর্ণ ওয়াইল্ড হর্স ক্যানিয়নে।

প্রায় আড়াই মাইল লম্বা ওয়াইল্ড হর্স ক্যানিয়ন। তবে বেশ চাপা। ঢুকতেই পথের বাঁয়ে ওয়াইল্ড হর্স মেসা। ক্যানিয়নের পথের পাশ থেকে শুরু হয়ে মেসার ঢালটা উপরে উঠেছে খুবই ধীরে। তারপর অনেক দূরে গিয়ে শেষ হয়েছে সমতল চূড়ায়। বাম পাশের অধিকাংশ পাহাড় একই ধরনের। চূড়া অবধি প্রচুর ঝোপঝাড়

আর সিডার গাছ জন্মেছে পাহাড়গুলোতে। ডাইনের পাহাড়গুলো অন্যরকম। অনেক উঁচুতে খাড়া উঠে গেছে কালচে লাল পাথরের দেয়াল। কোনওরকম সবুজের চিহ্ন নেই ওগুলোয়।

এখানে ওখানে কয়েকটা বাঁক খেয়ে সোজা পশ্চিমে চলে গেছে ওয়াইল্ড হর্স ক্যানিয়ন। শেষ হয়েছে ওপাশের খোলা মরুভূমিতে। বাঁয়ের পাহাড়গুলো সতর্কতার সাথে দেখতে দেখতে চলেছে ইয়াসীন। যে-কোনও সিডার গাছের আড়াল থেকে ছুটে আসতে পারে ঘাতক বুলেট। তবে এখনও বেঁচে আছে ও!

সেই ধোঁয়ার রেখাটা প্রায় মিলিয়ে গেছে। হাওয়া নেই, নইলে আরও আগে মিটে যেত। চলতে চলতে ভুলটা বুঝতে পারল ইয়াসীন। ওয়াইল্ড হর্স ক্যানিয়নে জ্বালানো হয়নি আগুন। এ পথে আসেইনি ওরা। জমিতে অনেকক্ষণ কোনও ট্রেইল দেখেনি সে।

ওয়াইল্ড হর্স ক্যানিয়নের প্রায় শেষ মাথায় চলে এসেছে ও। ওধারে খোলা মরুভূমি। একটা বোল্ডারের কাছে ঘোড়াটাকে দাঁড় করাল ও।

ধোঁয়ার শেষ চিহ্নটুকু এখন রয়েছে বাঁ দিকে অর্থাৎ দক্ষিণে। ক্যানিয়নটার বামধারের শেষ পাহাড়টার ওপাশে। ওখানে কীভাবে গেল ওরা–বুঝতে পারছে না ইয়াসীন। কারণ ক্যানিয়ন ধরে আসেনি ওরা–এটা নিশ্চিত। তবে ওকে ওখানে পৌঁছাতে হলে সামনের খোলা মরুভূমিতে বেরিয়ে যেতে হবে। তারপর মোড় নিতে হবে বাঁয়ে। ভেবে দেখল ইয়াসীন, ওদের চোখ এবং রাইফেল ফাঁকি দিয়ে কোনক্রমেই সম্ভব নয় কাজটা।

তা হলে আর একটা উপায় বাকি থাকে ওদের কাছে যাবার। সোজাসুজি–পাহাড় ডিঙিয়ে ওপাশে যেতে পারে সে। কিন্তু পাহাড়টার উচ্চতা দেখে সেটা প্রায় দুঃসাধ্য মনে হচ্ছে। তা ছাড়া অনেক কষ্ট ও সময় ব্যয় করে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ও হয়তো দেখবে কেউ নেই ওপাশে, বিশ্রাম শেষে চলে গেছে ওরা।

তবু ঘোড়া থেকে নামল ইয়াসীন। বোল্ডারটার গায়ে খুঁটা পুঁতে বাঁধল ওটাকে। এগিয়ে গেল পাহাড়টা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে। হয়তো ওটা টপকে ওপাশে যাওয়া সম্ভব। রাইফেল সাথে নিল না, আরোহণে অসুবিধা হবে ভেবে। উঠতে গিয়ে একটা ফাটল দেখতে পেল ও। বেশ প্রশস্ত। ওটার ভিতর দিয়ে এগোতে শুরু করল।

বেশ কিছুদূর এগিয়েও শেষ হয়নি ফাটলটা। প্রায় সুড়ঙ্গের আকারে আরও সামনে চলে গেছে। মাথার অনেক উপরে একটা সরু সাদা ফিতের মত দেখা যাচ্ছে বাইরের রোদ ঝলমল নীল আকাশ। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঝাঁকাল

গন্ধ। দরদর করে ঘামছে ইয়াসীন, কষ্ট হচ্ছে শ্বাস টেনে উঠাতে। তবু এগিয়ে গেল ও।

এরকম একটা ফাটল কীভাবে তৈরি হতে পারে মাথায় আসছে না। হয়তো পাহাড়টা আগ্নেয়গিরি ছিল কোনওকালে। তপ্ত লাভার স্রোত চূড়া পর্যন্ত না উঠে পাহাড়ের ভিতরটা ঝাঁঝরা করে এপাশ ওপাশ দিয়ে চুইয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। পরে অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ হলে, ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া পাহাড়টা বেশিদিন সইতে পারেনি প্রকৃতির অত্যাচার। এখানে ওখানে ফাটল দেখা দিয়েছে। অতীতের কোনও ভূমিকম্পেও এমন ফাটল তৈরি হওয়া বিচিত্র নয়। পরে হয়তো বাতাস প্রবাহের ফলে ক্রমেই সুড়ঙ্গের আকৃতি নিয়েছে।

তবে যেভাবেই সৃষ্টি হোক, এমন অদ্ভুত পাহাড় জীবনে দেখেনি ইয়াসীন। যেন প্রাগৈতিহাসিক দানবেরা থাকত পাহাড়টার ভিতরে। এখন হয়তো মরু নেকড়ের পাল দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে! যদি তাই হয়...আর ভাবতে পারে না সে। আতঙ্কে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, ঘাড়ের পিছনের চুল খাড়া হয়ে উঠছে।

অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে এগোতে হচ্ছে ওকে। এক জায়গায় ফিকে হয়ে এসেছে অন্ধকার। ফাটলটা এখানে একটা গোল গভীর গর্তের আকৃতি নিয়েছে। থমকে দাঁড়াল ইয়াসীন। মাথার অনেক উপরে এক চিলতে রোদের ঝলক। সামনে তিনদিকে ভাগ হয়ে গেছে পথ। কোন্ পথে যাবে সে!

যদি পথ ভুল হয়, তবে এই গোলক ধাঁধাটা থেকে ইহজনমে আর বেরোতে পারবে না ও। এবং এমন একটা জায়গায় ভুল হওয়া স্বাভাবিক। একবার ফিরে যাবার কথা মনে হলো। একবার মনে হলো বেলিন্দা আর মার্থাখালার কথা। সামনের তিনটে পথের মধ্যেরটা ধরে এগিয়ে চলল ও।

কিছুতেই শেষ হতে চায় না সুড়ঙ্গের মত ফাটল। অসহ্য উৎকণ্ঠায় জর্জরিত ইয়াসীন। হয়তো পথ ভুল হয়েছে তার! মাথার বাঁ পাশের শিরাটা লাফাচ্ছে দপদপ করে। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজানোর চেষ্টা করল ও। ব্যর্থ চেষ্টা। তেষ্টায় হাহাকার করছে বুক।

পথ এখন সুড়ঙ্গের আকৃতি নিয়ে আস্তে আস্তে উঁচুতে উঠছে। ক্রমশ বাঁক ঘুরে উঠতে হচ্ছে তাকে। অনেকটা স্ক্রুর প্যাঁচের মত পাক খেয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে পথ। কী ভীষণ অন্ধকার!

অবশেষে আলোর দেখা মিলল। একটা গর্তের আকার নিয়ে শেষ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। পাহাড়ের এপাশে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

উচ্চকিত হাসি শুনতে পেল ইয়াসীন। গর্ত হতে সবে মাত্র বের হয়েছে সে। ক্লিক করে একটা ধাতব শব্দ শোনা গেল। লুইস! রাইফেল কক করে ট্রিগার

টিপছে। সাথে সাথে পিস্তল বের করে গুলি করল ও। একই সময়ে পরস্পরের দিকে ছুটে গেল দুটো বুলেট। লুইসের বুলেটটা লাগল পাশের বোল্ডারে। ওরটাও মিস্।

বোল্ডারটার আড়ালে ডাইভ দিয়ে পড়ল ইয়াসীন। ভূমি স্পর্শ করার আগে আবার রাইফেল গর্জে উঠল। এবারেও ব্যর্থ হয়েছে লুইস। পাহাড়ের ঢালে অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গা থেকে উঁচুতে গুলি করছে সে। মিস্ করা অস্বাভাবিক নয়।

দ্বিতীয় গুলির আওয়াজ শেষ হতে না হতে–বিক্ষিপ্ত পাথর, লতাঝোপ আর পাহাড়ের ঢালে বেড়ে ওঠা সিডার গাছগুলোর মাঝে হারিয়ে গেল ইয়াসীন।

পিছনে লুইসের ভীত চিৎকার। 'ইয়াসীন! ইয়াসীন এসেছে।'

পাওয়ার চিৎকার করে উঠল আর একটু নীচ থেকে। 'কী হলো, লুইস? এদিকে এসো।'

পাওয়ারের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে আড়ালে আড়ালে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নামতে থাকল ইয়াসীন। যত দ্রুত সম্ভব ওদের কাছে পৌঁছতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে পরিষ্কার শোনা গেল ওদের কথা।

'কী যা তা বলছ?' লুইসকে বলছে ফাউলার। 'ওকে আমি নিজ হাতে খুন করেছি।'

প্রথমে পাওয়ারকে দেখতে পেল ইয়াসীন। বেলিন্দা, মার্থাখালা আর কিডও আছে। পাহাড়ের ঢালে একজায়গায় একটা সমতল তাক তৈরি হয়েছে। সেখানে রয়েছে ওরা।

একটা পাথরখণ্ডের উপরে বসে থাকা পাওয়ারের পিঠ দেখতে পাচ্ছে সে। তার পায়ের কাছে হাতবাঁধা অবস্থায় বসে আছে বেলিন্দা আর মার্থাখালা। পাশে উপুড় হয়ে পড়ে আছে হাত-পা বাঁধা কিড। তার নাকমুখে শুকনো রক্ত দেখতে পেল ইয়াসীন। অদূরে নিভু নিভু আগুনে বসানো একটা কফির পট।

ওপাশের ঝোপগুলোর আড়াল হতে বেরিয়ে এল লুইস আর ফাউলার।

'ইয়াসীনকে দেখেছি আমি!' উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নেড়ে পাওয়ারকে বলছে লুইস।'ওখানে–একটা গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। গুলিটা নির্ঘাত লাগত, কিন্তু র‍্যাটলার সাপের মত ছোবল মেরে কোমরের পিস্তলটা বের করে আনল ও। অত দ্রুত অ্যাকশন জীবনে দেখিনি আমি। আর একটু হলেই গেছিলাম।'

'থামো তো তুমি!' তাকে দাবড়ি দিয়ে থামিয়ে দিল ফাউলার। 'ওই গর্তের মধ্যে কী করে যাবে সে? আমি নিজ হাতে মেরেছি তাকে।'

'কিন্তু নির্ঘাত দেখেছি আমি। মরে গিয়ে থাকলে ইয়াসীনের ভূত এসেছে।'

শ্রাগ করল পাওয়ার। 'আজেবাজে বকো না। খুঁজে দেখো চারদিক। হয়তো অন্য কিছু দেখে থাকবে তুমি। তবে আমার মনে হয় ভয়ে সবকিছু গুলিয়ে ফেলেছ। ফাউলার, তুমি নিজে গিয়ে দেখে আসো সেই গর্তটা।'

'আমি যাব, না তুমি?' পাওয়ারকে শুধাল ফাউলার।

'ইয়াসীনকে তুমি মেরেছিলে। তার ভূতটাকেও তোমারই মারা উচিত।'

রাইফেল বাগিয়ে ধরে ওদিকে চলে গেল লুইস আর ফাউলার।

দুটো পাথরের মাঝখানে আরও একটু ঢিলেঢালা ভাবে বসল ইয়াসীন। প্রায় বিশগজ দূরে এবং উপরে রয়েছে সে। সহজ টার্গেট পাওয়ার। কিন্তু মেয়েরা আহত হতে পারে ভেবে গুলি করছে না ও। হঠাৎ মনে হলো কিড নড়ছে। তবে কি অজ্ঞান নয়!

'কিছুই নেই,' ফিরে এসে বলল ফাউলার। 'হয়তো মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ ওই গর্তটা। ভীষণ গভীর আর অন্ধকার। ওখানে থাকতে পারে না কেউ।'

'কিন্তু আমরা এখানে আর কতক্ষণ থাকব?' তাকে জিজ্ঞাসা করল পাওয়ার।

একটা চুরুট বের করল ফাউলার। যথেষ্ট সময় নিয়ে ধরাল সেটা। ভেবেচিন্তে উত্তর দেবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় নিচ্ছে! ওপাশে বসে পড়ল লুইস।

পাওয়ারকে লক্ষ্য করে একগাল ধোঁয়া ছাড়ল ফাউলার। 'লোগানের নাম শুনেছ?'

'সনোরার সেই দলছুট লোকটাতো? অবশ্যই শুনেছি!'

ইয়াসীনও শুনল নামটা। যথেষ্ট কাছে রয়েছে সে। ওদের প্রতিটা কথা শোনা যাচ্ছে।

'জুলিয়ানের সৎভাই সে,' ব্যাজার কণ্ঠে বলে চলেছে ফাউলার। অন্য ম্যাপটা তার কাছে আছে।'

'অন্য ম্যাপ!'

'ম্যাপ একটাই। মাঝ বরাবর ছিঁড়ে দুই খণ্ড করা হয়েছিল। মৃত্যুশয্যায় ওভাবে দুইখণ্ডে ছিঁড়ে দুই ছেলেকে দিয়েছিল ওদের বাপ। সে কোথায় ম্যাপটা পায়–জানা যায়নি। তবে এদিকে এবং মেক্সিকোয় কেটেছিল তার জীবনের অধিকাংশ সময়। ওই ম্যাপের সাহায্যে সোনার নদীটা সে নাকি খুঁজে পেয়েছিল। একটা বিশাল গুহার মাঝে ঢুকে গেছে সেটা। কিন্তু ইন্ডিয়ানদের তাড়া খেয়ে চলে আসতে বাধ্য হয় সে। পরে মদে বুঁদ হয়ে থাকত সারাক্ষণ। আর সোনা সোনা বলে হাহুতা করত। দ্বিতীয়বার অভিযানে বেরোবার আগেই মারা যায় সে।'

আবার ড়ে উঠল কিড। মাটিতে বুক ঘষে মেয়েদের দিকে যাবার চেষ্টা

করছে। কিন্তু ওরা এখনও দেখেনি ব্যাপারটা। আলাপে মশগুল।

'লোগানের সাথে কতদূর আলাপ হয়েছে তোমার?' ভাগবাটোয়ারা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠছে পাওয়ার।

'তেমন নয়। তবে জুলিয়ানের সাথে সব ব্যাপারে আলাপ হয়েছিল তার। আরও দুজন সঙ্গী নিয়ে আসবে লোগান।'

মনে মনে হাসল ইয়াসীন। ভাল খেল জমেছে এখানে। লোগানের মত কুখ্যাত লোক খুব কমই আছে এ তল্লাটে। মদ মেয়ে মানুষ জুয়া-খুন লুটতরাজ সবকিছুতে সমান অভিজ্ঞ লোকটা। সে যদি আসে তবে তার সঙ্গী হিসাবে হ্যারি আর হাডসনও আসবে। কেউ কারও চেয়ে কম নয়। এবং সবাই হাত পাকিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া সোনার খনিগুলোয়।

'এই বোঝাগুলো কমিয়ে ফেলা উচিত তোমার,' বন্দীদের দিকে ইঙ্গিত করল পাওয়ার।

হ্যা-হ্যা করে কুৎসিত ভাবে হাসল ফাউলার। ঠোঁট চাটল জিভ দিয়ে। 'তোমার কাছে বোঝা হতে পারে কিন্তু আমার কাছে অমৃত। দুজনাই। এক্ষুণি কাজ শুরু করতে চাই আমি। লোগানরা এসে গেলে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে।'

জামার বোতাম খুলে বগল চুলকাল ফাউলার। 'পাওয়ার, তোমরা কি ঘুরে আসবে ওদিক থেকে?'

'আফটার ইউ,' বলে মুচকি হেসে উঠে গেল পাওয়ার।

'ভাগো।' লুইসকে তাড়া লাগাল ফাউলার। সে-ও চলে গেল পাওয়ারের পিছন পিছন।

রাইফেল কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখল ফাউলার। উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙছে। তার দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে বেলিন্দা। 'প্রথমে তুমি,' তাকে বলল।

সময় হয়েছে। এখন গুলি মিস হলে বন্দীদের গায়ে লাগার সম্ভাবনা নেই। কভার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ইয়াসীন। বেল্ট আর প্যান্টের বোতাম খুলছে ফাউলার। 'লী ফাউলার।' নরম সুরে ডাকল ইয়াসীন।

পাঁই করে তার দিকে ঘুরল ফাউলার। বেল্ট বোতাম খুলে ফেলেছিল সে। তাড়াহুড়োয় হাত ফস্কে ঝপ করে হাঁটুর নীচে নেমে গেল প্যান্টটা। উবু হয়ে বেল্টে আটকানো পিস্তলটা তোলার সময় দিল তাকে ইয়াসীন। প্রথম বুলেটটা লাগল তলপেটের সামান্য নীচে। হাঁটু ভেঙে চার হাতপায়ের উপর পড়ল ফাউলার। ইয়াসীনের দ্বিতীয় বুলেটটা ছেঁদা করে দিল ওর হৃৎপিণ্ড।

কিডের কাছে কয়েক লাফে পৌঁছে গেল ও। বুটে আটকানো ছুরি দিয়ে দ্রুত

বাঁধন কেটে দাঁড় করাল তাকে। 'ওদের বাঁধন কেটে ফাউলারের রাইফেলটা নাও!' ওপাশের একটা পাথরের আড়ালে পজিশন নিল ও পাওয়ার আর লুইসকে ঠেকাতে।

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ! একটা বুলেট এসে লাগল সামনের পাথরে। গুলি করল ইয়াসীন।

দ্রুত নির্দেশ পালন করছে কিড। 'ওদিকে চলে যাও তোমরা।' সেই গর্তটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল ইয়াসীন। আবার গুলি। শব্দ লক্ষ্য করে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ল ও। পাহাড়ের নীচ থেকেও ফায়ার আসছে। ঝোপঝাড় ও গাছের জন্যে নীচ পর্যন্ত ভাল দেখা যায় না। সম্ভবত লোগান এসে গেছে। ভালই-ভাবল সে। মাঝখানে পড়েছে লুইস আর পাওয়ার।

কভার ছেড়ে পিছিয়ে এল ইয়াসীন। ফাউলারের পকেটে পাওয়া গেল সেই ম্যাপখানা। সেটা নিয়ে আড়ালে আড়ালে উঠে গেল সেই গর্তটার দিকে। ওদিকে তুমুল ফায়ার শুরু করেছে লোগানের দল।

একটা ঝোপের আড়ালে গুটিশুটি হয়ে বসে আছে কিড, মার্থাখালা আর বেলিন্দা।

'এসো।' গর্তে নামল ওরা।

বাইশ

ভিতরে ভীষণ অন্ধকার। কিছুটা আন্দাজে এগিয়ে চলেছে ইয়াসীন। ঠিক তার পিঠ ঘেঁষে রয়েছে বেলিন্দা। তাড়াহুড়োয় পথ ভুল হবার সমূহ সম্ভাবনা। অথচ হাতে সময় কম। মাথার উপরে মুহুর্মুহু রাইফেলের গর্জন।

পাওয়ারকে নিয়ে বেশি ভাবনা হচ্ছে তার। লোকটা শক্তিশালী ও আত্মবিশ্বাসী। এবং বিপজ্জনক।

ওরা হয়তো নামতে চাইবে না এ গর্তে। বিশেষ করে ঘোড়াগুলোকে ছাড়বে না ওরা। তবে বেরোনোর পথটা আবিষ্কার করতে খুব বেশি সময় লাগবে না ওদের। তারপর?

পিঠের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল বেলিন্দা। হোঁচট খেয়েছে। কী নরম স্পর্শ!

'লেগেছে?' জিজ্ঞাসা করল ইয়াসীন।

'না।'

বেশ কিছুদূর এগিয়ে–দম নিতে থামল ওরা।

'পাহাড়ের ওধারে শেষ হয়েছে এই পথ,' বলল ইয়াসীন। 'তবে ওরা যদি আগে থেকেই জানে এর কথা আর ওপাশের খোলা মুখে পৌঁছে রাইফেল হাতে বসে থাকে, তা হলে কোন দিনই বেরোনো যাবে না। খুব সম্ভব আরও লোকজন এসে জুটেছে ওদের সাথে।'

ফাটলের মত সুড়ঙ্গটা ধরে আবার এগোল ওরা।

ওপাশের খোলামুখ দিয়ে বেরোতেই রোদে ধাঁধিয়ে গেল চোখ। চারদিক নিস্তব্ধ। একটা শকুন নিশ্চিন্তে ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে।

এখনও পাহাড়ের ওধারে আছে পাওয়ারের দল। এপাশে আসতে সময় নেবে তারা।

বেলিন্দা আর মার্থাখালাকে ঘোড়ায় চড়াল ইয়াসীন।

কিড রাইফেল হাতে হেঁটে চলল। খুব বেশিদিন হয়নি তার সৈনিক জীবন। কিন্তু গত কয়েকদিনের ঘটনা যথেষ্ট পাল্টে দিয়েছে তাকে। পলায়ন উদ্যত, কিন্তু নার্ভাস নয়!

ওয়াইল্ড হর্স ক্যানিয়ন ধরে ব্ল্যাক ক্যানিয়নের দিকে ফিরে যাচ্ছে ওরা। পথের বাঁ ধারে এখন রয়েছে পাহাড়ের খাড়া দেয়াল। যদি ক্যানিয়নের দুই মুখ আটকে এগিয়ে আসে শত্রু তবে ডানের ঢালওয়ালা পাহাড়গুলোতে আশ্রয় নিতে হবে। এবং ঘোড়াটা হারানো চলবে না।

বড় শক্ত সঙ্কটে পড়েছে ইয়াসীন। পাওয়ার বা লোগান কেউ কারও চেয়ে কম নয়। সাথে আছে হ্যারি হাডসন আর লুইস। লুইসকে কেমন যেন মানায় না ওদের সাথে। হয়তো অত খারাপ নয় লোকটা।

'ওরা সামনের পথ আটকে দিতে পারে,' বলল কিড।

তার দিকে তাকাল ইয়াসীন। নাকে মুখে এখনও শুকনো রক্ত লেগে আছে। চোখে ভয়। 'উপায় নেই কিড। এগিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। আরও গতি বাড়াও তোমরা। আমি পিছন দিকটা দেখছি।'

'নিজের দিকে খেয়াল রেখো,' ঘোড়ার পিঠে এগিয়ে যেতে যেতে বলল বেলিন্দা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হয়ে গেছে দেখা নেই ওদের। অপ্রশস্ত ক্যানিয়নের এবাঁকে ওবাঁকে গ্রীজ উড আর ক্যাকটাসের ঝোপ। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোটবড় পাথর। লড়াই শুরু হলে কভারের জন্য মন্দ নয় কোনটাই।

বেশ এগিয়ে গেছে কিড মার্থাখালা আর বেলিন্দা। শত্রু যদি পিছন দিক থেকে না এসে সামনে কোথাও পৌঁছে বসে থাকে বিপদে পড়বে মেয়েরা। অথচ

সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না ইয়াসীন। মাটিতে কান পাতল ও।

আসছে ওরা! উঠে সামনের দিকে দৌড় দিল সে। তাকে ছুটে আসতে দেখে থেমে দাঁড়িয়েছে কিড আর কালো ঘোড়াটা।

'আসছে ওরা!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও। 'সামনের খোলামেলা ব্ল্যাক ক্যানিয়নের সুবিধা করতে পারব না আমরা। এখানেই ঠেকাতে হবে ওদের।'

পথের ডানপাশে ওয়াইল্ড হর্স মেসার ক্রমোন্নত ঢাল। নানান ঝোপঝাড় আর সিডার গাছ জন্মেছে সেখানে। ঘোড়া থেকে বেলিন্দা আর মার্থাখালাকে নামাল ও। এক ঢোক পানি খেলো সবাই। ঘোড়াটাকে নিয়ে মেসার ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা।

বেশ উপরে উঠে এল ওরা। সামনের পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় দুটো ঢিবি। ঢিবি দুটো টপকানো অসম্ভব মনে হচ্ছে ইয়াসীনের কাছে। বিশেষ করে মেয়েদের নিয়ে।

'আসছে ওরা!' সতর্ক কণ্ঠ কিডের।

নীচের পথে ওদের পাঁচজনকে দেখা গেল। লোগান আসছে সবার আগে। সবার পিছনে পাওয়ার।

কালো ঘোড়াটাকে কতগুলো সিডার গাছের মাঝে বাঁধল ইয়াসীন। লম্বা ঘাস গজিয়েছে গাছের গোড়ায়। কিছু খাবার পাবে ওটা। জিন থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো খুলে নিল সে। আরও উপরে উঠে এল সবাইকে নিয়ে। ভাল কভার খুঁজছে।

ঝোপ কিংবা গাছের চেয়ে পাথরের আড়ালে পজিশন নেওয়া ভাল। কিন্তু মনমত হলো না কভারটা। দুটো বোল্ডারের মাঝখানে বসতে হবে তাকে। ফিল্ড অভ ফায়ার চেপে আসবে তাতে।

'মোকাটো কোথায়?' জিজ্ঞাসা করলেন মার্থাখালা।

'জানি না সঠিক,' বলল ইয়াসীন।

'আমরা কি কোন সাহায্যে আসতে পারি?'

'ধন্যবাদ, খালা। আপনারা গোলাগুলি থেকে দূরে থাকতে পারলেই সাহায্য করা হবে। কিডকে নিয়ে আর একটু উঠে যান আপনারা। আমি দেখছি এদিকটা।'

পজিশন নিল ইয়াসীন। রাইফেলের নলের উপর দিয়ে ওদের দেখতে পেল সে। মেসার কোলে থামছে। একে একে ঘোড়া হতে নামল সবাই। কোনও তাড়াহুড়ো নেই কারও মধ্যে। বিজয় সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই! প্রশ্ন শুধু সময়ের।

সামনের ঝোপঝাড় আর সিডার গাছগুলোর জন্যে আর দেখা যাচ্ছে না ওদের। অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করল ইয়াসীন। ওরা ঠিক কীভাবে আসছে কে

জানে। পাঁচ পাঁচটা অব্যর্থ রাইফেলের সামনে একা সে নেহাত অপ্রতুল। অনভিজ্ঞ কিড থাকা না থাকা প্রায় সমান। সন্দেহ হলো তার। ভয়ঙ্কর খেলাটাতে এবারে বোধহয় হারতে হবে।

কপালের ঘাম মুছল ও। কী অসহ্য গরম! অনেকদিন পর হঠাৎ মনে পড়ল সেই শ্যামল দেশটার কথা। মনে পড়ল বঙ্গোপসাগরের সেই প্রাণজুড়ানো সজল হাওয়ার কথা। সবচেয়ে প্রিয় পাহাড়টার নাম মনে পড়ল। চিম্বুক!

শীর্ণ মোযেভ নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চলেছে মেজর সাইক। সাথে দুই ট্রুপ অশ্বারোহী সৈন্য ও ক্যাপ্টেন ম্যালেট।

রোদঝলসানো মরুভূমি বরাবরের মত নিথর। মেঘহীন, নিষ্কলুষ আকাশ। ষোলো মাইল সামনে রহস্যময় কেভস্প্রিং। সেখানে প্রথম ক্যাম্প ফেলার কথা ভেবেছে মেজর।

মোযেভ নদীর ক্ষীণধারাটির চেয়েও মন্থর গতিতে কাটছে সময়। মধ্যাহ্ন বিরতির জন্য ক্ষণিক থেমে আবার যাত্রা শুরু হয়েছে নদীর উঁচু পাড় ধরে। অতীতে কোনও এক সময় ভরা যৌবন ছিল নদীটার, বোঝা যায়।

সামনের ধু-ধু মরুভূমি জরিপ করে দেখছে সাইকের সতর্ক দৃষ্টি। একটা সাদা ফোঁটাওয়ালা লাল ঘোড়ায় চড়ে চলেছে সে। বসার ভঙ্গি ঋজু, উদ্ধত এবং অভিজাত।

দ্বিতীয়বার বিশ্রামের সময় ক্যাপ্টেনকে কাছে ডাকল সে। 'শুনেছিলাম যে-কোনও জায়গায় ওত পাততে পারে ওরা। কিন্তু এমন খোলামেলা প্রান্তরে সে সুযোগ কী আছে, ক্যাপ্টেন?'

'যারা অ্যামবুশে অভিজ্ঞ তাদের জন্যে জায়গাটা খোলামেলা নয় সার। আপাতদৃষ্টিতে সমতল মনে হলেও জমি এ অঞ্চলে অল্পবিস্তর উঁচুনিচু। এখানে ওখানে বালিয়াড়ি কিংবা ঢালের চড়াই-উৎরাই। ছড়ানো ছিটানো পাথর আর ঝোপঝাড়ও আছে। প্রায়ই নাকি ভূমিকম্প হয় এদিকে। কয়েক বছর আগে ফোর্ট টেজন একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ভূমিকম্পে। তা ছাড়া মরুভূমিতে পানির অবস্থান অনুযায়ী পথ চলে মানুষ।'

আবার যাত্রা শুরু করল ওরা। পাঁচ মাইল দূরে রয়েছে কেভস্প্রিং। নির্বিঘ্ন যাত্রায় সেটা নিকটবর্তী হতে থাকল ক্রমেই।

প্রায় পাঁচ মাইল লম্বা কেভ ক্যানিয়ন। দুধারে খাড়া পাহাড় সারির উচ্চতা গড়ে ছয়শো ফুট। তার তুলনায় খুদে লিলিপুটদের মত লাগছে মেজর সাইকের দলটাকে।

পাহাড়ের পাথুরে দেয়ালের এখানে ওখানে কবুতরের বাসার মত গর্ত। কিংবা শুকিয়ে যাওয়া পাহাড়ী ঝর্নার ফাটল। কোথাও শুকানো শেওলা। 'জায়গাটা বিপজ্জনক,' মন্তব্য করল ম্যালেট।

'দুজন সৈন্যকে স্কাউট হিসেবে আগে পাঠাও।' নির্দেশ দিল মেজর।

জায়গাটা পছন্দ হয়নি সাইকের। তবু সারাদিন পথ চলে এখানেই থামতে হবে। ক্যানিয়নের ঠিক মুখে একটা বড় বোল্ডারের পাশে দলটাকে থামাল সে।

ঘোড়া থেকে মাটিতে নামছিল মেজর। বালিতে পা ছোঁয়ার আগেই রাইফেলের শব্দ পেল সে। মাটিতে আছড়ে পড়ল তার চমৎকার ঘোড়াটা। পর্যাপ্ত কভারের জন্য দৌড়ে গিয়ে একটা পাথরের আড়ালে শুয়ে পড়ল সাইক।

সমস্ত ক্যানিয়ন জুড়ে রাইফেলের ভৌতিক প্রতিধ্বনি। কোথাও কোনও কিছু নড়ছে না। অথচ ফায়ার আসছে ওদিক থেকে। কাছেই নিঃসাড় পড়ে আছে মৃত ঘোড়াটা। অন্যরা সুবিধামত পজিশন নিয়ে গুলির জবাব দিচ্ছে।

কিছুক্ষণেই গোরস্থানের মত নীরব হয়ে গেল গোটা এলাকা। সন্ধ্যা নামছে।

ম্যালেট সরে এল তার কাছে। 'আমাদের চারজন সৈনিক আহত হয়েছে সার। একটা ঘোড়া মারা পড়েছে।'

'আহত লোকগুলোর আরামের ব্যবস্থা করো। ওরা বোধহয় চলে গেছে,' পড়ে থাকা ঘোড়াটার উপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে বলল সাইক।

দুটো বুলেট ঘোড়াটার পিঠ এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে। আতঙ্কিত বোধ করছে মেজর সাইক। ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে। মাত্র এক সেকেন্ডের ব্যবধানে বেঁচে গেছে সে। ঘোড়া থেকে নামতে যদি আর এক সেকেন্ড দেরি হত, নিতম্ব বা ঊরুতে গুলি লাগত তার।

মরতে ভয় পায় না সে। তবে পাছায় গুলি খেয়ে মরতে চায় না। বীরের মৃত্যু নয় সেটা।

'ভেবে লাভ নেই, সার,' বলল ম্যালেট। 'বাগে পাওয়া যাবে না ওদের। এতক্ষণে উধাও হয়ে গেছে সব।'

'রাত্রের গার্ড দ্বিগুণ করে দাও, ক্যাপ্টেন,' নির্দেশ দিল সাইক।

খাওয়ার মুড নেই। তবু দায়সারা গোছের সাপার খেতে হচ্ছে সাইককে। ইন্ডিয়ানদের সাথে প্রথম মোলাকাত পছন্দ হয়নি তার। লুকোচুরি অপছন্দ করে সে। সামনাসামনি যদি পাওয়া যেত ওদের!

আর কোনও হামলা হলো না। আহত একজনকে খাটিয়ায় বয়ে ক্যাম্পকেডিতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল চারজন। অন্য আহত সৈনিক মারা গেল রাত পোহাবার আগে।

পরের দিন বেলা ওঠার বেশ আগে রওনা দিয়ে–সোডা লেক-এ পৌঁছে গেল মেজর সাইকের দল। কুড়ি মাইল পথের কোথাও কোনও অঘটন ঘটল না।

পরের উনিশ মাইলও কাটল নির্ঝঞ্ঝাটে। অবশেষে আগুয়ান এক স্কাউট ফিরে এসে ব্যতিক্রমী খবরটা দিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা।

'সামনে ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে, সার। সম্ভবত সেদিন ক্যাম্পে যে স্টেজটা থেমেছিল, সেটা।'

'এখানে স্টেজ! অসম্ভব। স্টেজটার ভেগাস স্প্রিং-এ যাবার কথা।'

'ইয়েস, সার। তবে আমার বিশ্বাস সেই স্টেজটাই। সাথে ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছে কেউ। ইয়াসীনের কালো ঘোড়াটা খুব সম্ভব। ওটার ক্ষুরের ছাপ চিনি আমি।'

স্টেজের সাথে ইয়াসীন! সেটা কীভাবে সম্ভব। এমনিতেই প্রচণ্ড রোদ। তার উপর রাগে শরীর জ্বলছে সাইকের। অসহ্য!

বেলিন্দার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যেই ইয়াসীনকে সাইমনের সাথে পাঠিয়েছিল সে। অথচ...তা হলে সম্ভবত ডিউটি ছেড়ে পালিয়েছে ইয়াসীন। বেলিন্দাকে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! রাগে দাঁত পিষল সাইক।

'স্টেজটা কি মার্লস্প্রিং-এর দিকে গেছে?'

'যেতে পারে, সার। ঘোড়াটা কখনও স্টেজের আগে এগিয়েছে–অন্তত কয়েক জায়গায় চাকার দাগ ঘোড়ার ক্ষুরের ছাপ মুছে দিয়েছে দেখে তাই মনে হয়। আবার কখনও স্টেজ ও অশ্বারোহী পাশাপাশি এগিয়েছে। হয়তো ভেগাস ট্রেইলে কোনও ঝামেলা হওয়াতে এদিকে চলে এসেছিল স্টেজটা।'

'হয়তো।' এর বেশি কিছু বলতে পারল না সাইক। নির্দেশ পেয়ে আবার এগিয়ে চলল সৈন্যরা।

রাত্রের বিশ্রামের জন্য ক্যাম্প ফেলা হয়েছে। গার্ড ছাড়া ঘুমাচ্ছে সবাই। অথচ শুয়ে শুয়ে ছটফট করছে মেজর সাইক। ঘুম আসছে না তার কিছুতেই।

ড্যাম ইয়াসীন! ওদের দুজনকে কিছুতেই আলাদা রাখা যাবে না? বেলিন্দার জন্যে কোনও ভাবেই যোগ্য নয় ইয়াসীন। সামান্য একজন সিপাহী লোকটা। বিধাতার অপসৃষ্টি এক কালার্ড নেটিভ।

অপর দিকে রাষ্ট্রদূতের মেয়ে বেলিন্দা। জেনারেলের ভাগ্নী–যদিও রিটায়ার্ড জেনারেল। এযে রীতিমত বামন হয়ে চাঁদে হাত।

বোকা মেয়েটা পটেছে ওই হারামাজাদা সম্পর্কে আজগুবী সব গল্প শুনে। একাধিক আর্মিতে নাকি অফিসার ছিল। কচু ছিল...ঘোড়ার ডিম ছিল! যত্তসব বানোয়াট গল্প।

কাল মার্লস্প্রিং-এ পৌঁছাবে সাইক। ওখানে আছে সবাই। ইয়াসীনকে এমন শাস্তি দেবে সে...।

ভোরে ঘুম ভাঙতেই দুঃসংবাদ শুনল মেজর। দুটো ঘোড়া আর একটা রাইফেল চুরি করে নিয়ে গেছে মোযেভরা। রাইফেলটা নিয়েছে ঘুমন্ত একজন সৈনিকের পাশ থেকে। মাত্র কয়েক গজ দূরে সারারাত দাঁড়িয়েছিল গার্ড!

দুপুরের আগে মার্লস্প্রিং ফাঁড়িটা দেখতে পেল মেজর সাইক। কেমন নিষ্প্রাণ ফাঁড়িটা। যেন ভিতরে নেই কেউ।

আরও কাছে এগিয়েও–ভিতরে মানুষের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

অবশেষে গেটের একদম কাছে পৌঁছালে খুলে গেল সেটা। এক পাশে দাঁড়ানো ম্যাকহার্ডি স্যালুট করল মেজরকে। 'ওয়েলকাম, সার। গত দুদিন যাবৎ অনাহারে আছি আমরা!'

মৃত সৈনিকের ঘোড়া থেকে নামল মেজর। 'লেফটেন্যান্ট সাইমন কি এখানে এসেছিল, সার্জেন্ট?'

'লেফটেন্যান্ট মারা গেছে, সার। সার্জেন্ট ইয়াসীন চলে যাবার পর মোযেভ ইন্ডিয়ানদের আক্রমণের তীব্রতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। মাথায় গুলি খায় লেফটেন্যান্ট।'

'কে চলে যাবার পর?'

'স্টেজ কোচ, সার। তিনজনকে গার্ড হিসেবে পাঠানো হয়েছিল ওটাকে ফোর্ট মোযেভ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। আমার বিশ্বাস এতক্ষণে ওরা পৌঁছে গেছে গন্তব্যে। অত মানুষের খাবার ছিল না এখানে।'

চারজন অসুস্থ সৈনিক শুয়ে আছে কেবিনে। 'ক্যাপ্টেন,' ম্যালেটকে ডাকল মেজর। 'আহতদের খেতে দাও এখনি। আর বাড়তি রেশন বুঝিয়ে দাও সার্জেন্টকে। দুপুরে আমরা বিশ্রাম নেব এখানে।'

'তারপরে কি রওনা হব?' জানতে চাইল ম্যালেট।

'সেটা নির্ভর করছে সার্জেন্টের রিপোর্টের উপর।'

গত দশদিনের ঘটনাবলীর বিস্তারিত মৌখিক রিপোর্ট দিল ম্যাকহার্ডি। ইন্ডিয়ানদের অবরোধ, স্টেজের আগমন, টহলদলের উদ্ধার, লেফটেন্যান্ট সাইমনের মৃত্যু ইত্যাদির বিশদ বর্ণনা দিল।

সব শুনে চিন্তায় পড়ে গেল মেজর। 'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ, স্টেজ কোচের সাথে সার্জেন্ট ইয়াসীনকে যেতে সরাসরি আদেশ দেয়নি লেফটেন্যান্ট সাইমন।'

'দিয়েছিল, সার।'

'নিজের কানে সে আদেশ তুমি শুনেছিলে সার্জেন্ট?'

ইতস্তত করতে লাগল ম্যাকহার্ডি। 'আদেশ দেবার জন্য নির্দিষ্ট শব্দগুলো লেফটেন্যান্টকে বলতে শুনিনি, সার। তবে যা শুনেছি তা আদেশের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। তা ছাড়া এখানে সবাই জানে–'

তাকে হাত তুলে থামাল সাইক। 'সবাই কি জানে না জানে সেটা শুনতে চাই না আমি। সাধারণত ম্যাকহার্ডি, যখন সবাই কিছু কিছু জানে–তখন কেউ আসলে কিছুই জানে না।'

'ইয়েস, সার। তবে সবার মত লেফটেন্যান্টও জানত যে সার্জেন্ট ইয়াসীনের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। তাই তাকে যেতে বলেছিল। কথা ছিল সিপাহী মোকাটো এবং কিড ফিরে আসবে ফোর্ট মোযেভ হতে।'

'লেফটেন্যান্ট সাইমন মৃত। সে সরাসরি ইয়াসীনকে যেতে আদেশ দিয়েছিল কিনা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুপস্থিত। হতে পারে ইয়াসীনই লেফটেন্যান্টকে উল্টোসিধে বুঝিয়েছিল–স্টেজের সাথে যাবার জন্যে।'

'কিন্তু, সার–'

'ইয়েস।'

'কাউকে তো যেতেই হত স্টেজের সাথে। টমাসের মৃত্যুতে একা রসের পক্ষে সবকিছু সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না।'

যুক্তি অগ্রাহ্য করতে না পেরে কিছুটা দমে গেল মেজর। 'সিভিলিয়ানরা ছিল না স্টেজে? পাওয়ার আর সেই ফাউলার?'

'তারা আগেই পালিয়েছিল। সম্ভবত সেই সোনার নদীর সন্ধানে গেছে তারা। সিপাহী লুইসও পালিয়েছে ওদের সাথে। চারটে ঘোড়া চুরি করে নিয়ে গেছে ওরা।'

প্রায় আধঘণ্টা ধরে ম্যাকহার্ডিকে জেরা করল মেজর সাইক। প্রতিটি ব্যাপারে শিওর হওয়া দরকার। কিন্তু স্টেজের সাথে ইয়াসীনের যাওয়াটা কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারল না সে।

ম্যাকহার্ডিকে যেতে বলে ক্যাপ্টেন ম্যালেটকে ডাকল সাইক। 'ম্যালেট, কাল সকালে এ-ট্রুপও টহলদলের কয়েকজনকে নিয়ে ক্যাম্পকেডিতে ফিরে যাব আমি,' বলল সে। 'তুমি রওনা হবে বি-ট্রুপ নিয়ে। যেভাবে পারো ইয়াসীনকে খুঁজে বের করবে। স্টেজের সাথে রয়েছে সে। সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে যাবার অপরাধে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে ক্যাম্পকেডিতে।'

'পালিয়ে যাবার অপরাধ। কিন্তু সবাই বলছে–তাকে নাকি যেতে আদেশ দিয়েছিল লেফটেন্যান্ট সাইমন। তা ছাড়া মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল তার।'

'মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও বৈধ ছাড়পত্র সে এখনও পায়নি। লেফটেন্যান্ট সাইমনের আদেশের ব্যাপারটাও নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ কেউ নিজ কানে শোনেনি সে আদেশ। তা ছাড়াও ম্যাকহার্ডি ইয়াসীনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু!

'কিন্তু—'

'বুঝতে চেষ্টা করো, ক্যাপ্টেন। মিস ব্রাউনের প্রতি অহেতুক দুর্বলতা আছে ইয়াসীনের। ক্যাম্পকেডিতে স্টেজটা পৌঁছাতে অস্থির হয়ে ওঠে সে, এবং উত্তেজনায় মেরে বসে ফাউলারকে। পরে মার্লস্প্রিং-এ একই সাথে উদয় হয় স্টেজ এবং ইয়াসীন। সে-ই নাকি স্টেজটা নিয়ে এসেছিল এখানে। তারপর—এত লোক থাকতে তাকেই আদেশ দেওয়া হয় মার্লস্প্রিং থেকে স্টেজটা পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। সমস্ত ঘটনা কেমন সাজানো মনে হচ্ছে না তোমার? তা ছাড়া ফাউলারের কুখ্যাতির কথা শুনেছ তুমি। তার সাথে কেমন গায়ে পড়ে লাগতে যাবে ইয়াসীন? সে ব্যাপারটাও সাজানো হতে পারে, নয় কী?'

'বুঝেছি, সার।' শীতল কণ্ঠ ক্যাপ্টেন ম্যালেটের। 'এবং আপনি চান—ইয়াসীনকে যেখানে পাই—ধরে নিয়ে আসব আপনার কাছে। হয়তো ফোর্ট মোযেভে পাওয়া যাবে ওদের। স্টেজটা, সার? ওটাও কি ফিরিয়ে আনতে হবে?'

'না। স্টেজটা নিয়ে আমার কোনও মাথা ব্যথা নেই, যদি না ওর ভিতরে...ওটার ব্যাপারে তুমি সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন করেছ, ম্যালেট। ফাউলার আর তার সঙ্গীরা বেরিয়েছে সোনার নদী খুঁজতে। হয়তো ইয়াসীনও গেছে। সোনা বয়ে আনতে স্টেজ কোচটা ব্যবহার করতে পারে সে।'

কেবিনের বাইরে বেরিয়ে এল ম্যালেট। মেজর সাইক মাথা ধরিয়ে দিয়েছে তার। যুক্তি খাড়া করে করে ব্যাপারগুলো কেমন করে প্যাঁচাল করে দিয়েছে! ভাবা দরকার।

সিপাহীরা ঘোড়াগুলোর পরিচর্যা করছে। তাদের তদারকিতে ছিল ম্যাকহার্ডি। ক্যাপ্টেন ম্যালেটকে আসতে দেখল সে।

'কেমন বুঝছ, সার্জেন্ট?'

'নরক, সার। একদম নরক। দেখা যায় না অথচ আছে ইন্ডিয়ানরা। গত কদিন একেবারে চেপে ধরেছিল আমাদের। আপনারা আসায় বেঁচে গেলাম।'

'সার্জেন্ট ইয়াসীন সম্বন্ধে তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'ইয়েস, সার।'

'মানুষ হিসেবে ইয়াসীনকে তোমার কেমন মনে হয়?'

'ইয়াসীন, সার? সেরা! মানুষ কিংবা সৈনিক যে-কোনও হিসাবে। মার্জিত. শিক্ষিত একজন ভদ্রলোক। যে ওর সাথে একবার মিশেছে তাকেই মানতে হবে এ

কথা।

'লেফটেন্যান্ট সাইমনও ছিল ওই ধরনের। কেসলার পাহাড়ের কাছে ইন্ডিয়ানরা ঘিরে রেখেছিল তাকে। এখানে পালিয়ে আসা এক সৈনিকের কাছে খবর পেয়ে ইয়াসীন একা উদ্ধার করে আনে তাদের। নইলে টহলদলের সবাই নির্ঘাত মারা পড়ত।

'এটা যদি বৃটিশ আর্মি হত, ক্যাপ্টেন, যেখানে বহুবছর চাকুরি করেছি আমি–তবে এই মরুভূমিতে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য ইয়াসীনকে কমপক্ষে এক হালি বীরত্ব পদক দিয়ে সম্মানিত করা হত এতদিনে। অথচ এখানে কোর্টমার্শাল-এর খাঁড়া ঝুলছে তার মাথার উপর!'

ক্যাপ্টেন ম্যালেটের দিকে কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে রইল ম্যাকহার্ডি। 'আসলে কি জানেন, সার–কথাটা বলা যদিও বেয়াদবী হয় আমার জন্যে, তবু ওই মেয়েটার কথা না তুলে পারছি না। দেখেশুনে মনে হচ্ছে–মেজর সাইক এবং ইয়াসীন দুজনেই পছন্দ করে মেয়েটাকে। অথচ মিস ব্রাউন ইয়াসীন ছাড়া কাউকে পছন্দ করে না। সেখানেই গণ্ডগোলের সূচনা।'

নিশ্চুপ ক্যাপ্টেন ম্যালেট। বিগত কয়েকদিনে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছে তাকে। একজন অভিজ্ঞ অফিসার হিসাবে সৈনিকদের মনস্তত্ত্ব সে বোঝে। বুঝতে পারে, কখন একজন সৈনিক সত্য কিংবা মিথ্যা কথা বলছে। ম্যাকহার্ডির কথার প্রতিটা অক্ষর সত্য, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

কিছুক্ষণ পর সাঁঝ ঘনাবে। উত্তরের বিস্তীর্ণ উপত্যকায় ঝরাপালকের মত বিছিয়ে আছে কোমল রোদ। দূরে ময়ূরকণ্ঠি পাহাড়ের নীলাভ বিষণ্নতা। প্রভিডেন্স পাহাড়!

জ্বলন্ত চুরুট হাতে খোঁয়াড়ের চারপাশে পায়চারি করছে ক্যাপ্টেন ম্যালেট।

একটা স্টেজ। একজন নারী। ভালয় মন্দয় মিশানো গুটিকয়েক মানুষ। এবং সোনার সেই নদী!

ভাবছে ম্যালেট।

তেইশ

ওয়াইল্ড হর্স মেসায় আটকে পড়া ইয়াসীন জানে না–তাকে অ্যারেস্ট করার জন্য একট্রুপ সৈন্য নিয়ে মার্লস্প্রিং থেকে গভর্নমেন্ট হোলের দিকে রওনা হয়ে গেছে

ক্যাপ্টেন ম্যালেট।

মার্লস্প্রিং থেকে গভর্নমেন্ট হোলে যেতে আঠারো মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে ম্যালেটকে। ইয়াসীনকে কোথায় পাওয়া যাবে, কী অবস্থায় পাওয়া যাবে, জানে না সে-ও। হয়তো স্টেজকোচটা ইতিমধ্যে ফোর্ট মোযেভে পৌঁছে গেছে। কিংবা অতদূর যাবার আগেই আক্রান্ত হয়েছিল ইন্ডিয়ানদের দ্বারা। এসব সম্ভাবনাই ভেবে দেখছে ম্যালেট।

ইয়াসীন জানে পিছু হটতে হটতে তার পিঠ ঠেকে গেছে দেয়ালে। ওদের এড়ানো যাবে না আর। নাটকের শেষ দৃশ্য আসন্ন।

বড় নির্মম এই জীবন নাটক। নিছক দর্শকদের সস্তা বাহবা কুড়োবার সুযোগ করে দিতে আসছে না প্রতিপক্ষ। হত্যা করতে আসছে।

এখানে বেঘোরে মারা পড়ল, কে মারল, কেন মারল–দেখতে আসবে না কেউ। ন্যায় অন্যায় বিচার করতে আসবে না।

ইয়াসীনকে খুন করতে আসেনি লোগান। কয়েকদিন আগে জানত না–এখানে, সোনার নদী খুঁজতে এসে রক্তের নদী অতিক্রম করতে হবে তাকে।

দোষ ইয়াসীনের নয়। দোষ কারও নয়। সবই ভাগ্যের লিখন!

শুধু ম্যাপটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে ভুল করেছে ইয়াসীন। অজান্তে–নিজের মৃত্যু পরোয়ানা পকেটে পুরেছে। তাকে মরতেই হবে। এমনকী ম্যাপটা যদি ভালয় ভালয় দিয়ে দেয়, তবু পরিত্রাণ নেই। কারণ ম্যাপটা দেখে ফেলেছে সে।

দুজন মহিলা এবং দুজন পুরুষ আছে মেসার উপরে কোথাও। যথেষ্ট পানি নেই তাদের সাথে। পাওয়ারের ভাষ্য অনুযায়ী যথেষ্ট বুলেটও নেই, গত কয়েকদিনের গোলাগুলির কারণে। এখানে কেউ আসবে না তাদের সাহায্যে, কেউ জানবে না, ক্যাম্পকেডি থেকে আশি মাইল দূরে, একটা মেসায় আটকে পড়া চারজন হতভাগ্য মানুষের শেষ পরিণতি কী হয়েছিল। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে লোগান। একটা একটা করে খেলে যাবে তুরুপের তাস।

দুই হাত চোঙ-এর মত করে মুখের কাছে তুলে ধরল লোগান। 'ইয়াসীন।' চিৎকার করে বলল, 'তোমার শত্রু ফাউলার মারা গেছে। নীচে নেমে আসতে পারো তুমি। আমরা তোমার শত্রু নই।'

কোন জবাব দিল না ইয়াসীন। ধৈর্য হারাতে শুরু করেছে লোগান! এটা একটা ভাল লক্ষণ।

পশ্চিমে, পাহাড়গুলোর আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে সূর্য। বিপজ্জনক একটা রাত আসছে। তবু মন্দের ভাল সেটা। কারণ অন্ধকারে মেসার আরও উপরে উঠে যেতে পারবে ওরা। তারপর যদি উপরের ওই ঢিবি দুটো পেরিয়ে আরও উঠে

যাওয়া যায়–সহজে তাদের কাবু করতে পারবে না লোগান কিংবা পাওয়ার। ঘুরে বসে উপরের ঢিবি দুটো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল সে।

হয়তো অতিক্রম করা যাবে ঢিবি দুটো। কিন্তু ওপাশে আর কতদূর আছে মেসার কে জানে! ঠিক সমতল চূড়া পর্যন্ত পৌঁছাতে চায় না ইয়াসীন। তবে তার কাছাকাছিই কোথাও মোকাবিলা করতে চায় শত্রুর।

কিডকে ইশারায় কাছে ডাকল ও। 'আরও উপরে উঠে যাও তোমরা। খুঁজে দেখো ঢিবির ওপাশে যাওয়ার রাস্তা আছে কিনা। এ মুহূর্তে আমাদের প্রথম প্রয়োজন পানি। তবে তারও বেশি প্রয়োজন রাত কাটাবার জন্য সুবিধামত একটা জায়গা। অন্ধকারে এখানে আমাদের ঘিরে ফেলতে পারে ওরা।'

বেলিন্দা আর মার্থাখালাকে নিয়ে ঝোপের আড়ালে হারিয়ে গেল কিড। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও চাঁদ দেখা যাচ্ছে না। ওরা জোছনার বাড়তি সুবিধা পাবার আগেই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অবস্থানে সরে যেতে হবে।

একা বসে বসে রাতের শব্দ শুনছে ইয়াসীন। একা না হলে বোঝা যায় না রাতের ভাষা। পাহাড়ে, অরণ্যে কিংবা মরুভূমিতে রাতের নিজস্ব সংলাপ শুনতে হলে চাই একাকীত্ব।

নিশাচর জন্তুর অস্পষ্ট চলাফেরা, রতিবিচলিত পাখিদের ডানা-ঝাপটানো কিংবা পাহাড়ী ঝিঁঝির একটানা কোরাস রচিত রাতের স্বগত সংলাপ এখানে। কোথাও টুক করে গড়িয়ে পড়ে ছোট্ট একটা নুড়ি। জুনিপারের ঝোপে বিষণ্ন সঙ্গীতের মত কেঁদে যায় বাউল বাতাস। পাহাড়ের ঢালে কালো চুলের ঢেউ বিছিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে কথা বলে চলে রাত।

চাঁদ উঠেছে। আর দেরি করা উচিত নয়। পজিশন ছেড়ে উঠল ইয়াসীন।

'সময় মত নড়ে উঠেছ।'

চকিতে পাক খেয়ে একপাশে সরে যাবার সময় কানের কাছে বুলেটের বিস্ফোরণ শুনল ইয়াসীন। বাহুতে গরম ব্যারেলের ছ্যাঁকা লাগল। প্রতিপক্ষের অবস্থান আঁচ করার জন্য ওটুকুই যথেষ্ট। লাট্টুর মত দ্রুত চক্করটা শেষ করে থামল না ইয়াসীন। ডান হাতটা নিজের রাইফেলের ট্রিগার থেকে ব্যারেল-ধরা বাঁ হাতের দিকে সরিয়ে এনে বাঁট দিয়ে সমস্ত গতি ও শক্তি সঞ্চিত আপার কাট মারল লোকটার মুখে। ঠকাস করে দুটো শব্দ শোনা গেল। প্রথমটা রাইফেলের বাঁট ও চোয়ালের সংঘর্ষ, দ্বিতীয়টা পিছনের পাথরের সাথে লোকটার মাথা ঠুকে যাবার বিশ্রী আওয়াজ।

খুব কাছে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। তা হলে ঘিরে ফেলা হয়েছে তাকে! কিন্তু কে কোথায় রয়েছে বিন্দুমাত্র আঁচ করতে না পেরে ঝেড়ে দৌড় দিল সে ঢাল

বেয়ে উপরের দিকে। পিছনে একাধিক রাইফেলের শব্দ। একটা বুলেট এসে ঢুকল ডানদিকে জুনিপারের ঝোপে। আর একটা বুলেট পায়ের কাছে পাথরের চল্টা উঠিয়ে দিল। ডানে বাঁয়ে পাথরখণ্ড, জুনিপার আর ক্যাকটাসের ঝোপ। অনেকটা আন্দাজের উপর সে সব কাটিয়ে বেশ অনেকটা উঠে গেল ইয়াসীন।

অন্ধকার সয়ে এসেছে চোখে। জোছনায় কাছের জিনিস মোটামুটি দেখা যাচ্ছে এখন। তবু দ্রুত উঠতে গিয়ে কোনও গর্তের ভিতরে পড়ে পা মচ্‌কে কিংবা ভেঙে যেতে পারে। দম নেবার জন্যে থামল ইয়াসীন।

বুকের ভিতর লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। দ্রুত দম নিতে নিতে মনে হচ্ছে যেন বাতাস নেই পৃথিবীতে। চোয়াল বেয়ে নামছে নোনা ঘাম। উত্তেজনা আর পরিশ্রমে পায়ের পেশীগুলো থেকে থেকে খিঁচে উঠছে। কিছু নীচে কারও অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। ম্যাচ জ্বালল কেউ।

একদলা থুথু ছিটানোর মত ম্যাচের আগুন নিভিয়ে দিল ইয়াসীনের পিস্তল। সাথে সাথে অবস্থান পাল্টে সরে গেল সে। আবার রাইফেলের গর্জন প্রতিধ্বনি তুলল ক্যানিয়নের বাঁকে বাঁকে।

উঁচু ঢিবি দুটোর কাছাকাছি গিয়ে থামল ইয়াসীন। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে সে। ঠিক তখনি না উঠলে এবং শেষ মুহূর্তে আততায়ী কথা না বললে এতক্ষণে লাশ পড়ে থাকত তার। তবে সে-ও ভালই নিয়েছে একহাত। রাইফেলের বাঁটের বাড়িটায় নির্ঘাত চোয়াল ভেঙেছে লোকটার। অন্তত একমাস হাঁ করতে পারবে না। মারা যাওয়াও বিচিত্র নয়।

কিন্তু কিড গেল কোথায়? 'সীন!' ফিসফিস করে উঠল কেউ একটু দূরের একটা ঝোপের আড়াল থেকে। সেদিকে গেল ইয়াসীন। 'কোনও অসুবিধা হয়নি তো, বেলিন্দা?'

'তোমার কিছু হয়নি তো?'

তাকে আশ্বস্ত করল ইয়াসীন। 'আহ্। ঠিক আছি আমি।'

'রাতের জন্যে একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছি আমরা।'

কিড কাছে এল। 'নীচে গুলির শব্দ পেলাম?'

'একজনকে বসিয়ে দিয়েছি আমি,' বলল ও। 'ঠিক কোন্‌জন বুঝতে পারলাম না, তবে আর একটু হলে আমাকে খতম করে দিয়েছিল আর কী!'

'পাওয়ার?'

'মনে হয় না। সে হলে শেষ মুহূর্তে ওভাবে কথা বলত না। আর নির্ঘাত মারা যেতাম আমি।'

'অলুক্ষুণে কথা বল না তো!' বেলিন্দা ঘনিষ্ঠ হয়ে এল বুকের কাছে।

বেলিন্দার সান্নিধ্য ভাল লাগছে। ভাল লাগছে তার শরীরের ঘ্রাণ। অথচ এখন বিরুদ্ধ সময়!

'তুমি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও, সার্জ,' কিড বলল। 'আমি পাহারায় থাকব।'

'তোমাদের দুজনেরই বিশ্রাম প্রয়োজন। পাহারার ব্যাপারটা বেলিন্দা আর আমার উপর ছেড়ে দিতে পারো,' বললেন মার্থাখালা।

মার ডালো। চিৎকার করে উঠল গফফার খান। সুলাইমানী পাহাড়ের দিকে ঘোড়া ছুটাল একহাজার সীমান্ত শার্দূল। চারদিকে ব্রিটিশ রাইফেলের গর্জন। তরবারি বের করার জন্য কোমরে হাত দিল সে। কিন্তু কোথায় তারবারি! হাতড়াতে গিয়ে ঘুম ভেঙে গেল ইয়াসীনের। উঠে বসে হাঁপাতে লাগল ও। ঘামে ভিজে গেছে সারা দেহ। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। পাশে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে অচেনা এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। বেলিন্দা!

ওপাশে ঘুমিয়ে আছে কিড, আর মার্থাখালা। ফর্সা হয়ে আসছে পুব আকাশ।

'স্বপ্ন দেখছিলে তুমি!' হাসছে বেলিন্দা।

'তেমন কোনও স্বপ্ন নেই আমার। শুধু যুদ্ধ আর রক্তপাত।'

'নারী?'

'না।' নীচের ঢালে তাকাল ইয়াসীন।

উত্তর পুবে রয়েছে ক্লিফ পাহাড়। উত্তরে ঢেউ খেলানো মিডহিল। মার্লস্প্রিং রয়েছে পশ্চিমে ছোটবড় অনেকগুলো পাহাড়ের ওপাশে, প্রায় আঠারো মাইল দূরে।

চেয়ে চেয়ে ইয়াসীনকে দেখছে বেলিন্দা। ভয় লাগছে না তার। ওই লোক পাশে থাকলে ভয়ডর সব কোথায় যেন পালিয়ে যায়।

ওর সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল চীনে। রমণী মোহন এক টগবগে তরুণ। অথচ এখন কেমন আলুথালু, বিধ্বস্ত। অবিন্যস্ত চুল, মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ময়লা ছেঁড়া শার্ট–মলিন বেশ-বাস। চীনের সেই চকচকে অফিসার নয়। তবু ভালবাসার মানুষ। সোনার মানুষ। আনমনে হাসল বেলিন্দা।

'হাসছ যে?'

'ইচ্ছা,' চিবুক হেলিয়ে বলল বেলিন্দা।

'ভয় করছে না?'

'তুমি থাকতে কীসের ভয়!'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হতে কী হয়–বলা যায়?'

'শেষ পর্যন্তের কথা কেউ কী বলতে পারে?'

'চমৎকার!' এরকম কাউকেই ইয়াসীনের প্রয়োজন। 'জীবনের অধিকাংশ

সময় আমি, একটি শেষ পর্যন্তের জন্যে যুদ্ধ করেছি বেলিন্দা। শান্তির জন্য অস্ত্র ধরেছি। কিন্তু তবু তোমার মত নিশ্চিন্তে হাসতে পারিনি কখনও।'

'একদিন হয়তো পারবে।'

'হ্যাঁ, ভয়ভাবনাহীন একটা নিশ্চিন্ত জীবন যদি থাকত–তবে আশা করতে পারতাম। হয়তো জোছনায় হেলান দিয়ে, প্রেয়সীর চোখে পূর্ণিমা দেখতে দেখতে বলতাম, একদিন অনেক, অনেক কিছু পারব। কিন্তু এখানে তা হবার নয়।

'বেলিন্দা–এখানে হাসি মানে প্রতিপক্ষের মৃতদেহের উপরে উন্মত্ত উল্লাস। এখানে আনন্দ মানে অপরকে মেরে নিজে বেঁচে থাকা। শান্তি বুলেট শাসিত এখানে।'

'ওরা আসছে, সীন!'

'আসুক,' রাইফেলে চাপড় মেরে বলে ইয়াসীন। 'ওদের সাথে শান্তি স্থাপনে এটাই একমাত্র শর্ত।'

সূর্য উঠেছে, কিন্তু পুবের উঁচু পাহাড়গুলো ডিঙিয়ে উঁকি দেবার সময় এখনও হয়নি। আরও পিছনে সরে যাওয়া দরকার, নইলে এখানে ঘিরে ফেলতে পারে ওরা। পিছনে পরস্পর সংযুক্ত ঢিবি দুটো এমনভাবে মেসার ঢাল আটকে দাঁড়িয়ে আছে যে, তা টপকানো অসম্ভব। ইয়াসীন যেখানে পজিশন নিয়েছে–সেটা একটা শুকিয়ে যাওয়া নালা। হয়তো মেসার ছাদ থেকে পানি গড়িয়ে এসে জমে ঢাল আটকে দাঁড়িয়ে থাকা ঢিবি দুটোর ওপাশে। তারপর নেমে আসে সরু নালা বেয়ে নীচে। তা হলে এই নালার সরু গলি দিয়ে হয়তো আরও উপরে যাওয়া যাবে।

'বেলিন্দা, দেখে এসো তো–এই শুকনো নালা ধরে ঢিবি দুটো পার হওয়া যায় কিনা?'

গতরাতে একজনকে অচল করে দিয়েছে ইয়াসীন। কিন্তু যারা এখনও সচল তাদের যে কোনও একজনকে সামাল দেওয়াই কঠিন ব্যাপার। এতদিনে হয়তো ক্যাম্পকেডি আন্দাজ করতে পেরেছে কিছু। হয়তো সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে কেউ। কিন্তু তাদের আসা অবধি ঠেকিয়ে রাখা যাবে না শত্রুকে। অবশ্য যদি ঢিবি দুটো পার হয়ে মেসার ছাদ পর্যন্ত যাবার পথ থাকে–তবে চেষ্টা করা যেতে পারে।

কিডকে ঘুম থেকে জাগাল ও। মার্থাখালা উঠলো। 'বেলিন্দা কোথায়?' জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

বেলিন্দা এল। 'সীন উপরের দিকে একটা সরু গলি চলে গেছে। তবে নুড়িপাথরে ভর্তি। আমার মনে হয় ঢিবি দুটোর ওপাশে যাওয়া যাবে ও পথে।'

'সবাইকে নিয়ে চলে যাও ওপথ ধরে,' কিডকে বলল ইয়াসীন। 'ভাল একটা পজিশন বের করে লুকিয়ে থেকো। আমি আসছি একটু পরে।'

মেয়েদের নিয়ে চলে গেল কিড। আরও উঠে এসেছে সূর্য। রোদে ঝলমল করছে ওয়াইল্ড হর্স ক্যানিয়ন।

কিছু নীচে একটা সিডার গাছের আড়াল থেকে একটা হ্যাটের কার্নিস উঁকি দিচ্ছে। গুলি করল না সে। শিওর না হয়ে গুলি করা বোকামি। বুলেট কমে যাবে। প্রতিপক্ষ জেনে যাবে তার সঠিক অবস্থান। যথেষ্ট কাছে চলে এসেছে ওরা।

চারদিকে অনেক ঝোপঝাড়। তার পক্ষে একা সবটা কভার করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে অমন তুখোড় প্রতিপক্ষকে একা সামাল দেওয়া দুঃসাধ্য। সবচেয়ে বেশি ভাবনা হচ্ছে পাওয়ারকে নিয়ে। লোকটা চুপচাপ এবং ভয়ঙ্কর। দেখেই বোঝা যায় প্রচণ্ড শক্তি শরীরে। যে-কোনও বাধা, যে-কোনও প্রতিবন্ধকতা অনায়াসে পার হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে। এমন লোক।

আচমকা গুলির শব্দ! মাথার উপরে ঝুরঝুর করে চূর্ণ পাথর ঝরে পড়ল পিছনের বড় বোল্ডারটার গা থেকে। সামান্য পজিশন পাল্টাল ইয়াসীন। এতক্ষণে হয়তো কিড ওদের নিয়ে পৌঁছে গেছে টিবি দুটোর ওপাশে।

ট্রুপস্ নিয়ে সিডার ক্যানিয়নে পৌঁছে প্রথম হোঁচট খেলো ক্যাপ্টেন ম্যালেট। একটা মৃতদেহ পড়ে আছে পথের উপর। স্টেজ কোচের ড্রাইভার রস! মৃতদেহটা কোনওমতে সমাধিস্থ করল সৈন্যরা। বেলা বাড়ছে।

ওপাশে খানিকটা জমাট বাঁধা রক্ত। কেউ আহত হয়ে পড়েছিল। পরে হেঁটে গেছে গভর্নমেন্ট হোলের দিকে। স্টেজ কোচটাও গেছে ওদিকে। মোটামুটি ট্র্যাকিং জানা আছে ম্যালেটের। জুতোর ছাপটা চেনা চেনা লাগছে। কে হতে পারে আহত লোকটা? ইয়াসীন নয়তো?

কিন্তু স্টেজকোচটা কারা হাইজ্যাক করল! পথের ধুলায় একাধিক ঘোড়ার ক্ষুরের ছাপ। রসকে মেরে ফেলা হয়েছে। খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে আরও একজনকে। অথচ অন্যদের ধরে নিয়ে গেছে। মোযেভ ইন্ডিয়ানরা তো কাউকে ধরে নেয়ায় আগ্রহী নয়! তারা শত্রুকে মেরে রেখে যেতেই অভ্যস্ত। তা হলে কারা ধরে নিয়ে গেছে ওদের। কী উদ্দেশে?

স্টেজ কোচের ট্র্যাক ধরে গভর্নমেন্ট হোলে পৌঁছে দ্বিতীয়বার হোঁচট খেলো ম্যালেট। পরিত্যক্ত স্টেজ আর আহত মোকাটোকে পাওয়া গেল সেখানে। পায়ে গুলি খেয়েছে।

একঢোক পানি আর হুইস্কি খাবার পরে কিছুটা শক্তি ফিরে পেল মোকাটো। সবিস্তারে বর্ণনা দিল স্টেজ কোচটা আক্রান্ত হওয়ার।

'চলন্ত স্টেজ থেকে লাফিয়ে পড়ার সময় পায়ে গুলি লাগে আমার। তবু

ওদের ট্র্যাক ধরে এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি। এখান থেকে দক্ষিণে গেছে ওরা। ট্র্যাক দেখে মনে হচ্ছে–ইয়াসীন পায়ে হেঁটে অনুসরণ করছে ওদের।'

একটা ঘোড়ার পিঠে তুলে নেওয়া হলো মোকাটোকে। দলসহ দক্ষিণে রওনা হলো ক্যাপ্টেন ম্যালেট।

চব্বিশ

ওয়াইল্ড হর্স মেসার কোলের কাছে সিডারের ছায়ায় বসে আছে পাওয়ার। পকেট থেকে তামাকের একটা গুলি বের করে চিবাতে লাগল সে। লোগানরা ইয়াসীনকে অনুসরণ করে উঠে গেছে মেসার উপরে। তাকেও যেতে বলেছিল, কিন্তু যায়নি ও। এতদিনে ইয়াসীন নামের ওই ভয়ঙ্কর লোকটাকে চেনা হয়ে গেছে। ওকে অনুসরণ করা আর অহেতুক প্রাণের ঝুঁকি নেওয়া এক কথা।

উপর থেকে গুলির শব্দ শোনা গেল। আনমনে মাথা নাড়ে পাওয়ার। ওভাবে হবে না। বরং অনুসরণ করতে গিয়ে মারা পড়তে পারে লোগান। পিস্তলে ইয়াসীন ইস্কাপনের টেক্কার মত তুখোড়।

ইয়াসীনের কৌশল বুঝে গেছে পাওয়ার। বাধা দিতে দিতে মেসার টেবিলের মত চূড়ায় পৌঁছে যাবে। প্রচুর সিডার গাছ আর ঝোপঝাড়ের কভার পাবে সে। প্রথমে ওই টসটসে আপেল, ওই বুড়ী আর ছোকরাটাকে পাঠাবে। তারপর নিজে উঠবে। ছুঁড়িটার জন্যে বুকের ভিতরটা খচখচ করছে এখন। বোকা লুইস ছিল ফাউলারের দলে। নইলে সে-ই চান্স নিত সবার আগে। তবু ফাউলারের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে চেয়েছিল–ওই মেয়েটার সম্পর্কে বাজে মন্তব্য ছুঁড়ে। কিন্তু তর সইল না শুয়োরটার। ওরকম টসটসে মাল দেখলে কেউই মাথা ঠিক রাখতে পারে না। ইয়াসীনকে ভীষণ হিংসে হলো পাওয়ারের।

ছুঁড়িটাকে তো পটিয়েছে–ম্যাপটাও নিয়ে গেছে ফাউলারের পকেট থেকে। একদলা থুথু ফেলে উঠে দাঁড়াল পাওয়ার। লোগানের সাথে বোঝা-পড়ার জন্যে ম্যাপটা অত্যাবশ্যক। আর মেয়েটা? সে তো ম্যাপের চেয়েও দামী। হ্যাঁ দুটোই চাই তার। যে-কোনও উপায়ে।

মেসার এই ধারটা ঢালু। কিন্তু বিপরীত দিকটা খাড়া দেয়ালের মত সোজা উঠে গেছে চূড়া অবধি। ওদিক দিয়ে শত্রুর আগমন অপ্রত্যাশিত। খাড়া ছয়শো ফুট কেউ উঠে যেতে পারে, অসম্ভব মনে হবে ইয়াসীনের কাছে। কিন্তু সেই

অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করবে সে।

ঘোড়ায় চড়ল পাওয়ার। ওয়াইল্ড হর্সক্যানিয়ন থেকে রওনা হলো ব্ল্যাক ক্যানিয়নের দিকে। দুই ক্যানিয়নের মোড়ে রয়েছে ওয়াইল্ড হর্স মেসা। মেসার খাড়া দেয়ালটা ব্ল্যাক ক্যানিয়নের দিকে।

ব্ল্যাক ক্যানিয়নে পৌঁছে মেসার খাড়া দেয়ালের কোলে ঘোড়াটাকে দাঁড় করাল পাওয়ার। চাইল উপরের দিকে। ওরে বাপ! অত উঁচুতে কি ওঠা সম্ভব? দেয়ালটা পরীক্ষা করে দেখল সে। এখানে ওখানে বেরিয়ে আছে চোখা পাথর। কোথাও ছোট ছোট খাঁজ, কোথাও ঝুলে থাকা গাছের শিকড়। ওসব অবলম্বন করে ছয়শো ফুট উঠলে মেসার মাথায় পৌঁছানো যাবে। হাল ছেড়ে দিচ্ছিল পাওয়ার। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে পড়ল টসটসে আপেলটার কথা। অমন মাপা বুক আর পাছাওয়ালা মাল পাওয়ারের চোখে পড়েনি আর। নাহ্–জান বাজি, তবু ছাড়া যাবে না ওই মাল। রাইফেলটা কাঁধে লটকে, ঝুলতে ঝুলতে উঠতে শুরু করল পাওয়ার।

মেসার সমতল ছাদে পৌঁছে গেছে বেলিন্দা আর মার্থাখালা। কিডও এসে যাবে। নীচের ঢালে রয়েছে ইয়াসীন। সে-ও আসবে। তারপর? এদিকের খাড়া দেয়াল বেয়ে নামা অসম্ভব। তবে প্রচুর ঝোপঝাড় আর সিডার গাছ জন্মেছে মেসার ছাদে। লুকানোর জন্যে একটা সুবিধামত জায়গা খুঁজতে যাচ্ছিল। এমন সময় পাওয়ারকে দেখল বেলিন্দা। কিনারার কাছের একসারি সিডার গাছের আড়াল থেকে সরাসরি তার দিকে আসছে! বিস্ময়ে থমকে গেল সে।

'হ্যাল্লো, ডার্লিং–তোমাকে পাবার জন্যেই এত কষ্ট করে এসেছি আমি। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসো এদিকে। দুজনেই। যেতে হবে আমার সাথে।'

কিন্তু বেলিন্দা বা মার্থাখালা কেউই নড়ল না। কিছুটা অবাক হলো পাওয়ার। সাহস আছে বটে।

ইয়াসীনের একটা কথা মনে পড়ল বেলিন্দার।–যে তোমার দিকে বন্দুক ধরে আছে তার সাথে কোথাও যেও না। কারণ সে ক্ষতি করার জন্যেই তোমার সুবিধামত স্থানে নিয়ে যেতে চায়। তারচেয়ে যেখানে আছ সেখানেই তুমি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

'কী ব্যাপার নড়ছ না যে?' ধমকে উঠল পাওয়ার। 'চালাকি করার চিন্তা করে কোনও লাভ নেই। সামান্য বেতাল দেখলে গুলি করব আমি। এবং মারলে দুজনকেই মারব।'

'আর হাঁটতে পারছি না,' শান্ত ভাবে বলল বেলিন্দা। 'মেসার ঢাল বেয়ে সারাটা পথ হেঁটে আসতে হয়েছে আমাকে।'

কাছে এগিয়ে এল পাওয়ার। লোলুপ দৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছে বেলিন্দার দেহের ভাঁজগুলো। ফিগার বটে একখানা। কাপড় খুললে মাথা ঘুরে যাবে, মাইরি। অথচ সামান্য অসতর্ক হলে পাঁজরে ছুরি ঢুকিয়ে দেবে নিমেষে।

রাইফেলের বাঁট দিয়ে বেলিন্দার পিঠে গুঁতো দিল সে। 'হাঁটো–নইলে মাথা গুঁড়ো করে দেব।'

হাঁটতে শুরু করল বেলিন্দা। মার্থাখালাও চললেন সাথে।

'আরে–এই!' পিছনে কিডের গলা।

ঘুরেই গুলি করল পাওয়ার। কুঁজো হয়ে গেল কিডের দেহ। তখনও রাইফেল ধরা হাতে। আবার গুলি করল পাওয়ার। পড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ ছটফট করল কিড। তারপর স্থির হয়ে গেল।

পিছনে ফিরল পাওয়ার। নেই! উধাও হয়েছে মেয়েরা। চারপাশে ঝোপঝাড় আর সারিসারি সিডার গাছ। ভাল ল্যাঠা তো! কিন্তু কতক্ষণ আর লুকিয়ে থাকতে পারবে ওর চোখ ফাঁকি দিয়ে। এমন সময় ঢালের দিক থেকে আওয়াজ ভেসে এল।

উপরে গুলির আওয়াজ চমকে দিয়েছে ইয়াসীনকে। পরপর দুটো গুলি হয়েছে। তবে কি বিপদে পড়ল ওরা! সামনের ঝোপঝাড়গুলো তীক্ষ্ণ চোখে আর একবার দেখে নিল সে। কেউ নেই। শুকনো নালাটার মুখের কাছে পজিশন নিয়ে শুয়ে আছে সে। উপরে যাবার জন্যে উঠে দৌড় দিতেই কে যেন চেঁচিয়ে উঠল–হল্ট!

থেমে গেল ইয়াসীন। আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। এত কাছে এগিয়ে এসেছে ওরা, ভাবা যায়নি। ঠিক তার সামনে একটা পাথরের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে তাক করে ধরা রাইফেল হাতে লোগান। ডান দিকে রয়েছে অচেনা এক লোক। হাতের বাঁয়ে লুইস। তিনদিক থেকে ঘিরে ধরা হয়েছে তাকে!

'সিপাহী, লুইস!' দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতালব্ধ অফিসার সুলভ কর্তৃত্ব আর আদেশ ফুটে উঠল ইয়াসীনের কণ্ঠে। 'ওই লোকটা,'–হাতের ডানে অচেনা লোকটার দিকে আঙুল তুলল ও। 'যদি বিন্দুমাত্র নড়ে, গুলি করবে।'

'ইয়েস, সার।' ঘুরে গেল লুইসের রাইফেল।

'এই গাধা!' চেঁচিয়ে উঠল হাডসন। 'রাইফেল ওদিকে ঘোরাও। ওকে মারতেই তো এসেছি আমরা।'

'সিপাহী, লুইস!' আদেশ করল ইয়াসীন। 'আর্মি থেকে পালাওনি তুমি–আমি সাক্ষী দেব। আমারই নির্দেশে টহলে বেরিয়েছিলে শুধু। এবং এখন যদি ভুল না করো–তোমাকে কর্পোরাল বানানোর সব দায়িত্ব আমার।'

'এই, ইডিয়ট!' এবারে ধমকে উঠল লোগান। 'কার দলে তুমি ভেবে দেখেছ?'

কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারল না লুইস। এই বাজে লোকগুলোকে পছন্দ হয়নি তার। এ কয়দিন ফৌজী জীবন থেকেও কষ্ট করতে হয়েছে তাকে। ওরা পেট ভরে খেতে দেয়নি। এমন কী মানুষের মত ব্যবহার পর্যন্ত তার সাথে করেনি। যেন ওদের কেনা গোলাম।

অথচ সার্জেন্ট ইয়াসীন? কোনদিন একটা খারাপ গালি দেয়নি তাকে। অত চৌকস একজন ফাইটার, অতীতের একজন জাঁদরেল অফিসার–তাকে কিনা কর্পোরাল বানানোর দায়িত্ব নিয়ে নিল। নাহ্–অনেক ভুল হয়েছে, কিন্তু আর ভুল করবে না লুইস।

'ইয়েস, সার। আমাকে টহলে পাঠানো হয়েছিল। ভুল হবে না আমার।'

'ইউ ব্লাডি বাগার...' প্রচণ্ড ক্রোধে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল লোগান। তার রাইফেল ঘুরে গেল লুইসের দিকে। অথচ টার্গেট হওয়া উচিত ছিল ইয়াসীন! জীবনের সবচেয়ে বেশি সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে–রাগের মাথায় সবচেয়ে বড় ভুলটা করল লোগান।

ইয়াসীনের বুলেটটা হাতুড়ির আঘাত হানল তার বুকে। শেষ মুহূর্তে ভুলটা ধরতে পারল লোগান। কিন্তু সময় শেষ। আঁধার হয়ে আসছে সব।

তিনজনই মৃত। হাডসন আর লুইস মারা গেছে পরস্পরের গুলিতে। এখন বাকি শুধু পাওয়ার। লোগানের পকেট হাতড়ে একটা ম্যাপ পেল ইয়াসীন। সেটা নিয়ে শুকনো নালা বেয়ে উপরের দিকে দৌড় দিল সে। লুইসের কথা মনে পড়ল একবার। খারাপ ছিল না লোকটা।

মেয়েলোক দুজনকে খুঁজতে খুঁজতে মেসার খাড়া কিনারে চলে এল পাওয়ার। গেল কোথায়! নীচে গুলির শব্দ হয়েছে। ইয়াসীনকে যদি সাবাড় করে দিয়ে থাকে লোগান, তা হলে চিন্তার কোন কারণ নেই। ওদের খুঁজে পাওয়া যাবে ঠিকই।

কিন্তু ওকী! মেসার খাড়া কিনারে দাঁড়িয়ে চমকে উঠল পাওয়ার। বেশ দূরে, ব্লাকক্যানিয়নের উত্তরের মরুভূমিতে অশ্বারোহী একদল সৈন্য। এদিকেই আসছে! সম্ভবত ওরাও শুনতে পেয়েছে গুলির শব্দ!

ভীষণ মুষড়ে পড়ল পাওয়ার। কিছুক্ষণের মধ্যেই সৈন্যরা এসে পড়বে মেসার কাছে। ঢাল বেয়ে উঠে আসবে এখানে। এবারে তার কোনও আশাই পূরণ হলো না।

মেসার ঢালটা প্রায় দুই মাইল লম্বা। তারপর ছাদের মত এই চূড়া। এ পর্যন্ত আসতে অনেক সময় নেবে সৈন্যরা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল পাওয়ার। আবার ঝুঁকি

নেবে সে। যে পথে উঠে এসেছিল সেই খাড়া দেয়াল বেয়ে নেমে যাবে। নীচে দাঁড়িয়ে আছে তার ঘোড়া। ওটা নিয়ে পালিয়ে যাবে ওই প্রভিডেন্স পাহাড়ের ওদিকে। এ অঞ্চলটা চেনা আছে তার। ঘোড়া চুরির সূত্রে সম্পর্ক আছে ইন্ডিয়ানদের সাথে। পানি কিংবা খাবার–কোনটাই সমস্যা হবে না।

'নোড়ো না।' ঠিক কানের কাছে শোনা গেল ইয়াসীনের গলা। পিঠে ঠেকে আছে রাইফেলের নল। 'রাইফেলটা নীচে ফেলে দাও।'

রাইফেল ফেলে দিল পাওয়ার। পিঠ থেকে সরে গেল রাইফেলের নল। 'ঘোরো এদিকে।' পিছন থেকে বলল ইয়াসীন।'

ঘুরে দাঁড়াল পাওয়ার। আদি ও অকৃত্রিম সেই ইয়াসীন। 'মরেনি হারামীর বাচ্চাটা। মাথায় রুমাল বাঁধা। পকেটের কাছটা ফুলে আছে। সম্ভবত দুটো ম্যাপই বানিয়েছে।'

'নো ট্রিকস, পাওয়ার। বসো ওখানে।' নির্দেশ দিল ইয়াসীন। 'হাত দুটো তুলে রাখবে মাথার উপর।'

ওভাবে বসালে লোকটাকে বাঁধতে সুবিধা হবে ওর। তারপর খুঁজে বের করতে হবে মার্থাখালা আর বেলিন্দাকে।

বসার জন্য নুয়ে পড়েছিল পাওয়ার। আচমকা বুটের খাপ হতে ছুরি টেনে নিয়ে কব্জির ঝাঁকিতে ছুঁড়ে মারল সে। চট করে কাৎ হয়ে ঝিকিয়ে ওঠা ছুরিটা এড়াল ইয়াসীন। ট্রিগার টিপেছিল সাথে সাথে। ক্লিক করে শব্দ হলো শুধু। গুলি নেই রাইফেলে।

এতবড় ভুল। রাইফেলের গুলি ফুরিয়ে গেছে কিনা চেক করেনি! বোল্ট টেনে ফাঁকা চেম্বারটা আবার পরীক্ষা করতে যাচ্ছিল। তাকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল পাওয়ার।

প্রচণ্ড সংঘর্ষে ছিটকে মাটিতে পড়ল ইয়াসীন। ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে। হাত থেকে ছুটে গেছে রাইফেল। মাথার ক্ষতে ভীষণ যন্ত্রণা। তবু টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে। উঠে দাঁড়িয়েছে পাওয়ার। কারও হাতে কিছু নেই।

দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল পাওয়ার! এবার? খালি হাতে লড়াইয়ে তো সেই জিতবে। ছেলেবেলা থেকে অনেক বক্সিং লড়েছে সে। চার বছরের বড় ভাইয়ের সাথে কিংবা পাড়ার দুর্দান্ত ছেলেগুলোর সাথে। তারপর কাউবয়, খনিশ্রমিক, জুয়াড়ী, ঘোড়াচোর হতে শুরু করে শহরের নামীদামী বক্সারদের সাথেও লড়তে হয়েছে তাকে। কিন্তু হার হয়নি কখনও। এবারেও হবে না। প্রতিপক্ষকে পিস্তল বের করার সময় না দিলেই হলো। মারতে মারতে পাহাড়ের

কিনারে নিয়ে ইয়াসীনকে নীচে ফেলে দিতে হবে। তারপর নীচে নেমে ম্যাপ নিয়েই পগার পার। আবার তেড়ে গেল সে।

বাম হাতে হুক করল ইয়াসীন। লেগেছে ঘুসিটা। কিন্তু পাওয়ারের ঘুসি পেটে লাগতেই জিভ্ বেরিয়ে গেল তার। কী অসম্ভ। শক্তিধর লোকটা! উচ্চতায় তার চেয়ে সামান্য কম। কিন্তু পেশল শরীরে বাইসনের শক্তি। হাসছে!

আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল পাওয়ার। নিচু হয়ে ঘুসিটা এড়িয়ে ডান কাঁধ দিয়ে তার পেটে গুঁতো মারল ইয়াসীন। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল পাওয়ার, তার বুকের উপর পড়ল ইয়াসীন। মেসার কিনারে রয়ে গেছে ওরা। ছয়শো ফুট নীচে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে।

বুকের উপর চেপে বসে, দমাদম দুতিনটে ঘুসি মেরে পাওয়ারের নাক ফাটিয়ে দিল ও। তার চোখ দুটো অন্ধ করে দেবার জন্য ঈগলের মত নখওয়ালা আঙুল বাড়াল পাওয়ার। মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে রেখেও রক্ষা নেই। চোয়ালের মাংসে নখ ঢুকিয়ে দিয়েছে পাওয়ার। ঘামের নুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল ক্ষতটা।

পা দুটো ঘুরিয়ে এনে পাওয়ারের গলা পেঁচিয়ে ধরল ইয়াসীন। সাথে সাথে তার গলাও পেঁচিয়ে ধরল অক্টোপাসের মত একজোড়া পা। পাওয়ারের শরীরের উপর চিৎ হয়ে পড়ল সে। গড়াচ্ছে দুজন। মেসার একেবারে কিনারে চলে এসেছে। তাই বাধ্য হয়ে থামতে হলো। পায়ের চাপ বাড়াল ইয়াসীন। হাঁটুর নীচে কাফমাস্‌লে কামড় বসাল পাওয়ার। পায়ের বাঁধন সামান্য আলগা করে দিয়েছে।

পায়ে আটকানো সিজারলক ছেড়ে দিল ইয়াসীন। উল্টো ডিগবাজি খেয়ে বেরিয়ে এল পাওয়ারের পায়ের ফাঁক গলে। সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়েছে পাওয়ারও।

তার চোয়াল লক্ষ্য করে আপার কাট্ মারল ইয়াসীন। নিজেও খেলো একটা। বেশ কিছুক্ষণ কাটল এমনি ঘুসি-পাল্টা ঘুসিতে। দুর্বল হয়ে আসছে দেহ। নাকমুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। পাওয়ারের নাকে মুখেও রক্ত। তবু হাসল সে!

সামান্য বিশ্রাম পেলে হত। কিন্তু সে সময় দিচ্ছে না পাওয়ার। পেটে আরও একটা পাঞ্চ খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল ইয়াসীন। সাথে সাথে হ্যাঁচকা টান মারল। পাওয়ারের পা ধরে চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে। কিন্তু স্প্রিং-এর পুতুলের মত উঠে দাঁড়াল তৎক্ষণাৎ।

উঠতে হলো ইয়াসীনকেও। নইলে লাথি খেয়ে মরতে হবে। দুপুরের রোদ মনে হচ্ছে ভীষণ হলুদ। পৃথিবীটা কাঁপছে। বাতাস নেই।

কোমরে পিস্তল হাতড়াতে গিয়ে আবারও একটা শক্ত ঘুসি খেলো ইয়াসীন।

হাতদুটো ঝুলে পড়তে চাইছে। প্রতিরোধের শেষ শক্তিটুকুও নেই। সব কিছু কেবল শ্লথ!

দমাদম মেরে চলেছে পাওয়ার। কিন্তু ইয়াসীন ক্রমাগত পিছু হটছে বলে কোনও ঘুসিই জুতসই হচ্ছে না। পাল্টা মার পাওয়ারও যথেষ্ট খেয়েছে। অথচ মোটেই কাবু মনে হচ্ছে না তাকে!

ঘুসি এড়াতে গিয়ে পিস্তল বের করতে পারছে না ইয়াসীন। ওদিকে শিলাবৃষ্টির মত আসছে পাওয়ারের ঘুসিগুলো। কোনওটাই যথেষ্ট জোরাল নয়। অথচ প্রতিটাই সাপের ছোবলের মত তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাদায়ক। আর বেশিক্ষণ টেকা যাবে না। হঠাৎ চোখের কোণে ধরা পড়ল পাহাড়ের কিনার। ঠিক পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে সে। আর এক পা পিছু হটলেই সোজা নীচে আছড়ে পড়তে হবে!

পাওয়ারের দিকে তাকাল ইয়াসীন। রক্তাক্ত একটা মুখ বীভৎস ভঙ্গিতে হাসছে তার দিকে চেয়ে। 'গুডবাই!' বলল পাওয়ার। তারপর ইয়াসীনের অরক্ষিত মুখে ঝাড়ল শেষ নক আউট পাঞ্চ।

মাথা কাৎ করে ঘুসিটা এড়াল ইয়াসীন। এবং চট করে সেঁটে গেল পাওয়ারের গায়ে। পরমুহূর্তে দেহের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে হিপথ্রো করল।

কাঁধের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পাওয়ারের দেহ। মেসার কিনারার ওপাশে! একটা মর্মভেদী আর্তনাদ ক্রমশ নীচে নামতে নামতে–অতলে মিলিয়ে গেল। তারও অনেক পরে ছয়শো ফুট নীচে থেকে ভেসে এল ভারি কিছু পতনের শব্দ।

অসহ্য ক্লান্তি। মাথার ক্ষত থেকে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। কেমন ঝিমুনি আসছে। আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। বসে পড়ল ইয়াসীন। পরমুহূর্তে শুয়ে পড়ল।

চোখ খুলতেই বেলিন্দার উদ্বিগ্ন মুখ। নুয়ে আছে তার উপর। পাশে মার্থাখালা। একটু দূরে দাঁড়ানো ক্যাপ্টেন ম্যালেট, মোকাটো, এবং আরও অনেকে!

উঠতে চেষ্টা করল ইয়াসীন। কিন্তু শরীরের প্রতিটা মাংস পেশী প্রবল আপত্তি জানাচ্ছে। কী ভীষণ ব্যথা সারা গায়ে!

'শুয়ে থাক তো চুপচাপ!' ধমক লাগাল বেলিন্দা।

'তোমাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাকে,' বলল ক্যাপ্টেন ম্যালেট।

'গ্রেফতার!'

'হ্যাঁ, সার্জেন্ট। মেজর সাইকের ধারণা, আর্মি থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলে তুমি।

কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছিল তোমার। সে-জন্যেই স্টেজ কোচটা ভেগাস ট্রেইল থেকে এদিকে নিয়ে এসেছ ভুলিয়ে ভালিয়ে।'

'কী সব পাগলের প্রলাপ! লেফটেন্যান্ট সাইমন জানে–'

'সাইমন মারা গেছে, মার্লস্প্রিং-এ। স্টেজ ড্রাইভারও নেই।'

'সার্জেন্ট ম্যাকহার্ডি জানে।'

'সে কিছু জানে না। জানলেও তার কথা বিশ্বাস করে না মেজর। কারণ ম্যাকহার্ডি তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তা ছাড়া ক্যাপ্টেন সাইমন তোমাকে স্টেজের সাথে যাবার জন্য সরাসরি নির্দেশ দিয়েছিল কিনা–শোনেনি ম্যাকহার্ডি।'

'মোকাটো জানে, মহিলারা জানে।'

'মেয়েরা আর্মির কেউ নয়, সার্জেন্ট।' বলল ক্যাপ্টেন ম্যালেট। ইতস্তত করল একটু। 'আর মোকাটো একজন রেডইন্ডিয়ান। তার কথা হয়তো গ্রহণযোগ্য মনে হবে না মেজরের কাছে।'

অবাক হয়ে ক্যাপ্টেন ম্যালেটের দিকে তাকিয়ে আছে ইয়াসীন। 'আমার কী কোর্টমার্শাল হবে, ক্যাপ্টেন?' জিজ্ঞাসা করল।

'না।' ইউনিফর্মের পকেটে হাত ঢুকাল ক্যাপ্টেন। একটা কাগজ বের করে বাড়িয়ে ধরল ইয়াসীনের দিকে। 'এটা ছিল তোমার কাছে। তাই হবে না।'

কাগজটা নিল ইয়াসীন। তার ছাড়পত্র! মাসখানেক আগে ইস্যু করার তারিখ দেওয়া। এত দেরিতে এল! ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল সে।

ভাবলেশহীন ক্যাপ্টেন ম্যালেটের মুখ। 'ভাল সৈনিক ছিলে তুমি, ইয়াসীন,' বলল সে। 'একজন সত্যিকার সৈনিক দলের আর একজন সৈনিককে আপন ভাইয়ের মত জানে। ওটা রেখে দাও।'

'ধন্যবাদ, অফিসার। অজস্র ধন্যবাদ!'

ক্যাম্পকেডিতে ফিরে যাচ্ছে ওরা।

দীর্ঘ যাত্রায়–রকস্প্রিং, মার্লস্প্রিং, সোডা লেক, এবং কেভ ক্যানিয়নে থাকতে হয়েছে বিশ্রামের জন্য।

ইন্ডিয়ানদের সাথে কোথাও দেখা হয়নি। যেন মোযেভের বালিতে বালি হয়ে মিশে গেছে তারা। যেন কোনও কালে অস্তিত্ব ছিল না তাদের।

বেশি পথ বাকি নেই আর।

রাত নেমেছে। সারাদিনের অখণ্ড দহনের পর ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মরুভূমি। কী ভীষণ নির্জনতা!

দূরে বালিয়াড়ির কোল ঘেঁষে পূর্ণিমার চাঁদ। নিশ্চুপ এগিয়ে চলেছে সবাই চাঁদটার দিকে।

একটু একাকীত্বের লোভে কালো ঘোড়াটাকে নিয়ে বেশ আগে আগে যাচ্ছিল ইয়াসীন। বেলিন্দার লাল ঘোড়াটা এগিয়ে এল পাশে।

'এরপর, সীন?' জিজ্ঞাসা তার।

'কেন, মরুভূমি!'

'আর কতকাল মরুভূমিতে পুড়তে চাও তুমি?'

'পুড়ে পুড়ে মানুষ কি হয় জানো?'

'কী?'

'সোনা!'

'ফিরে যাবে না?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ইয়াসীন। 'হ্যাঁ। এবার ফিরে যেতে হবে। জীবনের অনেকটা সময় আমার মরুভূমিতে কেটেছে। যেন নিজের উঠান মনে হত এই বালির বিস্তার। এসব ছেড়ে এবারে চলে যাবার পালা। হয়তো কোনও শহরের আমার মত একজন মার্শাল প্রয়োজন!'

'সোনার নদীটা?'

'একজন মানুষের জীবন তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান–দু'দণ্ড শান্তি। আমি স্থিতি চাই বেলিন্দা–শান্তি চাই। সোনার নদীটা না হয় একটা স্বপ্ন হয়ে থাকুক আমার জীবনে? এরকম পূর্ণিমার রাতে মেঠো ইঁদুরের চোখে যেমন থাকে রাশি রাশি সোনালী ফসলের স্বপ্ন!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেলিন্দা। 'সোনার নদীটা যেন কেউ কোনও দিন খুঁজে না পায়, সীন। চিরকাল ওটা স্বপ্ন হয়েই থাক। লোকালয়ে শান্তিতে বসবাস করার জন্য মরুভূমিতে লুকানো একটা স্বপ্নের প্রয়োজন। স্বপ্ন ছাড়া তো বাঁচে না মানুষ।'

মরুভূমির কোমল বালিতে অকাতরে সোনালী জোছনা ঢালছে পূর্ণিমার চাঁদ। ভিতরে বাইরে–সবখানে শুধু সোনা আর সোনা!

অবশেষে উচ্চারিত হলো সেই কাঙ্ক্ষিত শব্দগুচ্ছ।

'ভালবাসি তোমাকে।'

কে কাকে বলেছে বোঝা গেল না। হয়তো একসাথে, একসময়ে–দুজনারই এ সমান উচ্চারণ!

পরস্পরের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে ওরা। হিমোগ্লোবিনে আফ্রোদিতের শীৎকার!

***